শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি - মার্চ ২০১০

প্রকাশকাল
০১.০২.২০১০

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২৫০.০০ টাকা
২৫০.০০ রুপি
৪ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এক

সাহিত্য-জগতের প্রায় সকলে একে-অন্যের পরিচিত বা এক ধরনের ঘনিষ্ঠ বলে এদের সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্য ও মান নিয়ে তৃতীয়চোখ দিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার, যে-কাজটি করা খুবই কষ্টসাধ্য; কাজটি করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অথচ শিল্প-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ও মান নিয়ে আলোচনা হওয়াও প্রয়োজন। বাংলাদেশের কবিতা-গল্পের বর্তমান যে-অবস্থা সেটা পাঠকের দাবি কতটা পূরণ করতে পারছে, আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে 'গোলাঘর' তা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। সে-কারণে কবি ও গল্পকারের নাম উহ্য রেখে এবং রচনার ক্রম পরিবর্তন করে আলোচনার উদ্দেশ্যে সেগুলো আলোচককে দেয়া হয়ে থাকে। যাতে তিনি বুঝতে না পারেন কা'র কবিতা বা গল্প কোনটি। এভাবে আলোচনা করার পেছনে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো ইনটেনশন নেই। বরং এই পদ্ধতিতে শিল্পী নিজে যেন নিজেকেই আয়নায় দেখে নিতে পারেন, সেটিই আমাদের উদ্দেশ্য। এতে কেউ সমালোচনার সম্মুখীন হলে অন্তত আমাদের প্রতি বা আলোচকের প্রতি বিরূপ হবেন না, এটি আমাদের প্রত্যাশা। তবে গত সংখ্যায় কবিতা আলোচনা শুরুর পূর্বে এ-সংক্রান্ত টিকা ভুলক্রমে বাদ পড়ায়, আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নির্বাহী সম্পাদক
০১.০২.২০১০

স ম্পা দ কী য় : দুই

গোলাঘর চলতি সংখ্যায় 'স্মরণ' অংশটি হওয়ার কথা ছিল ভবানী সেনকে নিয়ে। ভবানী সেনের রাজনৈতিক দর্শনের ওপর রচনাটি লিখতে চেয়েছিলেন শ্রদ্ধাভাজন যতীন সরকার। তিনি অসুস্থ থাকায় এ-সংখ্যায় 'স্মরণ' করা হল হুমায়ুন কবিরকে এবং তাঁর ওপর প্রবন্ধটি লিখতে হল আমাকে। নিজের সম্পাদিত পত্রিকায় নিজের এ-লেখা ছাপা, কোনো প্রচারের বাসনা থেকে নয়, কাজটি করতে হল নিতান্ত প্রয়োজনে। কেননা হুমায়ুন কবিরের সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে লেখালিখি কিছু থাকলেও, দুই বাঙলা মিলে কোথাও তাঁর শিক্ষাচিন্তার ওপর উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা আমাদের চোখে পড়েনি। শুধু কাজী আবদুল ওদুদ সেই আমলে 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী' বইটি নিয়ে একটি রিভিউ লিখেছিলেন।

কবি ও গল্পকারের নাম গোপন রেখে এবং কবিতা ও গল্পের ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে আলোচনার যে রেওয়াজ গোলাঘরের মাধ্যমে চালু হল, সে-জন্য বেশ প্রশংসা আসছে পাঠকের কাছ থেকে; কিন্তু যাঁদের কবিতা ও গল্পের বিরূপ আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে কারও কারও আচরণে বৈরিতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের প্রতি কিংবা আলোচকের প্রতি এরূপ আচরণ কারোরই কাম্য নয়। বলা হয়ে থাকে বাঙালি সহিষ্ণু জাতি; আমাদের কবি ও গল্পকারদের বেলায়ও বিশেষণটি যাতে খাটে, সেটিও সকলের কাম্য।

এ-সংখ্যা থেকে গোলাঘরের পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে গেল। সে-জন্য এর দামও একটু বাড়ল। পাঠকদের কাছে আমাদের ব্যাখ্যা, দামী পোশাক, বাড়ি-গাড়ি, টিভি-ফ্রিজের পাশাপাশি একটি পত্রিকার জন্য এই ভারটুকু বহনের বিনিময়ে আমরা নিশ্চয়ই বড় কিছু ফেরত পাব; হয়তো সেটি ভিন্ন ধরনের এবং অনেক বড় পাওয়া হবে সেটি; দেখি না একটু কষ্ট করে! এই কষ্ট বৃথা যাওয়ার নয়; এ-ধারার ইতিহাসও তাই বলে।

সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

সম্পাদক
০১.০২.২০১০

সূচি

স্মরণ ০৫

প্র ব ন্ধ
হুমায়ুন কবিরের শিক্ষাদর্শন: সাধারণ মানুষের প্রতি পক্ষপাত
শ ও ক ত হো সে ন ০৬

ক বি তা
একুশ জন কবির একুশটি কবিতা **১৯**

প্রকাশিত কবিতার আলোচনা
ম ই নু দ্দী ন খা লে দ ৪১

ব ড় প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: উন্নয়নের দিগন্ত
আ বু ল বা র কা ত ৪৫

গ ল্প
তিন জন গল্পকারের তিনটি গল্প ১০৫

প্রকাশিত গল্পের আলোচনা
শা ন্ত নু কা য় সা র ১২২

অ নু বা দ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল ভাষণ
সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দা র ১২৫

নি ব ন্ধ
রুমির অলৌকিক বাগান
মু স্তা ফা জা মা ন আ ব্বা সী ১৩৩

প্র ব ন্ধ
বাঙালির গান: চর্যাগীতি থেকে শাক্তগীতি
ক রু ণা ম য় গো স্বা মী ১৪৬

তথ্যযুদ্ধ: হিথরো বিমানবন্দর ও ‘প্রাচ্য অধ্যয়ন’
রে হ নু মা আ হ মে দ ১৫৪

সমাজ ও সাহিত্য
ম জি দ মা হ মু দ ১৬১

পু ন র্মু দ্র ণ
কথোপকথন: গোলাপ নিয়ে একদিন
বে লা ল চৌ ধু রী – আ ব দু শ শা কু র ১৬৭

বই আলোচনা
আ নি সু জ্জা মা ন ২২৩

স্মরণ

....

হুমায়ুন কবির

১৯০৬-১৯৬৯

[হুমায়ুন কবির-এর জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯০৬, ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। বাবা কবিরউদ্দিন আহমদ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মা সাজেদা খাতুন। বর্তমান নওগাঁ জেলাধীন কালীধন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন-এ রাজশাহী বিভাগে প্রথম হন; প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট-এ প্রথম বিভাগে তৃতীয়; একই কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে এম.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে বিশেষ ডিগ্রী লাভ এবং প্রতিটিতে প্রথম শ্রেণী। প্রিলিমিনারি ব্যাচেলর অব ল, ইন্টারমিডিয়েট ব্যাচেলর অব ল এবং ফাইনাল ব্যাচেলর অব ল-এর তিনটিতেই প্রথম শ্রেণী। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রভাষক; একই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাককোত্তর শ্রেণীতে ইংরেজির প্রভাষক; অল ইন্ডিয়া সার্ভিস এক্সামিনেশন ক্লাসে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রভাষক; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত টিসার্চ ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের সিনেট সমতুল্য সদস্য এবং মাদ্রাজ, মহিশুর, কলকাতা ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, রাষ্ট্রনীতি এবং দর্শনের পি.এইচ. ডি, ডি. ফিল ও ডি. লিট-এর পরীক্ষক। কংগ্রেসকর্মী ব্রাহ্ম রমনী শান্তি দাসের সঙ্গে বিয়ে। সম্পাদিত পত্রিকা: ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ, বারমাসী ও Bharat (অক্সফোর্ডে)। এছাড়াও একাধীক পত্রিকা প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লিখেছেন ভারত ও ভারতের বাইরের অনেক বিখ্যাত পত্রিকায়। যুক্ত ছিলেন এতো-এতো সংগঠনের সঙ্গে যেগুলোর তালিকা দিতে গেলে এখানে স্থান সংকুলান হবে না। ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অনেক দেশ। ১৯৪৯-এ হন ভারত সরকারের যুগ্ম সচিব। ১৯৫৩-তে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও সচিব। ১৯৫৮-তে ভারত

সরকারের বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। ১৯৬২-তে পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট সংসদীয় এলাকা থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৭-তে পশ্চিমবাংলা থেকে পার্লামেন্টে পুনর্নির্বাচিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বাঙলার কাব্য (প্রবন্ধ ১৯৪২), নদী ও নারী (উপন্যাস ১৯৫২), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (প্রবন্ধ ১৯৫৭), নয়া ভারতের শিক্ষা (প্রবন্ধ ১৯৬২), ইমানুয়েল কান্ট (প্রবন্ধ ১৯৩৬), মার্কসবাদ (প্রবন্ধ ১৯৪৮), Sarat Chandra Chartterjee (প্রবন্ধ ১৯৫৭), এছাড়া বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর আরও বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। ১৮ আগস্ট ১৯৬৯-এ দিল্লি ওয়েলিংডন হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।]

প্র ব ন্ধ

শ ও ক ত হো সে ন

....

হুমায়ুন কবিরের শিক্ষাদর্শন: সাধারণ মানুষের প্রতি পক্ষপাত

হুমায়ুন কবিরের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। পড়াশুনা করেন ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত বাংলাদেশেই। সে-হিসেবে তিনি বাংলাদেশের মানুষ; তার ওপর মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। এই দুই কারণে হয়তো, ভারতে তাঁর সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা অনেকটা অনালোচিতই রয়ে যায়। যার অন্তর্নিহিত দিকটি হল, শিক্ষিত সমাজের মনোজাগতিক সাম্প্রদায়িকতা; এই বিষয়টিকে বাইরে থেকে শাদা চোখে দেখা যায় না, তবে এটি শিক্ষিত সমাজের মগজের কোষে কোষে ঘাপটি মেরে থাকে।

এর পরবর্তী সময়ে হুমায়ুন কবির ইন্টারমিডিয়েট, বি.এ.অনার্স ও এম.এ পড়াশুনা করেন কোলকাতায় এবং দর্শন-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। পরে আরও অন্যান্য ডিগ্রি গ্রহণ শেষ করে কর্মজীবন কোলকাতাতে শুরু করেন। এমনকি রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন ও বিস্তৃতি সেখানেই ঘটে। এছাড়া আরও নানা কারণে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে তিনি

হয়তো এক ধরনের দূরে সরে গিয়েছিলেন। ফলে হুমায়ুন কবিরের সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা বাংলাদেশেও খুব একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে হুমায়ুন কবিরের আগে এতটা মেধার পরিচয় কেউ দেননি; ম্যাট্রিকুলেশনে রাজশাহী বিভাগে প্রথম হন, ইন্টারমিডিয়েটে পান প্রথম বিভাগ, বি.এ. অনার্সে (ইংরেজি) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, এম.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তিনি যে শুধু এ্যাকাডেমিকালি মেধাবী ছিলেন তাই নয়, বিশেষ করে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাংলার কাব্য', উপন্যাস 'নদী ও নারী', শিক্ষা বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ সাহিত্যের ওপর লিখিত বইসমূহ সত্যিই উঁচুমানসম্পন্ন।

হুমায়ুন কবিরের রচনা যতটা আলোচিত হওয়ার কথা ছিল, সেই পরিমাণে অবশ্যই আলোচিত হয়নি; তবে বিশেষ করে রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কিত রচনাসমূহ নিয়ে সে-অর্থে আলোচনা না হলেও, তাঁর সাহিত্য নিয়ে খানিকটা আলোচনা-তো হয়েছেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তাঁর শিক্ষাভাবনা নিয়ে বলা যায় একেবারেই আলোচনা হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন, ভালো ছাত্র, পরবর্তী কালে ভালো শিক্ষক এমনকি অখণ্ড ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তিনি। হুমায়ুন কবির নিশ্চয়ই অখণ্ড ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা-ক্ষেত্র নিয়ে তাঁর ভাবনা ভেবেছেন; কিন্তু আমাদের আজকের বাংলাদেশে শিক্ষা-ক্ষেত্র যেখানে নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত, সাধারণ মানুষের স্বার্থ-বিরোধী সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে; যেখানে ন্যূনতম মূল্যবোধের অবকাশ পর্যন্ত নেই; সেখানে হুমায়ুন কবিরের ভাবনা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাধিগ্রস্ততা ও ভঙ্গুর অবস্থা থেকে মুক্ত করার দাওয়াই হিসেবে অনেকটাই প্রাসঙ্গিক।

হুমায়ুন কবির শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; শুধু ভাষা শিক্ষার নামে ইংরেজি বা আরবি জানলেই শিক্ষাকার্য হয়ে গেল বলে তিনি কখনোই মনে করতেন না, যদি-না শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোজগতের মুক্তি ঘটে। আসলে ঔপনিবেশকতার জাল ছিন্ন করার লক্ষ্যেই তিনি এভাবে ভাবতেন। সে কারণে বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষাকে তিনি যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন একইভাবে সেই ইংরেজি শিক্ষা যদি দাসত্ব করা যাবে ভালোভাবে– সেই মনোবৃত্তি থেকে হয়, এমন উদ্দেশ্যকে তিনি পরিহাস ও পরিহার করতে গিয়ে 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী' গ্রন্থে লিখেছেন, "বিদেশীর সুবিধার জন্য বিজাতীয় ভাষাকে কেবলমাত্র শিক্ষার বাহন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষার বাহনই হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার লক্ষ্য।" একই গ্রন্থে তিনি অন্যত্র লিখেছেন, "মেকলের এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল রাজকার্যের সৌকর্যের জন্য কেরাণী তৈরি– যারা আদেশ নেবে, আদেশ দেবে না।" এই কথাটিকেই হুমায়ুন কবির আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন এভাবে, "ইংরেজের সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল কেরাণীর। ... সে শিক্ষা তাই প্রশ্ন করতে শেখায়নি, নিষ্প্রশ্ন নির্বিবাদে আদেশ পালনের মনোবৃত্তি রচনা করেই তৃপ্ত হয়েছে। সেজন্যই আমাদের দেশে অক্ষরজ্ঞানের বিস্তার যতটা বেড়েছে, শিক্ষিত

অনুসন্ধিৎসু মনের সংখ্যা ততটা বাড়েনি। বহুদিন শিক্ষার এ গোড়ার গলদ ধরাও পড়েনি।”

হুমায়ুন কবির মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়েও ব্রিটিশ-আশ্রিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন সেটা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আর কেউই তখন দেখাতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শ্রেণী ও জাত-বিদ্বেষকে দু'হাতে ঠেলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সীমাহীন কষ্টের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। যতটা প্রতিকূলতার মধ্যে বিরূপ সময়ের মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছিল, সেই সীমাহীন যন্ত্রণা ও লড়াইকে নিজের জীবন দিয়ে যেমন মোকাবেলা করেছেন, একইভাবে বাঙালি অন্য মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথাও তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। “আমার মনে হয় বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রদের বেলায় একথা স্বীকার না করে উপায় নেই; নেতৃত্বের অভাবে আমরা আজ পিছিয়ে পড়েছি, সে অভাব দূর করতে হলে আজ আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। গত ১০০/১৫০ বৎসরের মুসলমানের ইতিহাস পতনের ইতিহাস, পরাজয়ের ইতিহাস। তাই সেদিনকার মনোবৃত্তি আজো যাঁদের আছে, তাঁরা পরাজয়ের চোখে রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেখেন, এরকমই তাঁদের মনোবৃত্তি। তাই তাঁদের রয়েছে সতর্কভাবে নিজেকে রক্ষা করে চলবার মনোবৃত্তি। তাই তাঁদের মুখে এক কথা– মুসলমানের জন্য চাই রক্ষাকবচ, চাই বিশেষ বন্দোবস্ত, চাই দুর্বলের জন্য অপরের প্রতি নির্ভরতা।” উল্লেখ্য হুমায়ুন কবির ছিলেন এরূপ রক্ষাকবচের জন্য প্রার্থনা ও পরনির্ভরতার বিপক্ষে।

তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর মুক্তিকামী বাঙালি চিন্তাবিদ ও ‘নেতা’। বাঙালি মুসলমানের মুক্তির কথা যেমন ভেবেছেন, পুরো ভারতবাসীর মুক্তির কথাও সেভাবে ভেবেছেন আবার বিশ্ববাসীর সার্বিক মুক্তির কথা তিনি একইসঙ্গে ভেবেছেন। সেই মুক্তির প্রথম শর্ত হিসেবে তিনি বলতেন রাজনৈতিক মুক্তির কথা। সেই সময়ে অনেকেই ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে ভালো চোখে দেখতেন না কিন্তু হুমায়ুন কবির লিখেছেন, “ছাত্রজীবনে রাজনীতিকে এড়াতে চাইলেও এড়ানো যায় না। আর যদি এড়ানো যেতোও, তবু এড়ানো বাঞ্ছনীয় হত না। একই উদ্দেশ্যে এই বইয়ের অন্যত্র তিনি লিখেছেন, “তরুণ বয়সে ছাত্রজীবনে আমরা রাজনীতি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি বলে যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা নামি, তখন পরিণত বয়সেও আমরা অনভিজ্ঞ ছাত্রের মতনই ভুলচুক করে বসি।”

আমরা লক্ষ করছি যে, আজকের যুগে ছাত্রদের প্রতি শাসকশ্রেণীর আগ্রহ অনেকাংশেই নেই। এই দৃশ্য বিশ্ব জুড়েই বিদ্যমান। এর অন্যতম কারণ হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশেষ করে ছাত্রদের ওপর ভর করে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে হত– কিন্তু আজকের যুগে শাসকশ্রেণী সেই নির্ভরতা অন্যান্য পেশাজীবী বিশেষ করে ব্যবসায়ী শ্রেণীর ওপর করছে। ফলে শাসকশ্রেণীর কাছে ছাত্রদের

প্রয়োজন আগের মতো আর নেই। বিশ্ব আজ পুঁজি-নির্ভর এককেন্দ্রিকতার জালে আটকা পড়ে ছাত্রদের ধার আর ধারছে না, কেননা ছাত্রদের কাছে পুঁজি থাকে না, থাকে ব্যবসায়ীদের কাছে। সে কারণে দেশে দেশে আজ ছাত্রসংগঠন অবহেলার শিকার এবং ছাত্রসংগঠনগুলো ভেঙে দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের ভাষ্য, "রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে ছাত্রসমাজ যে ভাগ নিয়েছিল, তা দেখে বহু রাষ্ট্রনেতা বুঝেছেন যে দেশের এ যুবশক্তিকে আয়ত্তে রাখলে রাষ্ট্রশক্তি অর্জন সহজ। তাই ছাত্রদের ঘরোয়া ব্যাপারে রাজনৈতিক দল-উপদলের কর্মী অংশ নেয় এবং তুচ্ছ ব্যাপারে ছাত্রদের উত্তেজিত করে নিজেদের সুবিধা করতে চায়।"

অবশ্য অন্যত্র তিনি লেখেন, "প্রত্যেক দেশই বলেছে যে তার অভিযান কেবলমাত্র ন্যায়ের জন্য, সত্যের মর্যাদায়। কিন্তু যুযুধমান প্রতিপক্ষ দেশগুলি সকলেই ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে, সে ন্যায়ের, সে সত্যের স্বরূপ কী? তাই দেশে তরুণেরা ভাবতে লাগল– যুদ্ধ কেন? যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য কী? কোন অভিলাষ, কোন আদর্শ সাধনের জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের এ সংগ্রাম? সেই আত্ম-বিশ্লেষণ, সেই ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনের ফলেই ছাত্র আন্দোলনের জন্ম।"

ব্যবসায়ীদের কদর দিন দিন শাসক-শ্রেণীর কাছে বাড়ছে। ছাত্রদের যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দরকার ছিল, তাদেরকে তখন শাসক-শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো সেটা পণ্ডিত হুমায়ুন কবির তাঁর কালেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, "ছাত্র আন্দোলন যে কেন মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই গড়ে উঠল, তারও ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।"

হুমায়ুন কবিরের দর্শন ছিল এমন, সেটা হল, ছাত্রদের অবশ্যই রাজনীতি করতে হবে, তবে সেটা শাসক-শ্রেণীর হাতে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং ছাত্রদের নিজেদের মুক্তির উদ্দেশ্যে এমনকি বৃহৎ জনগোষ্ঠির মুক্তির উদ্দেশ্যে। সেকারণে তিনি ছাত্রদের রাজনীতি করা অতি জরুরি বলেই মনে করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস, ছাত্র রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও রাজনীতি ছাত্রকে এড়ায় না।"

ছাত্রজীবনের সবচেয়ে শোচনীয় বিষয় হল, ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে সে কী করবে তার নির্দেশনা ছাত্র-জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। ছাত্রত্ব শেষ করেই তাকে ভাবতে হয় যে সে কী করে বেকারত্ব ঘুচাবে। তখন ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে হয় আমাদের দেশের ছাত্রদের। সমস্যাটি অনুধাবন করে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যা দিন দিন গুরুতর হয়ে উঠছে, অথচ তার সমাধান ছাত্রজীবনের সীমানার মধ্যে নেই।"

ছাত্রদের অনেক সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে যেমন জানতে হবে একইভাবে তার সমাধান কীভাবে হতে পারে সেই পথও খুঁজে বের করতে হবে নিজেদেরকেই। কিন্তু সমাধানযোগ্য নয় ভেবে শুধু অর্থহীন বিক্ষোভ প্রদর্শন কোনোই

সুফল বয়ে আনবে না। হুমায়ুন কবির ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে বলেছেন যে, "রোগ জটিল, কিন্তু মারাত্মক নয়, তবে অবহেলা করলে বিপদ অনিবার্য। রোগ কী, সে-কথা না জানলে যেমন রোগের চিকিৎসা করা চলে না, তেমনি ছাত্রবিক্ষোভের কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার প্রতিকার করা সম্ভব নয়।"

দুই

পণ্ডিত হুমায়ুন কবির সমাজে সবচেয়ে সম্মানের জায়গায় শিক্ষকদের দেখতে চেয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "প্রাথমিক শিক্ষক হবে প্রাথমিক সমাজস্রষ্টা, এই হোক আজ আপনাদের সংহতি ও সংগঠনের ভিত্তি।" অন্যদিকে সার্বিকভাবে শিক্ষক সম্প্রদায় সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি লেখেন, "ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষার বিপ্লবসাধন অসম্ভব। সমস্ত শিক্ষার বাহন শিক্ষক এবং শিক্ষক সকল ক্ষেত্রেই প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছেন। তাই ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিক্ষক প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে কখনোই আমূল অস্বীকার করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ মানুষের মনোবৃত্তি, চরিত্র ও ভাগ্য নির্ণয় হয়। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষত্রুটি যতই থাক না কেন, তারই মাধ্যমে সমাজ বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী তাই রাতারাতি বদলাবে না। ছোটখাট অদলবদল প্রতিনিয়ত চলবে, চলা প্রয়োজন। যাঁরা মনে করেন যে বিশেষ কোনো পদ্ধতির প্রচলনের ফলে আমাদের শিক্ষাসমস্যার চিরকালের মতন সমাধান হবে, তাঁরা শিক্ষার মর্মকথাই বোঝেননি। মানুষের মনের বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশের ধারা বদলায়।"

পক্ষান্তরে শিক্ষকরা যে সমাজে নিগৃহীত, অবহেলিত সেই বিষয়টি হুমায়ুন কবির বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সে পরাজয়ের গ্লানি ও তিক্ততা তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। ... অসন্তুষ্ট ও হতাশ শিক্ষক যে সমাজের পক্ষে কত বড় বিপদ, বহুক্ষেত্রে সমাজ আজো সে কথা পুরোপুরি বোঝেনি। ...কম দামে বেশি জিনিস চাইলে তার গুণের তারতম্য হবেই, তাই অল্প বেতনে বহু শিক্ষকের নিয়োগে আজ বহু অযোগ্য লোক স্কুলে পাঠশালায় স্থান পেয়েছে। অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা যত বাড়ে, সমাজে শিক্ষকের মর্যাদাও তত কমে। পারস্পরিক মেলামেশার অবকাশ নেই বলে ছাত্রসমাজ বহুক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রতি উদাসীন। সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবল কোনো উপায়েই আজ শিক্ষক ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার সুযোগ পান না।" কী কারণে শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের বাইরে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াতে বাধ্য হন এবং এর পরিণতি কী– এ বিষয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, "স্কুলের আওতায় স্কুলঘরে হেডমাস্টারের কর্তৃত্বাধীনে টিউশানির ব্যবস্থা করলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিউশানি বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুলে

ভালো করে পড়ানো হয় না অথবা কোনো কোনো ছাত্র ক্লাসের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না অথবা কোনো অভিভাবক ভাবেন যে প্রাইভেট মাস্টারের কাছে বিশেষ ভাবে পড়লে তাঁর ছেলে পরীক্ষায় বেশি ভালো করবে বলেই টিউশানির প্রয়োজন হয়। স্কুলে টিউশানির বাবদ যে মাহিনা উসুল হবে, সমস্ত শিক্ষকেরই তাতে ভাগ থাকবে অবশ্য যাঁরা সেজন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন, তাঁদের ভাগ স্বভাবতই একটু বেশি হবে। একবার টিউশানিকে স্কুলের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতির একটি প্রধান সংকট দূর হবে। শিক্ষক যদি তাঁর সমগ্র সময়, উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে ক্লাসে পড়াতে শুরু করেন, তার স্কুলের আবহাওয়া একেবারে বদলে যাবে। এই একটি পরিবর্তনের ফলেই শিক্ষাপ্রণালীতে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা দেবে, শিক্ষকও হারানো নেতৃত্ব ফিরে পাবেন।"

শিক্ষক যে কখনো কখনো নিজের কারণেও সমাজের কাছে নিজেকে হেয়প্রতিপন্ন করেন– সে বিষয়টিও হুমায়ুন কবিরের নজর এড়ায়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "এক মন ধান যদি কেউ দান করে, তবে তাকে আমরা বলি দাতা, কিন্তু সমস্ত জীবন যার শিক্ষাদান ব্রত, তার দান আমরা স্বীকার করিনে। ...সমস্ত দেশেই চিরদিন শিক্ষক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, তাই সমাজে তার মর্যাদার উপযুক্ত স্বীকার হয় না। কিন্তু শিক্ষকের অমর্যাদার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষকের নিজের প্রতি নিজেরই অমর্যাদা। শিক্ষক দরিদ্র হয়েও উন্নত থাকতে পারেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তার নিজের মনের ক্ষুদ্রতায় তিনি সমাজের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেন।" হুমায়ুন কবির জানতেন রাজনীতি সুস্থ না থাকলে একটি দেশ বা জাতির অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রে অসুস্থতা নেমে আসবেই। কাজেই রাজনীতিকে দায়ী করে তিনি প্রশ্ন তোলেন এভাবে, "শিক্ষকের মনে আগুন না থাকলে ছাত্রদের মনে আগুন জ্বালাবে কে?"

এ কথা বলে আসলে তিনি শুধু শিক্ষক নয় বরং পুরো দেশ যারা চালনা করেন তাদের দিকেই নির্দেশ করে বলতে চেয়েছেন যে, "ওখান থেকেই আসতে পারে উপযুক্ত সুযোগ ও পরিবেশ দিয়ে প্রকৃত শিক্ষক নির্বাচন করার মূলমন্ত্র।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "তাই সমস্ত শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা আদর্শবাদী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ শিক্ষক। যেদিন নতুন ভারতবর্ষ এই নতুন যুগের উপযুক্ত শিক্ষক সম্প্রদায় গড়ে তুলবে, সেদিন শিক্ষাপ্রণালীর সমস্ত নিন্দা, অনুশাসনহীনতার সমস্ত অভিযোগ স্বভাবতই মিটে যাবে।"

এই মহান চিন্তাবিদ শুধু ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। একইভাবে তিনি শিক্ষার গলদ নিয়েও অনেক লিখেছেন এবং সভা-সেমিনারে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন। শিক্ষা ও শিক্ষক নিয়ে তার বক্তব্য, "আজকাল সমস্ত শিক্ষাই পরীক্ষানির্ভর বলে পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈরি করাই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরীক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এবং শিক্ষকের আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে আজকাল গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট মাস্টারের যে প্রাদুর্ভাব, তার ফলে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা আরো কমে গেছে। এমন শিক্ষকও আজকাল দেখা যায় যার সমস্ত সময় ও উদ্যম বাড়ি বাড়ি ছাত্র পড়িয়ে খতম হয়ে যায়। স্কুলে কোনোমতে হাজিরা দিয়ে মাসের শেষে মাহিনা সংগ্রহ করেই তারা স্কুলের কাজ সমাপ্ত করে। ছাত্র বা তার বাপ-মার কাছে সাক্ষাৎভাবে অর্থগ্রহণ করায় ছাত্র মাস্টারকে ভাড়াটিয়া ভাবে, মাস্টারও ছাত্রকে অর্থসংগ্রহের উপায় মনে করতে শুরু করে। প্রাইভেট মাস্টারির ফলে দেশের শিক্ষাপ্রণালীর যে ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে, সমাজের অধিকাংশ লোক সে সম্বন্ধে অচেতন। ... সমাজের শ্রদ্ধা হারিয়েছে, আর্থিক অবস্থাও অসচ্ছল, এসব কারণে বর্তমানে ধীমান ও চরিত্রবান ব্যক্তি শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করতে চান না। অন্যপক্ষে ভালো লোক শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ না করায় সমাজে শিক্ষকের স্থান আরো নীচে নামতে থাকে। ছাত্রদের নেতৃত্ব হারিয়ে শিক্ষক ভগ্নউৎসাহ ও নির্জীব– অন্যপক্ষে নির্জীব ও নিরুৎসাহ শিক্ষক ছাত্রসমাজের নেতৃত্বের অনুপযোগী। ফলে যে বিষচক্রের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষচক্র ভাঙতে না পারলে সমাজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন।”

তিন

‘দিল্লী, ওয়াশিংটন, মস্কো’ গ্রন্থে লেখক স্বীকার করেছেন তাঁর এ গ্রন্থটি ওয়াশিংটন ও মস্কো নিয়ে বিশেষ গবেষণাগ্রন্থ নয়। এক্ষেত্রে লেখকের কথার সঙ্গে বিরোধিতা না করেও এটুকু অন্তত বলা যায়, তৎকালীন আমেরিকা, রাশিয়া এবং ভারতের একটি প্রচল চিত্র গ্রন্থটিতে সহজে পাওয়া যায়। হুমায়ুন কবির-এর ঝরঝরে গদ্যে এই সব প্রচল বিষয়ও বিশেষ ধরনের সুখকর পাঠের আনন্দ দেয়। এটিকে লেখকের ভ্রমণ বিষয়ক লেখা বলা যেতে পারে। ওয়াশিংটন বা আমেরিকায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে বড় ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখক আমেরিকা ও সোভিয়েত সম্পর্কে লিখেছেন এমনটি না হলেও, স্বল্প পরিসরে আমেরিকা সম্পর্কে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যেসব কথা লিখেছিলেন তার সঙ্গে আজও অনেকেই হয়তো একমত হবেন। রাশিয়াতে তিনি জীবনে মাত্র তিনবার গিয়েছিলেন, তা-ও প্রতিবার অতি অল্প সময়ের জন্য। প্রথমবার মস্কোতে গিয়েছিলেন পাঁচ সপ্তাহের জন্য, তারমধ্যে চার সপ্তাহই কাটাতে হয়েছিল হাসপাতালে। দ্বিতীয়বারে গিয়ে তিন সপ্তাহ, তখন বেশকিছু জায়গায় ঘুরেছিলেন, কিন্তু এত বড় দেশ ঘুরে দেখার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। আর তৃতীয়বার গিয়ে মাত্র চারদিন ছিলেন, তা-ও শুধু মস্কোতেই কাটাতে হয়েছিল পুরোটা সময়।

যা হোক গ্রন্থটি থেকে আমেরিকা, রাশিয়া এবং ভারতের তুলনামূলক একটি চিত্র পাওয়া যায় যা থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনটি দেশেরই অবস্থান খুব সহজে বুঝে ওঠা সম্ভব। সহজ-সরলভাবে একসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তিন দেশের আরও অন্যান্য বিষয়। তবে সবকিছুই লেখক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন

প্রত্যেক দেশের শিক্ষা-কে কেন্দ্র করে। ফলে উল্লিখিত তিন দেশের শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্যও গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক উল্লেখ করেছেন, 'সর্ব সাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আমেরিকার পূর্বে কোনো দেশেই হয়নি'। আমেরিকা পুঁজি বিকাশের রাষ্ট্র হিসাবে এক নম্বর উদাহরণ; সেদিক থেকে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের চরম জায়গা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু লেখক বলছেন, আমেরিকায় উঁচু শ্রেণী যেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে একইভাবে নিচু শ্রেণী তুলনামূলক কম হলেও তারাও অর্থ-বৈভবের মধ্যেই আছে। এবং তাদের এই বিত্ত-বৈভবের পেছনে আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতিরই অবদান বলে লেখক মনে করছেন। তবে আমেরিকা যে বহির্বিশ্ব থেকে ধন-সম্পদ লুট করে অনেকখানি বিত্ত-বৈভব গড়ে তুলেছে– লেখক এই বইয়ে সে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

আমেরিকার নিগ্রো সম্পর্কে লেখকের ভাষ্য, "বস্তুতপক্ষে মার্কিন দেশে যাঁরা চিন্তাশীল ও উদারপ্রাণ, নিগ্রোসমস্যা নিয়ে তাঁদের মনে লজ্জা ও ক্ষোভের অন্ত নেই। লিঙ্কনের নাম আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত এবং তার একটি প্রধান কারণ যে দক্ষিণ অঞ্চলে দাসপ্রথা লোপ করে তিনি নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন।" লেখক ১৯৫৬ সালে একবার করে তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। দেশ তিনটি হল, আমেরিকা, রাশিয়া এবং জাপান। বইয়ের প্রথম অংশে আমেরিকার ওপর তিনি তার মূল্যায়ন ব্যক্ত করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে মস্কো তথা রাশিয়ার ওপর তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য জাপান নিয়ে এ বইয়ে কোনো লেখা তিনি সন্নিবেশ করেননি, তবে পরবর্তী সময়ে জাপান নিয়েও লেখার আগ্রহের কথা এ বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। লেখক তৎকালীন রাশিয়া সম্পর্কে বলেন, "ইতিহাস ও ভূগোলের ধারা রুশসাম্রাজ্যকে যে-বৈচিত্র্য দিয়েছিল, রুশবিপ্লবের পরে সে-বৈচিত্র্য কমেনি, বরং বেড়েছে।" তবে তিনি এ-ও বলেছেন যে, 'পুরনো পৃথিবীর প্রচলিত জীবনধারার যে রীতি, অনেক বিষয়েই রুশসমাজে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।' সাম্যবাদীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "কৃষ্ণভক্ত যেমন কৃষ্ণ নামে আত্মহারা হয়ে পড়েন, ভালোমন্দকে শান্তভাবে বিচার করতে ভুলে যান, সাম্যবাদের নামে বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও তেমনি ভাববিহ্বলতা এসে যায়। সোভিয়েত বলতে তাঁরা ভক্তিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।" লেখক খুব পরিষ্কার ভাষায়ই বলেন যে, "ধনতান্ত্রিক দেশকেও সোভিয়েত রুশ সম্বন্ধে জানতে হবে, রুশদেরও আমেরিকা বা ইউরোপ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা প্রয়োজন।"

হুমায়ুন কবির এই গ্রন্থে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে নানা দিক থেকে দেখলেও, এই দেশসমূহের শিক্ষা নিয়েই তিনি বেশি আলোচনা করেছেন। শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষার মান, শিক্ষার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গেই রাজনীতি ও সমাজ উঠে এসেছে তাঁর মূল্যায়নে; যেখান থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলনা করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। প্রসঙ্গত সোভিয়েত রুশ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শিক্ষায়, শিল্পে

ও বিজ্ঞানে সোভিয়েত রাষ্ট্র গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।" মস্কো আটশো বছরের পুরনো শহর এবং সে-ঐতিহ্যের গর্ব ও গৌরব নানা দিকেই ছড়ানো। সেই মস্কো তথা রুশ দেশে শিক্ষাপ্রণালীর যে সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটেছে, রুশদেশের উন্নতির তাই যে প্রধানতম কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। আবার একই সঙ্গে লেখক বলছেন, শিক্ষার মাধ্যমে দেশের রূপান্তর কিভাবে হয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমেরিকায় মেলে।

সোভিয়েত রুশকে যেমন 'শিক্ষার ল্যাবরেটরি' বলেছেন একই সঙ্গে তিনি পেশা গ্রহণ নিয়ে একটি সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন এভাবে, "যে কাজ তাদের নিতে বলা হয় তা যদি তারা একবার নামঞ্জুর করে, তখন অন্য কোনো কাজ খুঁজে নেয়ার দায়িত্ব তাদের নিজেদের।" যেখানে প্রায় সমস্ত কাজের ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের হাতে, সেখানে নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় বা তদ্বিরে মনমতো কাজ খুঁজে পাওয়া যে কী কঠিন তা সহজেই বোঝা যায়। হুমায়ুন কবির আমেরিকা, সোভিয়েত রুশ এবং ভারতের মধ্যে কয়েকটি দিক থেকে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে এই তিন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আর্থসামাজিক যে প্রভাব গণমানুষের ওপর পড়েছে সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। যেমন বলেছেন, আমেরিকা নিয়ে সোভিয়েত নাগরিকের উদ্বেগ ও আগ্রহ দুই-ই বোঝা যায়। আবার সোভিয়েত-কে আমেরিকা কিভাবে দেখে তা-ও বলেছেন। একই সঙ্গে আমেরিকা ও সোভিয়েত-এর মধ্যস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করে ভারতের অহিংস অবস্থানের কথা তিনি গ্রন্থটিতে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

চার

হুমায়ুন কবির রাজনৈতিক-সচেতন মানুষ হিসেবে তাঁর আমলেই সামন্ততন্ত্রের ভাঙন যে আসন্ন ছিল সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। এমনকি এর পরবর্তীকালে ধনতন্ত্রের ধ্বংসও যে অনিবার্য হয়ে উঠবে সেটাও তিনি মনে করতেন, "ধনিকের মুনাফা বাড়াতে গেলে ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হয়, ক্ষুধিতের ক্ষুধার অন্ন জোটাতে হলে ধনিকের মুনাফা থাকে না। এককথায় ধনতন্ত্রবাদের ভাঙন আজ স্পষ্ট।" শোষিত মানুষের স্বরূপ সবসময় একই ধরনের থাকে। সে শিক্ষিত হোক বা চাষি-মজুর হোক কিন্তু বেকার বলতে যে শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বোঝানো হতো, তিনি সবসময়ই এ বিষয়টিকে আরও ব্যাপক রূপে দেখতে সচেষ্ট হতেন, " তবে বেকার সমস্যা বলতে আমরা সাধারণত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমস্যার কথাই ভাবি। আমাদের চোখে অশিক্ষিত বঞ্চিত চাষি মজুর তো আর মানুষ নয় যে তাদের সমস্যার কথাও আমাদের ভাবতে হবে!"

কাজেই বোঝা যাচ্ছে বেকার সমস্যাকে তিনি দেখতেন সার্বিকভাবে এবং এই সমস্যা যে শুধু ব্যক্তির নয় বরং শাসনতন্ত্রের, তিনি সেভাবেই বিষয়টিকে দেখতে

স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। "কার ভাগ্যে কাজ জুটল এবং কে বেকার রইল, সে সমস্যা কি শুধু ব্যক্তির সমস্যা; সমাজের বা শাসনতন্ত্রের সঙ্গে যেন তার কোনো সম্বন্ধ নেই।" তৎকালীন অখণ্ড ভারতের প্রধান সমস্যা আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতার চেয়েও ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া এবং ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন জোগাড় করাকে বড় করে দেখেছেন "স্বাধীনতার দাবি সেখানে মেটে না, ক্ষুধায় যে দেশে অন্ন জোটে না, মানুষের মনুষ্যত্ব সেখানে পদে পদে অপমানিত, সে দেশে কি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সবচেয়ে বড় করে দেখা যুক্তিসঙ্গত?" ক্ষমতাসীনদের সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক ছিল; বিশেষ করে যারা ব্রিটিশদের ও অন্যান্য বিদেশিদের ওপর নির্ভর করে জনগণের মুক্তি আসবে বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে তিনি নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই মুক্তি সম্ভব বলে সবসময় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়, "তাঁদের কথায় মনে হয় যে রাজনৈতিক সংগ্রামের বাইরে থেকে, রক্ষাকবচ দাবি করে, বিদেশির সঙ্গে রফা করে, তাদের ওপরে নির্ভর করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারব। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে সংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তিশালী হবার কোনো উপায় নেই। জলে না নেমে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, ডাঙ্গার সমস্ত কসরৎই যেমন জলের মধ্যে নিরর্থক, পরাধীন দেশে মুক্তিসংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের স্বপ্ন তেমনি নিরর্থক। জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, বেদনার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে শক্তিশালী হতে হবে। ত্যাগ এবং দুঃখ স্বীকার ভিন্ন শক্তি অর্জনের স্বপ্ন বাতুলতা, কাঁচের ঘরে বসে মোমের পুতুলের মুখে শক্তির কথা শোভা পায় না।" আজকের বাংলাদেশ ভীষণভাবে এই বিদেশ-নির্ভরতায় নিমজ্জিত, এর থেকেও উত্তরণের একমাত্র উপায় হুমায়ুন কবির নির্দেশিত পথ। তিনি বারবার নিজেদের শক্তি অর্জনের ওপর জোর দিয়েছেন। কেননা তিনি গভীরভাবে এ-ও মনে করতেন, "শক্তি না থাকলে সন্ধির কোনো মূল্য নেই।"

হুমায়ুন কবির তাঁর সময়ে যে সমস্যাগুলোর কথা ভেবেছিলেন, আজকের বাংলাদেশে সে-সব সমস্যাই প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এর দার্শনিক কারণগুলো সেই সময়ই তিনি ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ধনিক, মুনাফাখোর, ধনতন্ত্রবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের যে কী সূক্ষ্ম বিরূপ পর্যবেক্ষণ ছিল তা বোঝা যায় তাঁর লেখা থেকেই, "যখন ধনিক দেখে যে তার লাভের পরিমাণ কমে এসেছে, তখন সে খোঁজে পৃথিবীর কোথায় জীবিকার মান নিচু, কোথায় কম মজুরিতে মজুর মিলবে, কোথায় জায়গা জমির দাম নামমাত্র। ধনতন্ত্রের এই স্বাভাবিক পরিণতিতে ধনিকের অর্থ বিদেশে চলে যায়। ধনিক ইংরেজ চেষ্টা করে যে তার অর্থ ভারতবর্ষে খাটিয়ে মুনাফার মাত্রা বাড়াবে। মুনাফার মাত্রা তাতে বাড়ে, কিন্তু তাতে ধনতন্ত্রবাদের বিপদও ঘনিয়ে আসে। একেতো বিভিন্ন স্বাধীনদেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশে প্রত্যেক দেশই চায় যে কেবলমাত্র তার জিনিষই সমস্ত জগতে চলবে, প্রত্যেক দেশই চায় যে

তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে সূর্য ডুববে না। তারপরে এসে জোটে অধীন এবং অর্ধ-অধীন দেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ। সেখানেও কিন্তু বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ধনিকেরই স্বার্থ জড়িত। ফলে যুদ্ধ বাধতে আর দেরি লাগে না। মানুষ শান্তি ও প্রগতির বাস্তবরূপ ভুলে গিয়ে মোহের টানে আত্মবিনাশে মেতে ওঠে।"

ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান নিতে গিয়ে তিনি ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ গড়ার ভয়াবহতা যে শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সেটা ইংরেজের নিজের দেশেও ছড়িয়ে পড়বে তিনি সেটা তখনই টের পেয়েছিলেন, "আজ আমরা শিখেছি যে ইংরাজ ভারতে যে সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছে, তার প্রভাব কেবলমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিলেতে ইংরেজের নিজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও তাতে বিষিয়ে উঠছে।" আজকের যুগে ইংরেজ যুদ্ধবাজ ও বিনা কারণে মানুষ হত্যার দায়ে যে বিশ্বের কাছে দায়ী সেটা সেই আমলেও ছিল তবে সময়ের ব্যবধানে ইংরেজ তথা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সেই সাম্রাজ্যবাদী রূপ আরও অনেক চাক্ষুষ হয়েছে, যে কথা হুমায়ুন কবির অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তখন বলেছিলেন।

সাম্যবাদের নামে যে কখনো কখনো এর মূল আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে সাম্যবাদের ভুল ব্যাখ্যাত পথে যুবসম্প্রদায় চালিত হতে পারে, সে সম্পর্কে হুমায়ুন কবির সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন এভাবে, "প্রত্যেক দেশই বলেছে যে তার অভিযান কেবলমাত্র ন্যায়ের জন্য, সত্যের মর্যাদায়। কিন্তু যুযুধমান প্রতিপক্ষ দেশগুলি সকলেই ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে, সে ন্যায়ের, সে সত্যের স্বরূপ কী? তাই দেশে তরুণেরা ভাবতে লাগল– যুদ্ধ কেন? যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য কী? কোন অভিলাষ, কোন আদর্শ সাধনের জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের এ সংগ্রাম? সেই আত্ম-বিশ্লেষণ, সেই ভাবনার ফলেই ছাত্র আন্দোলনের জন্ম।" বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে হুমায়ুন কবির ছিলেন প্রথম আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। বৃটিশদের সঙ্গে উচ্চবিত্তের হিন্দুদের বেশ দহরম-মহরম ছিল কিন্তু নিম্নবর্গের হিন্দুদের প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাবও ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও নির্যাতন শোষণের। সেখানে বাঙালি মুসলমানদের প্রতি উচ্চবিত্তের হিন্দু ও ব্রিটিশদের মনোভাব কতটা নেতিবাচক ছিল সেটা বলাই বাহুল্য। হুমায়ুন কবির সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের মুক্তির কথা বলেছেন কোনো রাখঢাক না রেখেই। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানরা যেন কারও করুণার পাত্র না হন, বরং সব ধরনের প্রতিযোগিতার মুখে মুসলমানরা নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করুক। কাজেই খণ্ডিত ও সাময়িক কোনো সুবিধা নেয়ার জন্য সব ধরনের করুণা-নির্ভর চুক্তির বিপক্ষে ছিলেন তিনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন, "তাই হিন্দুর সঙ্গে যাঁরা চুক্তি করতে চান, বলেন যে চুক্তি না হলে, ভাগবাটোয়ারা ঠিক না হলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে, স্বাধীনতা কি কেবলমাত্র হিন্দুরই কাম্য? সে স্বাধীনতায় কি আমাদের দাবি নেই? আর যদি চুক্তিতেই আমরা বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাসের ভিত্তি যে কত দুর্বল তা বারে বারে দেখেও কি আমরা

শিখব না?" অখণ্ড ভারতে বাঙালি মুসলমানেরা নিজেদেরকে মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করায় তিনি একে তিরস্কার করেছেন কঠোর ভাষায়। বরং সংখ্যা দিয়ে শক্তিকে পরিমাপ করার বিপক্ষে সবসময়ই তিনি মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন "সংখ্যালঘু বলে সর্বদাই ভয় পাই, সর্বদাই মাইনরিটির বিশেষ ব্যবস্থা খুঁজে বেড়াই। কিন্তু সাত কোটি লোককে কি সত্যি সত্যি মাইনরিটি বলা চলে? সাতকোটি লোক দূরের কথা, সাতলক্ষ লোকের মধ্যেও যদি তেজ থাকে, নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে পৃথিবীতে কাকে তারা ডরবে? আমরা এ কথা কেন ভুলে যাই যে মুসলমানের যেদিন গৌরবের দিন, যে যুগের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস, সে যুগে মুসলমান সর্বত্র এবং সর্বদাই মাইনরিটি ছিল এবং সেই মাইনরিটি সাত কোটির মাইনরিটি নয়, সে মাইনরিটি ছিল কোথাও সাত শতের মাইনরিটি, কোথাও বা সপ্তদশ অশ্বারোহীর মাইনরিটি। আজও যে ইংরেজ আমাদের দেশে প্রভুত্ব করছে, সে কি সংখ্যাগুরুত্ব দিয়ে?"

হুমায়ুন কবির বুঝেছিলেন হিন্দু মানেই মুসলমানের প্রতিপক্ষ নয়; বরং হিন্দুকে তিনি দেখেছিলেন শ্রেণীগতভাবে বিভাজিত করে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তের হিন্দুর সঙ্গে তিনি নিম্নবর্গের হিন্দুকে এক করে দেখেননি। তাঁর এই চিন্তা পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় ভারতের জাতীয় সংগীত হবে কোন্ গানটি সেই বিবেচনা ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়ে, "সাম্প্রদায়িক সমস্যাও আজ যে এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মূলে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি। 'বন্দেমাতরম' জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে Indian Affairs-এ বুদ্ধদেব বসু এবং আমি গত জানুয়ারি মাসে খানিকটা আলোচনা করেছিলাম এবং দুইজনে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলাম যে খানিকটা ধর্মের ধোঁয়াভরা, খানিকটা ভাবালুতায় অস্পষ্ট সে গানটি হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের কল্পনা হিসাবে কার্যকরী বটে, কিন্তু ভারতের বঞ্চিত নিরন্ন নির্বস্ত্র জনগণের কাছে তার বিশেষ কোনো মূল্য নেই।" একইভাবে তিনি মুসলমানদের কথা বলতে গিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মুসলমান থেকে নিম্নবর্গের নিরন্ন মুসলমানদের একেবারেই আলাদা অবস্থান আবিষ্কার করেছেন। তৎকালে মুসলিম লীগ যে শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মুসলমানদেরকেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, সেখানে যে নিরন্ন দরিদ্র মুসলমানদের স্থান ছিল না সেটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হুমায়ুন কবির উল্লেখ করেছেন, "মুসলিম লীগ যে আজ মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করেছে, তারও মূলকথা এই শোষণের ক্ষমতাকে আবরণ করা। সমস্ত মুসলমানের স্বার্থ এক–এ কথার উপরে ঝোঁক দিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে যদি ভুলিয়ে রাখা যায়, তবে তাতে মুষ্টিমেয় মুসলমান অভিজাত এবং মধ্যবিত্তেরই লাভ। ভারতবর্ষে আজ যে কলহের তাণ্ডব, তারও মূলে এই নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থ-সংঘাত। .... তাদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত যে কেবলমাত্র ব্যক্তি বা শ্রেণীগত স্বার্থেরই সংঘাত, এ কথাটি স্পষ্ট করে

বুঝলে মুক্তির সন্ধানও আমরা সহজেই পাব।... শ্রেণীস্বার্থের প্রাবল্যে সমগ্র বিশ্বসভ্যতার যে বিপদ, তাকে উপলব্ধি করেই ছাত্র আন্দোলনের জন্ম।"

তিনি বারবার একটি কথা বলেছেন যে, হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানকে হিন্দুর বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ফায়দা লুটেছে।যার ফলে আসলে বাস্তবে কী ঘটেছে সেটাও হুমায়ুন কবিরের ভাষায় আমরা জানতে পারি, "তার ফলে দেশের বিপ্লবী জনশক্তিকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে ব্যবহার না করে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মধ্যে তার আত্মহত্যার চেষ্টা করা হয়।" হুমায়ুন কবির দেশের উন্নতি চেয়েছিলেন অত্যন্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সে চাওয়া খণ্ডিত কোনো চাওয়া ছিল না, এমনকি তার মধ্যে কোনো ধরনের আপোষকামিতা ছিল না। সে কারণে দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দেখতেন। দেশ ও জনগণের সাময়িক লাভালাভের তুলনায় দীর্ঘকালীন সুবিধা ভোগের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ নজর। তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক ভাবনা ছিল এমন, হতাশা নয় বরং এখনই শুরু করা যাক তাতে নিশ্চয়ই একদিন জনগণের সমস্যার সমাধান হবে। তাঁর ভাষায়, "উত্তরভারতে হিন্দুর মন্দির নির্মাণেও মুসলিম রীতির প্রভাব, মুসলমানের মসজিদের ভারতীয় বিকাশেও হিন্দু স্থপতির ছায়া। যে দেশেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস, সেখানেই রাজকীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে পার্থিব এবং ধর্মনিরপেক্ষ না করলে সমস্যাসৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী।"

আমাদের উন্নতির ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখার স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের সুসম্পর্কের প্রতি তিনি বারবার জোর দিয়েছেন। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতিও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, "আমরা যদি আজও এ সব বিষয় ভাবতে শুরু করি, কোনো জিনিষই বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে অন্ধের মতো স্বীকার করে না নিই, তবে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, দেশের এ দুর্দশা ঘুচবেই।"

সার্বিক ও চূড়ান্ত মুক্তির পথ একটাই– সেটা হল জনগণের সংগ্রাম। এই আন্দোলন সংগ্রামের যে বিকল্প নেই হুমায়ুন কবির সারা জীবন সে-কথা বলে গিয়েছেন। ইদানিং জোড়াতালি দিয়ে জনগণের মুক্তির কথা রাজনীতিকগণ বলেন, যে ধারাটি তখনও ছিল। হুমায়ুন কবির কূটকৌশলী অথবা দায়সারা গোছের এ ধারাটি সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন, "দেখেছি যে সংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার স্বপ্ন বাতুলতা। দেখেছি যে শক্তির উৎস স্বাধীন মনোবৃত্তি, সতেজ চিত্তবল, যার বলে মানুষ একাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি পায়, নিজের অন্তরের সত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আর কারু অপেক্ষা রাখে না।"

ক বি তা

....

একুশ জন কবির একুশটি কবিতা

১.

শ হী দ কা দ রী

....

যাই, যাই

আজ আবার আমার ইচ্ছে হলো যাই
বর্ধমানে, সেই একটুখানি ইস্টিশনে,
হাই তুলতে তুলতে যাই বটগ্রামে শিউলিতলায়
যেখানে দাঁড়িয়ে আমি কোনোদিন ফটোগ্রাফ তুলি নাই
হে আমার মোরগের চোখের মতন খুব ছেলেবেলা!

চলো তাকে তুলে আনি, তবু বলো
আগে কেন আনি নাই? অথচ স্বপ্নের মধ্যে
শিউলি-গাছের মতো আমার মা দারুণ সুগন্ধ
সঙ্গে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে টান দেন কনিষ্ঠ আঙুল।
কপিকলে উঠে-আসা মধ্যাহ্নে কুয়োর ঠাণ্ডা পানি
আমাকে আবার তুলে দ্যায় নতুন শরীর ধরে
সেই সুপ্রাচীন সাঁওতাল ! তার ছবি নেই কেন
এ্যালবামে? সে কি শিমুলের মতো উড়ে
চলে গেছে শালবনে ? কণ্ঠ তার মহুয়ায়

মাদলের বোলে, জন্মে-জন্মে, অন্যকোনো জন্মান্তরে
জাগ্রত হবে না আর ? যদি হয়, আজ তাই
যা কিছু এড়িয়ে গেছি, আড়ালে রেখেছি
আমার নিজের মধ্যে, কবিতার ক্লান্ত শব্দে, বারবার
ফিরিয়ে আনতে চাই। আজ আবার আমার

ইচ্ছে হলো যাই, এই রঙ-বেরঙের শার্ট-জামা-জুতো,
মাছ থেকে মাছের আঁশের মতো কৌশলে ছাড়াই... যাই...
একটি নতুন নম্র বীজ হয়ে, বকুল অথবা
চামেলীর ছদ্মবেশে এক্কেবারে শব্দহীন চলে যাই ।

২.

র ফি ক আ জা দ

....

যোগাযোগ

দূরত্ব তেমন নয়, অনুল্লেখযোগ্য বলা চলে;
কেবল একটি নদী, সেতু ছিলো এপারে-ওপারে ।
ওপারে সবুজ গ্রাম, গ'ড়ে ওঠে নগর এ-পারে;
লরিতে বোঝাই হ'য়ে প্রতিদিন ইট-কাঠ আসে
বিভিন্ন ঠিকানা থেকে– আসে নিত্য নব আসবাব;
অসংখ্য মুখের ভিড়ে স্ফীত হয় নতুন নগর–
নবতর মূল্যবোধে জাগে দ্রুত এ-পারের ভূমি ।

সবুজ গ্রামের যুবা চ'লে আসে নতুন নগরে:
বুকে স্তব্ধ জোয়ারের জল– শান্ত, কল্লোলিত নয় ।
যুবকের চ'লে-আসা দ্যাখে এক ভীরু ভালোবাসা
সবুজের আড়ালে গোপন করে নহুলী যৌবন ।

একদা ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ে আবশ্যিক সেতু ।

ক্রমান্বয়ে ব্যবধান বেড়ে যায় এ-পারে, ও-পারে
পাল্টে যেতে থাকে ভাষা, উভয়ের জীবনযাপন...

৩.

অ সী ম সা হা

....

প্রত্যাশা

থাক তবে থাক, পৃথিবী ঘুমাক, আমরাই থাকি জেগে;
পেতে দিই বুক, হৃদয় জ্বলুক, ঝঞ্ঝা যতোই বেগে

আসুক এদেশে, মাটি ভালোবেসে, মানুষকে নিয়ে সাথে,
ধনতন্ত্রের মৃতদেহ ফের শ্মশানে পোড়াবো রাতে ।

ভেঙে গেছে রাশা', তবু ভালোবাসা সঞ্চিত আছে রণে
ভেনিজুয়েলায়, নর্থ কোরিয়ায় এখনো সঙ্গোপনে

রয়েছে যে ভ্রূণ, তা হবে আগুন, কাস্ত্রোর পথ ধ'রে
বিশ্বাসে তাই, আজো টের পাই, থাকি না ঘুমের ঘোরে ।

পৃথিবীকে যদি, শান্তির নদী, ক'রে নিতে চাই ফের
ভাঙতেই হবে, তবে অর্ণবে ভিড়তে দেবো না চে'র

আদর্শে যারা, নয় আজো খাড়া, সাহসী নয় যে বুক
তাদেরকে ফেলে, দুই চোখ মেলে আজো যারা উন্মুখ

তাদেরকে নিয়ে, অণুবোম দিয়ে, প্রবল বিস্ফোরণে
কাঁপাবো পৃথিবী, যারা চিরজীবী, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে

লিখবে তখন, যে যার মতন, সাম্যের যতো গান
রাশিয়াই এসে, সব দেশে দেশে, জাগাবে নতুন প্রাণ ।

লেনিনের চোখ, হবেই অ-শোক, মার্কস-এঙ্গেলস এসে
পৃথিবীকে তাঁর, সাজাবে আবার, মানুষকে ভালোবেসে ।

১১. ০৯. ২০০৯

৪.

স মু দ্র গু প্ত

....

অনন্ত উচ্চতায় বিজয়বৃত্ত

ঝট করে তাকাতেই সরে যায় ছায়া
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে সম্ভবত
ছায়া এসে দাঁড়ায় সেখানেই
তা না হলে, কেন
ঝট করে তাকাতেই সরে যায় ছায়া

কার ছায়া কিসের ছায়া বোঝা মুশকিল
কখনো কাঠামো থাকে
আকৃতি ও অবয়ব দেখে বোঝা যায় মানুষ
কিংবা অন্য কোনো প্রাণী
পাখি ও পতঙ্গ কিংবা মেঘ
বৃক্ষ গৃহ কার্নিশ পাহাড় বা আকাশ
বোঝা যেতে পারে নারী বা পুরুষ কিন্তু,
প্রায়ই বোঝা যায় না
কোন পাহাড় কোন বৃক্ষ
কোন আকাশের কাহাদের মেঘ

কার ওপর আলো পড়ে ছায়া হচ্ছে
তাকাতেই কে আড়াল থেকে আড়ালে সরে যায়
সরে যায় ছায়া
কেবলই কি বস্তুমাত্র, দেহটা শরীরী
অথবা সে বস্তু নয় কেবলই কাঠামো
ধারণার ধূপ
আবেগ ও ক্রোধের আক্ষেপে উড়তে উড়তে
কাঠামো পেয়েছে

৫.

দা উ দ হা য় দা র

....

সংগোপনে

উদ্বাস্তু আর নির্বাসিতের মৌল তফাত কী
এই নিয়ে আমাকে বলতে হবে
পর্তুগালে, রাজধানী লিসবনে

যে-আমি নানান প্রান্তর ছুঁয়েছি,
এমনকি ফেলে-আসা বাল্যের শৈশব;
তাই নিয়ে বক্তৃতা, আজকের Mission-এ?

বক্তৃতার বিষয়টি সংগোপনে
এড়িয়ে নিজেকে প্রতিপন্ন করি
আমিই কি নই তোমাদের বান্ধব, শ্রীহরি?

৬.

কা মা ল চৌ ধু রী

....

শিরোনামহীন

বাহ্যত আমি আকাশ কুড়াতে এসে
তোমাকে দিয়েছি সাধারণ রতিকাল
গ্রীবা ভঙ্গুর অচেনা সড়ক পথে
ওঁৎ পেতে থাকে পাখি শিকারির জাল।
কিছু ধ্বস নামে বিগত লুপ্ত স্রোতে
কিছু স্মৃতিমুখ হারানো বর্তমানে

ব্যাকরণ ভুলে উপগত অধিকাল
উৎকেন্দ্রের প্রথাগত চোখে হানে ।

কিছু পাখিকাল শুকনো পাতায় হাঁটে
কিছু মর্মরে বান্ধব আজো ধূলি
পাতা কুড়োনিকে বলেছি তোমার কথা
সে এসে ফোটাক লুণ্ঠিত ফুলগুলি

আকাশ পর্বে নিম্নবর্গ আজো
যাপিত স্বপ্নে বহু অধিকার বাকি
জেলে পাড়া থেকে নগরের প্রশ্রয়ে
ভালোবাসি তবু শিরোনামহীন থাকি ।

৭.

শে খ বা তে ন

....

সম্ভাবনার সূত্র

দুঃসময়ের আঁধার ছিঁড়ে
আগুন জ্বলুক জমাট ক্ষোভে
ধর্ষণে কার রক্তক্ষরণ
ঝাঁকড়া গুলির লাশ পড়েছে
সকাল-বিকাল আগামীকাল
খুন-প্রকল্প খুনের গল্প
স্বর্গে আছে' আমরা সবাই–
ক্রসফায়ারের ধন্ধ-ধোঁয়ায়
উড়ছে উড়ুক তাবৎ মুলুক
চাই ক্ষমতার শুক্লপক্ষ
ভাবছে যাবে–

আগুন জ্বলুক সম্ভাবনার
বৃষ্টি নামুক অগ্নিকণার
মরলো মরণ নিজের হাতে!
পড়লে পড়ুক কার কী তাতে
নিয়মমাফিক যখন তখন
নিত্যখুনে খুনী শাসক
মর্গে যাব, এইতো কথা?
খাচ্ছে খাবি আমজনতা
একের পর এক বিস্ফোরণে
আপন লক্ষে, বিস্মরণে
যাচ্ছে যেমন অনন্তকাল

হিসাব আছে অন্য কিসিম–
তৃতীয় দাগের মরণ কামড়
মানুষ আছে মানুষ বাঁচে
জনোচ্ছ্বাসে জীবন আসে

ছেচল্লিশ ও একাত্তরে
শাণায় বাঙলা অতঃপরে
সময় হলে টেনে নামায়
অগ্নিরঙের সূর্যকণায়।

৮.

খো র শে দ বা হা র

....

তখন সন্ধ্যা

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। সেজেছে আকাশ কৃষ্ণ কালো মেঘে।
থমথম নীরব, নিথর প্রকৃতিতে হৃৎস্পন্দন শুধু, জেগে রয়।
যেমন জেগে থাকে আকাশের চাঁদ সূর্য ওঠার ক্ষণে।
শৃঙ্খলিত দুই পাখি মুখোমুখি মুদিত নয়নে বসে থাকে অজানা আবেগে।
বালিয়াড়ি ঝড়কে বুকে নিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষায় উন্মীলিত যুগল দৃষ্টি তার।
থেমে গেলে ঝড়, নামে বৃষ্টি করুণ ধারায়, অঝোরে।
শব্দহীন, গতিহীন জলের ধারায়, সংকুচিত মনে ফিরে আসি অন্ধকার চিরে।

আকাশ কাঁদে মনের সুখে,
বুকের যত জমাট যন্ত্রণা গলে গলে মিশে যায় খালে বিলে।
একদিন পরিচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় ভোরের পাখিরা গাইবে গান,
হাসবে আকাশ, মিটমিট তারারা ছড়াবে আলো।
কিংবা এক ফালি চাঁদকে সাথে নিয়ে পুলকিত রাত্রি হবে ভোর।
আমার মনের আকাশ শুধুই জলাকীর্ণ,
তোমার টলটলে নয়নে যত অশ্রু জমা আছে যতদিন।

৯.

কা ম রু ল   হা সা ন

....

শেরপুরের পথে

সমর্থ দালানগুলো পেরিয়ে এলেই নড়বড়ে ঘরবাড়ি
কংক্রিটের জঙ্গল ছাড়িয়ে সৌম্য প্রাকৃতিক বনভূমি
পিচ পেরুলেই ধানক্ষেত, শালবন, চাঁদের জুড়নগাড়ি
সভ্যতার আড়াল পেরুলেই প্রকৃতির নিরাভরণ গা
আশাহীন, উন্নয়নহীন হাজার বছর আগেকার গ্রাম
যেন সামন্তযুগ ফেলে আমাদের হয়নি সমুখে যাওয়া
নদী আরো শীর্ণ হয়েছে ঐ কৃষকগাত্রের মতো
কেবল সূর্য আজো ভারী দয়াময়, প্রকৃতি উদার
হাওয়া বয় যেন মত্ত শোঁ শোঁ রেলগাড়ি
সূর্য আদরে স্নেহের প্রলেপে ওরা হলো এত কালো
আজো আসেনি কোনো আলো, বিদ্যুতের দ্যুতি, ঝিলিক
কালো তরবারির মতো সেই পথে চলেছে আমাদের গাড়ি
ঐ নগরের প্রতীক, গ্রামের কৌমার্য ভেঙে উদ্ধত ছুটে যায়
সঙ্গে ছুটে আসা হা হা ক্ষুধার্ত মানুষ, নাঙ্গা শিশুদের দল
রাত্রির চাঁদ চলে পাশাপাশি, চাঁদের অভুক্ত জোছনায়
খাবি খেল কত মাছ, পুচ্ছের তেজ হারানো ময়ূরী নদী
ব্রহ্মপুত্র তার অতীতের ধূসর ছায়া, মৃতপ্রায় পুত্র ঈশ্বরের ।

শেরপুরের পথে আমরা কতিপয় কবি শহরের আশ্চর্য গ্রামছবি!

১০.

মা সু দ   খা ন

....

প্রত্যাখ্যান

হঠাৎ মায়ের স্তন্য থেকে, আজই, উৎখাত হয়েছে শিশু
ঘুরে ফিরে বারে বারে যায় তবু মায়ের নিকট
বকা খায়, কিছুটা অবাক হয়, তবু শিশু যায়...

অবুঝ কি আর বোঝে কী-বা অর্থ হয় এই উৎখাত-কেলির!
কী-বা এর বিন্দু ও বিসর্গভাব
কিছুই পারে না বুঝতে মায়ের স্বভাব
শুধু ভাবে– মায়ের কৌতুক তবে এতটা নিষ্ঠুর!
মাতা কেন হয় আজ এতটা বিমাতা
এই খরাঋতুতে হঠাৎ?

ভেবে একা কষ্ট পায়, নিঃসহায়, ফের তবু যায়
শিশু ফের বকা খায়, আবার অবাক হয়, তবুও সে যায়...

কেঁদে কেঁদে অবশেষে বোবা অভিমানে
অবশ ঘুমিয়ে পড়ে মাটির শয়ানে।

শুধু তার পিপাসার ধ্বনি এসে লাগে কানে
থেকে থেকে, এই মহিমগুলের এখানে ওখানে।

১১.

ব্রা ত্য রা ই সু

....

ত্রিদিব দস্তিদারের মৃত্যুকামনায়

একজন কবি ত্রিদিব দস্তিদারের মৃত্যু
কামনা করছি আমরা ।

কিন্তু ত্রিদিব মরে গিয়েছেন
এখন আর কোনো কামনায় কাজ নাই ।

ত্রিদিব দস্তিদারের মৃত্যু কক্সবাজারের বালিগুলি আরো চকচকে করে তুলবে?
তুলবে না তাই মৃত্যুকামনা সঙ্গত বলা যায় ।

কক্সবাজারের সমুদ্রপাড় কি ত্রিদিবকে মনে রাখছে?
রাখছে না তাই ত্রিদিব দস্তিদারের মৃত্যু কামনা করছি আমরা ।

ত্রিদিব আপনি মরে গিয়েছেন, ত্রিদিব আপনি মরে গিয়েছেন,
ধরাধামে আর আপনার চান্স নাই ।

ত্রিদিব দস্তিদারের মৃত্যু কাগজেপত্রে বিধিলিপি হওয়া
তার বাঁচবার আশা নাই আর
কাগজেরা নিশ্চিত ।

নিশ্চিত তাই মৃত্যুকামনা সঙ্গত হওয়া সম্ভব ।

১২.

শ রী ফ   শা হ রি য়া র

....

ভাঙা পদ্য

কেউ তবে রচিত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে!

হাওয়া গুমোট নিঃশ্বাসের ঘন বাষ্পে

দেহঘরে শাখাচ্যুত পাতার মর্মর

উজানে স্থির দাঁড়ানো প্রপঞ্চের স্বর

পিছনে তাকালে এলোমেলো হিসাবের খাতা

ভাঙা হরফের ছায়াময় প্রতিটি পাতা, যা

উল্টালে ক্রমশ খুলে যায় সময়ের সাজ

ভুল রায়ের দণ্ডাজ্ঞা নিজ কাঁধে ব্যক্তি আজ

নতমুখ, ঠোঁটে ঝুলে আছে বাক্‌হীন তালা

গান নিরুদ্দেশ, প্রজাতন্ত্র প্রেত-বাতুলতা ...

১৩.

মু জি ব ই র ম

....

দু'টি খণ্ড কবিতা

আমি যখন শেলীর সাথে বাজার করতে যাই

দুই

হেঁটে হেঁটে মানুষ আর বিলাস দেখি। ভোগ আর আভিজাত্য দেখি। এ গ্রহের
এক পুঁজিরাজ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে এশিয়ার চোখে দেখি তাবৎ বিস্ময়।

এখন বিলাসী দিন। পুঁজিকাল। ভোগসাল। এ গ্রহের কিছু কিছু মানুষের বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখি, আর আমার বন্ধুর মুখ মনে পড়ে। এ শীতের দেশে বাদামি ত্বকের চোখ বিস্ফারিত চোখে দেখে পুঁজির বাহার। আর এখানেই শুয়ে আছেন মার্কস। আমার বন্ধুর স্যালুট যেনো দিয়ে আসি তাহার রওজায়, দূর এশিয়ার।

এ গ্রামে আসার পর আমার মাঝে যা যা ঘটলো

তিন

এ পুঁজিগ্রামে এখন অফিস ছুটি হবে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াই। আকাশে ভাসছে মেঘ। শরতের মেঘ। আমি ভাবি–সে আমার কালিদাসের মেঘ, দূর অলকার। সে আমার দেশের মেয়ে, দূর এশিয়ার। আমি তাকে কুশল জিগাই। হাওয়া আসে। গ্রীষ্মশেষের পাতাগুলো ডানা পেয়ে ঝাঁপ দেয় মেঘে। আমি দেখি, ফিকে লাল পাতাগুলো সারাটা আকাশ জুড়ে করে যাচ্ছে খেলা।

এইসব মেঘমেয়ে পাতাপাখি আর এ গ্রীষ্মশেষের হাওয়া–আমাকে কেবলি দেয় পরিচিত মায়া, যেনো বা আপন কোনো দূর বাংলার।

১৪.

কা ম রু ন   জি নি য়া

....

আপনার স্বপ্নভঙ্গের জন্যে দুঃখিত

আপনার স্বপ্ন ছিলো
আমার সকল সম্ভাবনার নির্দেশক হবার
আপনার কথামতো
উঠবো-বসবো, চরবো-থামবো, হাসবো অথবা কাঁদবো।
আপনার শেখানো বুলি আওড়িয়ে যাবো যখন তখন
আপনার প্রয়োজনে।
আমার মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাকে উল্টোস্রোতে
কাজে লাগিয়ে
পার হবেন একটির পর একটি স্বার্থান্বেষী সিঁড়ি।
প্রভু হয়ে একদিন আমাকেও করবেন আপনার কিছু
তোষামুদেদের একজন।

দুঃখিত, আপনার স্বপ্নভঙ্গের জন্যে
আমাকে নিয়ে এ ধরনের অলীক স্বপ্ন দেখার জন্যে।
আদ্যন্ত দাসত্বের বিপক্ষে আমি, মুক্তিপ্রেমী
ভীষণ অসম্ভবেও।
প্রচণ্ড রোদে, খরায়, তুমুল বৃষ্টিতে, ঝড়ে
আহত বা নিহত হবার সকল সম্ভাবনা জেনেও
দু'ডানায় ভর করে উড়তে চাই সুনীল আকাশে
যখন আমার খুশি।

সিঁড়ির চেয়েও বেশি ভালোবাসি কৃষ্ণচূড়া,
শর্ষে ক্ষেত, আকাশ, জীবনানন্দ
আর নোনা জলকে।
আমাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার
আপনার চালাক-চতুর স্বপ্নকে তাই
পুড়িয়ে দিলাম উনুনে, আমি আমার মতো করে
বাঁচবো বলে।

১৫.

শা মী ম   সি দ্দি কী

....

মহুয়া

উৎসর্গ : মর্তভূমির স্বর্গখণ্ড জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশস্ত পাতারা জাগে
সবুজের গন্ধ মাতামাতি
মায়াভরা ছোট ছোট বন
হলুদ পাখিটি উড়ে
ডাল থেকে চালে এসে বসে
অরণ্যের গাছপালা কেটে
গনগনে আগুনে তার
সিদ্ধ হয় গার্হস্থ্য জীবন

তির্যক নীল বিস্তারিত আনন্দ আকাশ
গাছপালা-জলাশয়
হিম হিম সুগন্ধ দুপুর
শীত-হৃদয়ের মধু
পাখিময় কেঁপে উঠেছিলো
অন্তপ্রাণ হারানো সাপ
মণির জন্যে যেই মতো বিভোর ব্যাকুল
তোমাকে দেখার কালে
সেই মদমত্ত হয়ে
রুদ্ধশ্বাস ধরতে গেছি
দিশাহীন জলাভূমি রৌদ্রখেলা ভেঙে
ঋতুর পৃথিবী
ধরছে গেছি
তোমাকে বা নিজেরই সত্তাকে
আর তুমি ছুটতে থাকলে ভয়ে
কী দুর্মতি! কী ব্যাগ্রত!

ছুটে যাচ্ছ প্রাণান্তকর
আমার স্পর্শ থেকে
লোকোত্তরে
অন্য কোনো গ্রহে
যেন আমি মানুষই নই
যেন ব্যাঘ্র, তুমি
হরিণী শাবক

জীবনেরই আশ্চর্য মহিমা
ছায়া-কায়া মরীচিকা
একান্ত পালানো ছাড়া মোহ কিংবা রতি
অন্য কিছু ছিলো না তোমার
পিছে ছুটে দিশেহারা
আমার সঙ্গতি
যতো তীর, বর্শা পরাভূত

দশ দিগন্ত সমস্ত সাধ ভুলে
স্বপ্ন, অহং পরিমিতি
তুমুল বিপুল
প্রাণের প্রেরণা নিয়ে
যেইমাত্র স্পর্শ করবো
আশ্চর্য, তখনই তুমি
সবুজ একটি মহুয়ার
গাছ হয়ে গেলে!

হতভম্ব, নির্বাক
মহুয়াতলার কাছে
গতিহীন, ছন্দহীন
কেবল তাকিয়ে আছি

ডালে ও পাতায়
যেখানে তোমাকে নিয়ে
খেলা করবে
দিনে হাওয়া, রাদে চাঁদ
শিশির গহীন

বন থেকে কেটে আনা কাঠ
সিদ্ধ করে গার্হস্থ্য জীবন
দিনরাত অন্তহীন
ক্লান্তিঘেরা বাসনা সিঞ্চন

ডালগুলো বিমর্ষ হয়েছে
আমি কাঁদি
শীতের চাঁদের রাতে
রূপবতী,
মায়াভরা রূপ ভেবে কাঁদি
জীবনের ভাষা থেকে পলায়নপর
সুরম্য চেতনা খুঁজে
কাঁদি আমি
শিশির ছোঁয়ায় মাটি
মৃদু মৃদু সুগন্ধ ছড়ালে

১৬.

ম ধু মি তা   চ ক্র ব র্তী

....

বৈরী সময়

বৈরী সময় ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় যে আজ ফেলবে,
উল্টোস্রোতে বৈঠাটানি– কালা পানির ছলছলানি
ধরতে যা চাই সুদূর সবই– অলীক মোহের শেষ পাড়ানি
ভাঙা কাঁচের আয়নাখানি–
        শুধুই কি তাই ত্রিভঙ্গরূপ ধরবে?

এখন সময় স্তাবকতার– মিথ্যে বলার ব্যর্থ কলার–
সুর জানি না– বেসুরে গাই, তাল কানা তাই ঠমক ছাড়াই
আপন মনে বাজিয়ে যাই– উল্টো তালের কপট তেহাই,
সুযোগ কি আর আছে
        এখন শুধুই সত্যি বলার!

যে জন সাধু– তাহার রঙ্গঁ ভালোই আছে জানা
ছিপ ফেলেছে যে মতলবে– রুই কাতলা সবই হবে
তবু যে তার সাধ মেটে না– সুকৌশলে সাধ্যটাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে,

দিনগুলো সব তারই–
        এখন মোহর ফেলে কেনা ।
আমরা যারা সকাল-সন্ধ্যা বেগার খেটে চলি
তোমার চটুল হাসির তোড়ে– ছিট্‌কে পড়ি অনেক দূরে
অশুভ যা তারই গলায়– ফরমায়েশি, যেমন মানায়
বরমাল্য গছিয়ে– নিচে দাঁড়াই করজোড়ে–
ফাঁকির ফেরে এখন যে ভাই

        ঠাসবুননের জব্দ জলাঞ্জলি
আমরা টানি রথের চাকা নোনা ঘামের দামে
তুমি শুধু দু’চারটে ফুল-তুলে ধরো ননীর পুতুল

তোমার টানেই যাচ্ছে ভেসে প্রভুর প্রাণের একুল-ওকুল,
আমরা আছি
গাধার মত হাঁটু জলে নেমে ।

তোমার সময় বৈরীতো নয় ঝিলমিল জাল কোনা
দক্ষ হাতে পাশার গুটি– চাল দিয়েছ পরিপাটি
সিংহাসনের হাতল চেপে–
নাটেরগুরু ঠিক ঘোরাচ্ছ পটের চাবিকাঠি ।
শোল-বোয়ালের মহোৎসবে
আমাদের কি হতে হবে বৈচা মাছের পোনা?

১৭.

শ্রী কা ন্ত   কা না ই য়া

....

সতর্ক সত্য

গাবতলী থেকে সায়েদাবাদ
আকর্ণবিস্তৃত জ্যামে পরা সময়ের হাসি–
বত্রিশ দাঁতের মাঝখানে
তেত্রিশ চরকার মতো বন্দিশালার সংসার

এই রাজধানী আমাদের–
পুরাতন গল্পের মতো স্মৃতির হৃদয় বারবার ভাঙা সম্ভব নয়!
কপোতাক্ষ জলে টেমসের উৎসব এসে
নতুন মাত্রায়
কেড়ে নেয় সাগরদিঘির সব
হয়তো সে জানে না–
হাতিয়ারে জং ধরে যোদ্ধার অভাবে
সতর্ক সত্য সাবধানে প্রকাশিত হয় সবখানে
কেননা রাত্রিই আলোর চূড়ান্ত সম্পদ ।

১৮.

আ স মা   বি থী

....

স'রে যাক চোখ

অক্ষরের উপর গড়িয়ে সরে চোখ
তোমার বুঝি জ্ঞান নেই, হয়তো আছে
শেষকৃত্যের আড়ম্বরে হারিয়ে স্বর
কোথাকার মাটি কোথাকার জলে গিয়ে
ফিরে আসে। তবুও হাঁটতে পার চোখ;
শব্দের নীল সুধা, সমস্ত গন্ধরাজ
কিছু বিস্রস্ততা পেরিয়ে দেখা কি যাবে
কী আছে লেখা? মৃতদের শরীর ছুঁয়ে
তেতে উঠি। বিরল নিঃশ্বাস, অর্থহীন
নিভৃত কথার তোড় টেনে নেয় দূরে;
তোমারই পাশে শুয়ে বোধশূন্য গান
রচনা করি প্রতিরাতে। না যেন হয়
আয়না সজীব, উন্মাদ বৃষ্টি! গড়িয়ে
তবে স'রে যাক চোখ অক্ষরে অক্ষরে

১৯.

অ প র্ণা   হা ও লা দা র

....

মূলবিন্দু দুই-এর কাঁটায়

মাছ-ধরা নৌকোগুলোর ক্লাস্টার দেখলে তাদের
পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয় না
অথচ

হিমঘরে সুবেশী মুখোশের নিচে জংধরা কংকাল
দাঁত খিঁচড়ে লাফিয়ে পড়ে নিজেরই বিশ্বের কৌণিকে ।
পেলব অন্ধকার জুড়ে ধাতব আদিমতা এক;
মায়াজলে
ভিজিয়ে রাখে দয়িতার বুকের ঘ্রাণ নাভির দাগ
যৌনাস্পৃষ্টের শীৎকার ভেঙে ভেঙে চলে যেই
মেয়াদী উত্তাপ! কায়িক কৌলুষে–

চলে যায়–

ছিপনৌকোর মাঝি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে....
গড়াতে গড়াতে...
বয়স ঢুকে পড়ে মার্বেল মেঝেতে;
আড়াই চালে ডিঙোতে গিয়ে দাবার ঘর
ক্রমে ক্রমে

আড়াই চালে ডিঙিয়েও যায় দাবার ঘর!
এক জীবনে
মানুষ
অন্তত দুইবার বাঁচে–
এক জীবনে মানুষ অন্তত দুইবার বাঁচে!

২০.

সু জ ন   আ হ মে দ

....

পাঠশালা

নির্জন অরণ্যে পড়ে আছি...
বড় সুস্বাদু ফল,
ক্ষুদ্র মাকড়েরা এসে কিলবিল করে
মাছিরা চক্কর লাগায় পচন ধরার আশায়

সম্ভব হলে মাংস হয়ে যেতাম,
দেখার সাধ আছে মানুষকুকুর আর
জন্তুকুকুরের জিভের সম্পর্ক

হাওয়া হতে পারলে বেশ হতো,

নিঃশ্বাস হয়ে ঢুকতে পারতাম পিশাচের
হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ভেতর;
সহসাই দেখা যেত মানুষের ম্যুরালের মাঝে

নেকড়ে আর হায়েনার অবাধ জীবন-উৎসব ।

তবু মানুষ হয়ে ভালোই তো আছি;
নিরাপদ নিঃশ্বাসের আশায়
বিষাক্ত নিঃশ্বাস সয়ে যাচ্ছি আর
ক্ষ'য়ে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে-মুহূর্তে!

২১.

ঈ শা ন   সা মী

....

জন্মগান

জন্মসংবাদ শুনে এসেছিল পাড়াবৌ পড়শি কিষাণকুলের কেউ না কেউ,
বাতাসে বাতাসে যতদূর যায়– শূন্যে ভেসেছিল মঙ্গলের সুর
            শুভ অন্তপ্রাণের হৃদয় ইচ্ছায়...

কে জানতো সেদিন– ধরে না ফল সকল বৃক্ষেই
ভালো ছাত্রের মতোন কোনো কোনো বৃক্ষ বেশ মায়াবী সজ্জন,
            পরিচিত পরিবেশে অপ্রয়োজনীয় হয়ে থাকে

না ভেবে বিষয়ের গভীর, বৈষয়িক রহস্যের কথা সব–
প্রকৃতির গানে ভাসিয়ে মনে, বুকের ভিতরে নিয়ে কৃষকের বুক
শ্রবণে স্মরণে বলে ফেলি স্বপ্ন ও ক্রোধের দাহকথা–
            রক্তবন্ধু এবার রক্তকণিকা না ঢেলে ধানের প্রাণে
            দিয়ে দাও হাওয়ায় ছড়িয়ে: পৃথিবী একটু কৃষক হোক

প্রকাশিত কবিতার আলোচনা

....

ম ই নু দ্দী ন খা লে দ

[এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর একটি আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্প-সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদকে। সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিটি কবিতা ধরে তিনি আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় তিনি কবির নাম উল্লেখ না-করে আলোচনাটি সম্পন্ন করেছেন। এতে আলোচনাটি কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়।]

১.
সবাই স্বপ্নভূমি খোঁজে। ধূসর জীবনে রঙিন-স্বাধীন গতি আনতে চায়। দায়বদ্ধতার জোয়াললগ্ন জীবন শ্বাস নেয় শৈশবের স্মৃতি-প্রান্তরে এসে। এ কবিতা পড়ে অন্যের কষ্ট লাঘব হবে না। এতে সেই যাদুমন্ত্রের মতো কোনো গুণ যুক্ত হয়নি।

২.
কবিতার কাঁধে চড়ে যোগাযোগের পুরনো সংজ্ঞা নতুন করে পরিবেশনের কী প্রয়োজন? একটা বিবৃতিও একটা কবিতা হতে পারে। কিন্তু এখানে তা হল কই? কতগুলো কর্কশ গদ্যের মতো চরণ কবিতার কোনো নতুন আচরণের কথা বলে না। গ্রামীণ ও নাগরিক ভাবনার সংঘর্ষ থেকে যে কবিতার জন্ম হয় তা-ও এখানে অনুপস্থিত।

৩.
এ কবিতা অপরাজেয় বিপ্লবী মনের নতুন শপথের কথা বলছে। নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ মিলিয়ে মিশিয়ে স্পষ্ট ভাষায় পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়ার মন্ত্রণা দিয়েছেন কবি। অন্য অনেক পরিচিত কবিতার প্রক্ষেপ থাকলেও কবিতাটি সুখপাঠ্য ও আশাজাগানিয়া মনের মর্মবাণী হতে পেরেছে। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সংবেদ ধীর লয়ে ক্রমান্বয়ে পাঠক মনে প্রবিষ্ট হয়।

৪.

'অনন্ত উচ্চতায় বিজয়বৃত্ত'; অহেতুক এক জটিল শিরোনাম। কায়া নেই, ছায়া আছে। ছায়াময় পরিধিতে দাঁড়িয়ে অচেনা প্রেতের সঙ্গে লড়াইয়ে নিরন্তর জীবন মুখোমুখি হচ্ছে। বিমূর্তকে মূর্ত করার এক খেয়াল মাত্র। তবে 'ধারণার ধূপ' শব্দটা আবিষ্কারপ্রবণ মনের খবর জানিয়েছে।

৫.

ভূমণ্ডলায়নের এই কালবেলায় দরিদ্র দেশ একই সঙ্গে নতুন সুখ-সুবিধা পাচ্ছে এবং পরিণামে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে সেই গ্লোবালাইজেশনের মঞ্চে। বক্তব্য ভালো, উচ্চারণ অসামান্য নয়।

৬.

ব্যক্তিগত স্মৃতি-বিস্মৃতি, অতীত প্রেম ও বন্ধুতার পুরাতাত্ত্বিক ভাষ্যের পাশে নিম্নবর্গের জন্য মমতা কি সংগতি তৈরি করতে পেরেছে? মানব-সম্পর্কের জটাজালের চেয়েও যদি জটিল হয় কবিতা তা হলে জীবন তা পাঠ করে কেন আরও ঝঞ্ঝাট বাড়াবে। হঠাৎ একটি-দুটি চরণ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে; আরও সাধনায় পুরো কবিতা কি সে-রকম হতে পারে না! 'শিরোনামহীন'-এ সুধীন দত্ত ও বিষ্ণুদে'র কণ্ঠস্বর প্রবল। এজন্যই কি কবি শিরোনামহীনতায় আত্ম-সমর্পণ করেছেন? এই ব্যজস্তুতি প্রযোজ্য হলেও হতে পারে।

৭.

শব্দে শান দিয়ে ছন্দের মার্চপাস্ট বানিয়ে রাষ্ট্রের কালাকানুনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন 'সম্ভাবনার সূত্র'-এর কবি। বিপ্লবীচেতনা গণমুখি করতে হলে যে স্পষ্টতা প্রয়োজন তা এ কবিতায় আছে। পদ্য ও কবিতার পার্থক্য না করেও এ কবিতা পাঠ করা যায়, কানে শোনা যায়।

৮.

সেই 'প্রেম', সেই 'তুমি', 'তুমি', সেই 'আলিঙ্গন স্পৃহা' ও 'বিরহের' কাতরানি; নতুন কিছু মনে হয় না। প্রেম নিয়ে কবিতা লেখা যে সহজ নয়, প্রচলিত পংক্তিমালার মধ্যে জড়িয়ে পরের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার এক বালখিল্যতা এই কবিতা।

৯.

মন ও মস্তিষ্কের হিসেব পরস্পর কাটাকুটি করে এক সময় মানবসত্তা বিহ্বল হয়ে পড়ে। সেই বিহ্বলতা থেকে কবিতার সৃষ্টি হতে পারে। গ্রামীণ জীবন হারানোর হতাশ্বাস একটি পংক্তিতে বিশেষ মনে হয়। 'ব্রহ্মপুত্র তার অতীতের ধূসর ছায়া, মৃতপ্রায় পুত্র ঈশ্বরের।' এই চরণে ধরিত্রীর মরণযন্ত্রণা কবিতাসুলভতার বড় দাবিদার।

১০.
নাড়ির টানও যেন বিকল হতে চলেছে। উদ্বাস্তু, নিঃসহায় মানবপুত্রের জন্য দয়া লাগে মনে। এই অনুভবের কবিতা 'প্রত্যাখ্যান'। অনুভব জোরালো হলেও, কণ্ঠস্বর যেন নিজের নয়। ভাষায় কবিতার সেই বিশেষ বিভা নেই।

১১.
কবি ত্রিদিব দস্তিদার মরে গেছে: কাগজ ও খবর জানাচ্ছে। কিন্তু ত্রিদিব সাগরবেলার বালুকণায় বিকিরণশীল। বক্রোক্তির ছলে কবির অমরতা জানানো হচ্ছে। ক্ষণিকের ভাবনা নিয়ে কবিতা লেখার এ প্রয়াস। এতে ত্রিদিবের বাঁচা-মরা নিয়ে পাঠক-মনে কোনো প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হবে না।

১২.
রাজনীতি-সচেতন কবিতা। কে কাকে মারছে অথবা নিজেকে কিভাবে মানুষ নিজেই ফাঁসি মঞ্চে দাঁড় করাচ্ছে এ রকম এক ধাঁধা তৈরি হয়েছে কবিতায়। কবিতা রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে সময়ের প্রয়োজনে। এ আক্রমণ কখনো পরোক্ষ-প্রচ্ছন্ন থেকে যায়; এ কবিতায় সেই অভিব্যক্তি আছে। পংক্তির মাঝখানের স্পেসগুলো আলাদা তাৎপর্য তৈরি করতে পারেনি।

১৩.
রাজনীতির মার-প্যাঁচে জটিল হয়ে উঠেছে সময়। 'পুঁজিকাল', 'ভোগসাল' এসব শব্দে আপাত চমক আছে। ওই চমক ছাড়া আর কী-ই বা আছে এ কবিতায়! 'এ গ্রামে আসার পর আমার মাঝে যা যা ঘটলো' শীর্ষক কবিতায় নিরলম্ব অনুভবের সুখদোলা আছে। স্বদেশের আকাশ বেয়ে গেলে পৃথিবীতে ভ্রাম্যমাণ মনের খবর পাওয়া গেল। গদ্যের মতো লেখা হলেও মন্ময় সার আছে এতে।

১৪.
কবি বলতে চাচ্ছেন, মনকে দাসত্বের কারাগারে বন্দি লাখবেন না। তাই তিনি দ্রোহী হয়ে ওঠেন, নিজেকে নিজের মতো করে আবিষ্কার করবেন বলে আকাঙ্ক্ষা জানান। পূর্বজ কবির নির্দেশ অমান্য করার সাধ থাকলেও এ কবিতার কবি প্রথানুগমনই করেছেন। এ রকম চাওয়া প্রচল এক অভ্যাস মাত্র। কোনো অভিনবত্ব নেই।

১৫.
'মহুয়া' কবিতাটি সুপ্রচল রোদন। নস্টালজিয়ার তাড়িত মন মনোভূমে একা একা চমৎকৃত হয়ে চলেছে। প্রকৃতির মধ্যে বিগত প্রেমের সংকেত দেখতে পান কবি। স্তব্ধ, সম্মোহিত হয়ে থাকতে চান তিনি। নিসর্গের মায়ায় মানুষের মধ্যে করুণার জন্ম হয়–হৃদয় কাঁদে। এই গভীর বিষয়টি মহুয়া'র কবি স্বকীয় উচ্চারণে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না।

১৬.
মানুষ আর মানুষ নেই। ক্ষমতার কাছে ন্যুব্জ। চাটুকারিতার চটুল হাওয়া বইছে। সবার ওপরে মোসাহাবি জয়ী। এ ভাবনায় আহত-বিক্ষত বৈরী সময়ের কবিতা এটি। ঘানি-টানা জীবনের এই নামতা-পড়া এখানে একঘেয়ে লাগে না। ছন্দদোলাই যেন কবিতাটির বক্তব্য সচল রাখার ভূমিকা রাখছে।

১৭. একদিকে আমাদের স্বরচিত সংকট, অন্যদিকে বিশ্বরাজনীতি, বাণিজ্যনীতির থাবা। বাইরের জল এসে কী করে আবিল করে দিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির নদী, সেই কষ্টের কথা জানান 'সতর্ক সত্যে'র কবি। কিন্তু কবিতাটিতে পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি ছাড়া আর কী আছে?

১৮.
কবিতার মানে খোঁজা হয়তো সংবেদী হৃদয়ের প্রথম দায়িত্ব নয়। কিন্তু কবিতা যদি হৃদয়ে না বাজে, তবে তা মগজে হুল ফোটায়। অনেকবার পড়ার পর কোনো মানে যদি অংশত উদ্ধার করাও যায়, তবু সে কবিতা মনে থাকে না। অনেক দিন পর সে কবিতা দেখার পর ভয় লাগে। অনেক কবিতাই আজ ভীতিপ্রদ, জটিল। 'সরে যাক চোখ' পড়ে মনে হয় আমি যেন কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন, কবিতা আমার কাছে অপরিচিত মাধ্যম অথবা এমন কোনো নতুন ভেল্কি যুক্ত হয়েছে এখনকার কবিতায়, যা আমার মন ও বুদ্ধির অগম্য। দুর্নিণেয়তা সয়ে গেলেও, দুর্বোধ্যতা নিয়ে বাঁচা যায় না। এ কবিতাটি নয় শুধু, আরও অনেক কবিতাই আজ আমাকে ক্ষ্যাপা হেডমাস্টারের মতো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কড়া নোটিশ জারি করে।

১৯.
পড়তে গিয়ে মনে হয় জটিল জ্যামিতি-জালে আটকে গেছি। কবিতার অর্ধেকটা যেন কঠিন ধাতুতে গড়া, বাকিটা আবার তরল। '....জংধরা কংকাল/দাঁত খিচড়ে লাফিয়ে পড়ে নিজেরই বিম্বের কৌণিকে।' মনে হয় কবিতাকে কামারবাড়িতে বাজানো হচ্ছে। আপনি থেকে হয়ে ওঠা নয়, কষ্টকল্পিত বুদ্ধিশাসিত কবিতা নামক এক খেলায় মেতেছেন কবি। ঘরের মেঝের মোজাইক ও দাবার সঙ্গে সাযুজ্য টানার বিষয়টি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

২০.
‘পাঠশালা’ কবিতা হতাশার গান। মানুষের ভেতরের পাশব বৈশিষ্ট্য কবিকে আক্রান্ত করে রেখেছে। আশাকে পরিহাসের মালা পরিয়ে কবি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ রকম স্বাগত ভাষণ সমকালের কবিতার সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য।

২১.
মৃত্তিকালগ্ন কৃষক-মন ফিরে পাবার আকুতি আছে এই কবিতায়। কবির প্রার্থনা মন্ত্রের মতো মনে হলেও উচ্চারণ মন্ত্রের মতো শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও অনায়াস মনে হয়নি।

ব ড় প্র ব ন্ধ

আ বু ল বা র কা ত

....

বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: উন্নয়নের দিগন্ত

সারকথা

আর্থ-সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিই আসলে উন্নয়ন । উন্নয়ন বলতে আসলে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ বুঝায়। যেখানে নিশ্চিত হতে হবে মানুষের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা: অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। জমি-জলা সমৃদ্ধ এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র-প্রান্তিক রেখে এ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তা সম্ভব নয় মানব-দারিদ্র্যের সকল উৎসমুখ বন্ধ না করে। একদিকে অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্রমান্বয়ে অধিকহারে দুর্বৃত্তায়িত হতে থাকবে আর অন্যদিকে দারিদ্র্য-প্রান্তিকতা সৃষ্টির উৎস বিলুপ্ত হবে তা-ও হবার নয়। আবার এর অর্থ এ-ও নয় যে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাই শ্রেয়। দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামটা ধরন ও পদ্ধতি যাই হোক না কেন, একটা মৌলিক কাজ। এ দৃষ্টিতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের (agrarian-land-aquarian reform) কাজটি মৌলিকতম। মৌলিক এ কর্মকাণ্ডের পিছনে একদিকে আছে ন্যায়বিচারিক যুক্তি, বৈষম্য

হ্রাসকারী সাংবিধানিক যুক্তি, আর অন্যদিকে আছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনে শ্রমের ফলপ্রদতা (efficiency অর্থে) বৃদ্ধির যুক্তি, এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি। এ সংস্কারে বর্তমান কাঠামোতেই কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্জন সম্ভব; অনেক দূর। আর ছোট ছোট অর্জন ধরে রাখতে পারলে সমগ্র কাঠামোটির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনও ত্বরান্বিত হবে। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় অর্জন সম্ভব সেগুলো হ'ল: খাস জমি-জলায় দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তারা যেন তা ধরে রাখতে পারে (বাজার অন্ধত্বের যুগে) সে লক্ষ্যের কর্মকাণ্ড ; শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমির উপর অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা; জমি সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা; জল-জলায় দরিদ্র মৎস্যজীবী নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা; চিংড়িঘেরসহ লোনা-পানি সম্পদে উপকূলের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা; ভূমি মামলা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক অপচয় রোধ; ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগদখল স্বত্বের ক্ষেত্রে "বর্গাস্বত্ব আইন" বাধ্যতামূলক করা; এবং ভূমি প্রশাসন-ব্যবস্থাপনা-আইনী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কার্যকরী অবস্থান গ্রহণ। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যেহেতু শেষ বিচারে গভীর রাজনৈতিক সেহেতু সমগ্রক সমাধানে চাই উষ্ণ হৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ। এ লক্ষ্যে সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও তা বাস্তবায়ন জরুরি। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব বিনির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখাটাও অতীব গুরুত্ববহ।

প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে তিনটি 'জ'এর সমন্বয়: জমি, জলা, জন। কিন্তু আমাদের দেশে এ তিন 'জ'-এর সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা অস্বীকৃত। বাস্তবতা হল যে জন-মানুষ জমি-জলায় শ্রম দিয়ে প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি করেন সেই জন-মানুষ ঐ জমি-জলার মালিক নন। বাংলাদেশের অনুন্নয়নের সম্ভবত এটাই গোড়ার কথা। আর তাই জমি-জলা-জন সমৃদ্ধ এ দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে উন্নয়ন দর্শনে কখনও গুরুত্বের সাথে উত্থাপন করা হয়নি। বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে এ দেশের উন্নয়নে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার অন্যতম প্রধান ইস্যু হবার যোগ্য নয়। এমনও বলা হয়েছে এবং হচ্ছে যে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষি-ভূমি-জলায় প্রকৃত কৃষক– প্রকৃত মৎস্যজীবীর মালিকানা ও অভিগম্যতার প্রসংগের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ের (যেমন ঋণ সুবিধার প্রতি অভিগম্যতা, বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য, বৈদেশিক বাণিজ্য, 'জমি নয় হাত' ইত্যাদি) তুলনামূলক সুবিধে বেশি। এসব কিছু বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে যা দেখানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে তা হ'ল নিম্নরূপ:

(১) এ দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনেক মৌলিক যুক্তি বিদ্যমান– ন্যায় বিচারিক যুক্তি, বৈষম্যহ্রাসকারী সাংবিধানিক যুক্তি, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনে শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি, (২) এ দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনেক উর্বর ক্ষেত্র বিদ্যমান, (৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক কমিটমেন্ট-সংশ্লিষ্ট, এবং (৫) বাস্তব কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি "দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" সংশ্লিষ্ট ।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারঃ কেন[১]

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি সমগ্রক বিষয়; দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয় । *"প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে ভূমি ও কৃষি সংস্কারের প্রশ্নটা ব্যাপক অর্থে গ্রামীণ আর্থ-সমাজব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্ন" (মো. আনিসুর রহমান ২০০৭)।* *কৃষি সংস্কার* (agrarian reform)-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল কৃষিতে এমন ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ত্বরান্বয়নে কৃষির উৎপাদন সম্পর্ক (যার নির্ধারক জমি ও জলার মালিকানাসহ অভিগম্যতা কাঠামোর পরিবর্তন) পরিবর্তিত হয় । ফলে কৃষিতে শ্রেণী-সম্পর্ক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে । আর ভূমি সংস্কার (land reform অর্থে) হ'ল ঐ কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষঙ্গ । *ভূমি সংস্কার'*কে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্থের কৃষি সংস্কার । ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সরকারি মালিকানার খাস জলা-জমির বণ্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ

অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ইত্যাদি ।

কৃষি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হ'ল উল্লিখিত ভূমি সংস্কারসহ ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থা সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা বণ্টন, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগদখল স্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, বাজার, মজুরি, পরিবেশ-বান্ধব কৃষি (টেকসই কৃষি), কৃষিতে নারী-শ্রমের স্বীকৃতি, ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি, বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল, প্রযুক্তি এবং ইনপুট খাতসমূহে পরিবর্তন । ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার– রাজনৈতিক বিষয় । এ সংস্কারে আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে । কারণ বিষয়টি আসলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তি-কেন্দ্রিক ।

স্বাধীনতা-উত্তর তিন দশকে বাংলাদেশ দৃশ্যত অর্থনৈতিক এক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়েছে। অর্থনৈতিক এ দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও প্রশাসনসহ সমাজের সকল স্তরের দুর্বৃত্তায়নে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আবার এ এক ফাঁদ যখন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে পরিপুষ্ট করছে। বিদ্যমান কৃষি কাঠামো সামগ্রিক এ দুর্বৃত্তায়নের বাইরের কোনো বিষয় নয়। এ দুর্বৃত্তায়নের ফলে আমরা এক প্রকার প্রান্তিক-বঞ্চিত মানুষের নিরন্তরভাবে বহির্ভুক্তকরণ (exclusion of the excluded) প্রক্রিয়া লাভ করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা বঞ্চিতদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ এমন পরিস্থিতি যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তির (বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করার নিশ্চয়তা) সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাৎ করে দেয়। এখন এক লুণ্ঠন সংস্কৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, আর অন্যদিকে দুর্বৃত্তায়নের অনুকূল সূচকগুলো ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ সীমিত হচ্ছে। মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশে এ এক প্রতিবন্ধক। তিন দশকের উন্নয়নে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরও জোরালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ (ক্ষমতায় যে-ই থাকুক না কেন, এরাই চালকের আসনে থাকে); অপর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৪ কোটি ৯০ লাখ মানুষ। এরা প্রান্তিক, বহিস্থ, বঞ্চিত ও নিঃস্ব মানুষ। অথচ আমাদের সংবিধান বলছে "*প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ*" (অনুচ্ছেদ ৭.১)। আমাদের দেশের চলমান দারিদ্র্য, আর ভূমিহীন, নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি-জলার মালিকানা বা অভিগম্যতা সংশ্লিষ্ট বাধাসমূহ তথা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। কাঠামোটিই এমন যা কৃষি-ভূমি-জলা উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদন করে (নিচের বক্স দেখুন)।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে ভূমি-উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম

ক্ষেত্র	পরিণাম/অভিঘাত
* খাস জমি ও জলা	* দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন: নিঃস্বায়ন
* চরের জমি-জলা	থেকে ভিক্ষুকায়ন
* অর্পিত জমি-সম্পত্তি (ধর্মীয় সংখ্যালঘু	* ভূমি-জল-বনদস্যুতা বৃদ্ধি
হিন্দ সম্প্রদায়)	* ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা
* আদিবাসী মানুষের জমি-বন সম্পত্তি	* ক্রমবর্ধমান বৈষম্য
* জলা সম্পদে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের	* ক্রমবর্ধমান বহিস্থকরণ-প্রান্তি
কতা: গ্রাম	
অধিকারহীনতা	থেকে শহরে "গলাধাক্কা
অভিবাসন"	
* চিংড়ি চাষজনিত প্রান্তিকতা	* শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতের
বিস্তৃতি প্রান্তিক	
* জমি-সম্পত্তিতে নারীদের অধিকারহীনতা	মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি: নগরায়ন নয় বস্তি
য়ায়ন	
* ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ-মামলা	* জল-সম্পদের
উৎপাদনশীলতা হ্রাস	
* ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ জমিতে বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্ব	* নারীর ক্ষমতায়নে বাধা
* ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-দুর্নীতি	* ভূমি কেন্দ্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি
* দরিদ্র-বিরোধী আইন-কানুন ও আইনি প্রক্রিয়ায়	* ভূমি কেন্দ্রিক মামলা-
মোকদ্দমায় জাতীয় ও	
মানুষের আস্থাহীনতা	পারিবারিক ব্যাপক অপচয়
* কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস	
* মঙ্গা-ক্ষুধা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ	* সামাজিক পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা

কৃষি ভূমি-জলা উত্থিত এ দারিদ্র্য-বঞ্চনা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সংস্কার অপরিহার্য। এ বিষয়ে সংস্কার-বিরোধীদের যুক্তি প্রধানত দ্বিবিধ; তাদের মতে (১) বণ্টনযোগ্য পরিমাণ ভূমি-জলা বাংলাদেশে নেই, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমি-মানুষ এবং জলা-মানুষ অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে, এবং (২) সংস্কার শ্রেণীসংঘর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি

করবে। সংস্কার-বিরোধীদের কেউ কেউ সংস্কারের অভিঘাত হিসেবে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের কথাটি বলেন; কেউ কেউ আবার “ভূমির কেন্দ্রিকতা” (centrality of land) অস্বীকার করে উৎপাদনের উপায়ের ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মালিকানা-অভিগম্যতা (ownership access)-র পরিবর্তে উন্নয়নে ইনপুট সরবরাহ (যেমন ক্ষুদ্র ঋণ)-কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-বিরোধী এসব যুক্তির ভিত্তি দুর্বল। প্রথমত, সাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি যদি বৈষম্য সৃষ্টির ভিত্তি উচ্ছেদে সহায়ক হয় সেক্ষেত্রে এ অস্থিরতা অকাম্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, যুক্তিগতভাবেই কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ন্যায়বিচারিক এবং সাংবিধানিক (অনুচেছদ ১৬ “বৈষম্যদূরীকরণে কৃষি বিপ্লব”, অনুচ্ছেদ ১৯(১)(২) “সুযোগের সমতা”, “সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য নিরসনে...সম্পদের সুষম বণ্টন” ইত্যাদি); সেই সাথে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি।

ভূমি ও জলা বঞ্চনার মাত্রা

বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৭৪ লাখ একর যার মধ্যে ৬০% কৃষিজমি। এক কোটি ৬০ লাখ একর জমি (৪৩%) ব্যক্তি মালিকানাধীন; বছরে প্রায় ২৪ লাখ একর মামলাধীন এবং ভূমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এখন বছরে প্রায় ২৫ লাখ। প্রায় ১ কোটি একর জমি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়। চিহ্নিত খাস জমি (কৃষি ও অকৃষিসহ চরের জমি) ও খাস জলার মোট পরিমাণ ৫০ লাখ একর (ভূমি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি)। সেই সাথে অর্পিত সম্পত্তি আইনে সরকারের জিম্মায় আছে ২১ লাখ একর; আর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১০ লাখ একর।

সারণি ১: বাংলাদেশে ভূমি ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

ভূমির বিবরণ	পরিমাণ
মোট জমি (লাখ একর)	৩৭৪
জনসংখ্যা (২০০১-এর আদমশুমারির ভিত্তিতে ২০০৭; কোটি)	১৫
খানা (২০০১-এর আদমশুমারির ভিত্তিতে ২০০৭; কোটি)	৩
কৃষির অধীন জমি (লাখ একর)	২২২
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন (গ্রাম-শহরে, বিবাদপূর্ণ, অশনাক্ত খাস, বনাঞ্চল) (লাখ একর)	২১০
সরকারি ব্যবহারে জমি (রেল,বন্দর,সড়ক, অফিস, শিল্প, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,সেবাখাত)(লাখ একর)	১০০
খাস জমি ও জলা (লাখ একর)	৫০
– কৃষি খাস জমি	১২
– অকৃষি খাস জমি	২৬
– খাস জলা (উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ)	১২
শত্রু/অর্পিত জমি (সরকারি জিম্মাদারিত্বে; ব্যক্তিগতভাবে বেদখলকৃত) (লাখ একর)	২১
পরিত্যক্ত (সরকারি জিম্মাদারিত্বে; ব্যক্তিগতভাবে বেদখলকৃত) (লাখ একর)	১০

উৎস: *Barkat Abul (2004), Poverty and Access to Land in South Asia–Bangladesh Country Study*.

২০০৭-এর জনসংখ্যা নিরূপণ জনসংখ্যার গত ৫ বছরের গড় প্রবৃদ্ধির হার, আর ২০০৭-এর মোট খানার সংখ্যা নিরূপণে ২০০১ আদমশুমারির গড় খানার সাইজ ব্যবহৃত হয়েছে।

দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি-জলা বণ্টন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকার খর্ব করা, ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ, জলাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকারহরণ, ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়– এসবই এদেশে কৃষিসংস্কারের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়। গত চার দশকে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ; ঘটেছে ভূমি মালিকানার পুঞ্জিভবন। আবির্ভূত হয়েছে এক ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু গোষ্ঠী। আর এসব দস্যুরাই আবার দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক কাঠামোতে প্রবল প্রতিপত্তিশীল।

এসবে নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে তথাকথিত নগরায়ন যা আসলে বস্তিয়ায়ন অথবা নগর-জীবনের গ্রামায়ন। এও ঘটেছে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও কর্মহীনতার ফলে। এটা গ্রাম থেকে এক ধরনের গলাধাক্কা অভিবাসন। নগরবাসীর প্রজনন হার বৃদ্ধির ফলে নগরের জনসংখ্যা বাড়েনি, তা বেড়েছে গ্রাম থেকে ব্যাপক দরিদ্র-বঞ্চিত নিঃস্ব মানুষের বাধ্য হয়ে শহরমুখী হবার ফলে। বেড়েছে শহরে জমির দাম– এমন বাড়া বেড়েছে যার কারণটি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অপারগ। ক্রমবর্ধমান কালো টাকার কারণেই শহরে জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। ঢাকা শহরেই এখন এক কোটি ২০ লাখ মানুষ (যা দেশের মোট নগর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ)। যে কারণেই ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে জমি-দস্যুতা এমনই প্রকট রূপ নিয়েছে যে ভূমি মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও বলেছে ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে ভূমি-দস্যুরা ১০,০০০ একর জমি জবরদখল করে আছে (যা দেশের প্রচলিত আইন, "Water Preservation Act"- বিরুদ্ধ)।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সাথে নগরায়নের সম্পর্ক সম্পর্কে অবশ্যই এ কথা গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে যে দ্রুত শহরায়নের ফলে কৃষিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীর (absentee landlord) মালিকানায় জমি-জলার পরিমাণ গত দু-তিন দশকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সরাসরি ফল হ'ল ভাগচাষের আওতায় জমি-জলার পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি-জলার প্রকৃত উৎপাদিকা হ্রাস, কৃষি দিনমজুরের অবস্থার অবনতি ইত্যাদি।

ভূমি মালিকানার পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক শ্রেণীকাঠামোর বিবর্তন

বিগত ৫০ বছরে এ দেশে যেমন ভূমিহীনতা বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ভূমির পুঞ্জিভবন। ১৯৬০ সালে এদেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিল মোট খানার ১৯% যা ১৯৯৬ সালে মোট খানার ৫৬%-এ উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে ১% ধনী ভূ-স্বামীর মালিকানায় ছিল মোট কৃষি জমির ৪.৭% যা ১৯৯৬ সালে হয়েছে ৮.২% (এসবই সরকারি হিসেব)। আমাদের দেশে এখন কার্যত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের অর্ধেক অথচ মোট জমির মাত্র ৪.২% তাদের হাতে, আর অন্যদিকে ৬.২% পরিবার আছে (ভূমি মালিকানার নিরিখে ধনী) যাদের মালিকানায় আছে দেশের ৪০% জমি।

আর্থ-সামাজিক শ্রেণীকাঠামোর (class structure) বিবর্তন নিয়ে এ দেশে খুব একটা গবেষণা হয়নি। তবে সম্প্রতি সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে একদিকে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের অধোগতি ঘটেছে, আর অন্যদিকে ভূমিসহ অন্যান্য বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু ধনীর হাতে (দেখুন সারণি ২)। এখন ১৪ কোটি মানুষের এদেশে ৯ কোটি ১০ লাখ (৬৫%) মানুষ দরিদ্র, ৪.৫ কোটি (৩২.১%) মধ্যবিত্ত, আর ৪০ লাখ (২.৯%) ধনী। আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে ২ কোটি ৪০ লাখ (মোট মধ্যবিত্তের

৫৩.৩%) নিম্ন-মধ্যবিত্ত (প্রায় দরিদ্র), ১ কোটি ৫০ লাখ (৩৩.৩%) মধ্য-মধ্যবিত্ত, আর ৬০ লাখ (১৩.৩%) উচ্চ-মধ্যবিত্ত। আর গত পাঁচ বছরে (২০০১-'০৬) একদিকে "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট" দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে[২] আর অন্যদিকে নূতন কর্মসংস্থানসহ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর পারিবারিক আয় তেমন বৃদ্ধি না হবার ফলে ইতোমধ্যে দরিদ্রদের ব্যাপকাংশ দরিদ্রতর হয়েছে, নিম্ন-মধ্যবিত্তের একাংশ দরিদ্র গ্রুপে আর মধ্যবিত্তের একাংশ নিম্নবিত্ত গ্রুপে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে।

গত ২০ বছরে (১৯৮৪-২০০৪) গ্রামাঞ্চলে নিট জনসংখ্যা বেড়েছে (৮.৪ কোটি থেকে ১১ কোটি) ২ কোটি ৬০ লাখ যার মধ্যে ২ কোটি ৪০ লাখ দরিদ্র (৯২.৪%)। গত ২০ বছরে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়েছে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬৩% থেকে এখন ৭১%-এ; একই সময়ে নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্তের অনুপাত কমেছে ২৮.৫% থেকে ২৪%-এ; আর

জনসংখ্যায় ধনীদের আনুপাতিক হারও কমেছে ৩.৮% থেকে এখন ২%-এ। অর্থাৎ দারিদ্র্য বেড়েছে; মধ্যবিত্তের (বিশেষত নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্তের) ঘটেছে অধোগতি; আর ভূমিসহ অন্যান্য
বিত্ত পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু মানুষের হাতে (যারা ১১ কোটি গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ২০ লাখ)। সারণি ২: বাংলাদেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর বিকাশ প্রবণতা: ১৯৮৪-২০০৪

গ্রাম/শহর	গরিব (সম্পদ-স্বল্প)		মধ্য শ্রেণী নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		সকল		ধনী (উচ্চ শ্রেণী)		সকল	
	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪
গ্রাম													(ভূমি মালিকানাভিত্তিক)	
% গ্রামীণ জনসংখ্যা	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৭৭	১৪	১৮	১০	১০	৪	৩	২.৮	৩১	৩	২	৮৪	১১০
শহর													(মূল্যভিত্তিক সম্পদ)	
% শহুরে জনসংখ্যা	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৫	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৫	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৪	৫	৬	৩	৫	০.৫	৩	৮.৫	১৪	০.৩	২	১৬	৩০
মোট													(গ্রাম + শহর)	
% মোট জনসংখ্যা	৬০	৬৫	১৯	১৭.১	১৩	১০.৭	৪.৫	৪.৩	৩৬.৫	৩২.১	৩.৩	২.৯	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০	৯১	১৯	২৪	১৩	১৫	৪.৫	৬	৩৬.৫	৪৫	৩.৩	৪	১০০	১৪০

উৎস: Barkat Abul, (2004), Poverty and Access to Land in South Asia: Bangladesh Country Study.

গ্রামীণ দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যঃ ভূমি মালিকানার সাথে সম্পর্ক

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের ৫৬% মানুষ দরিদ্র[৩] যাদের ৭৬% গ্রামে আর ২৪% শহরে বাস করেন (আদমশুমারি ২০০১)। আর গ্রামীণ দরিদ্রদের অর্ধেকই সরাসরি কৃষিকাজ নির্ভর। সরকারি হিসেবে গ্রামের প্রায় সব ভূমিহীনই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। সরকারি হিসেবেই গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের গড় স্থায়ী সম্পদের মূল্যমান ধনীদের (যাদের ৭.৫ একর অথবা তার বেশি জমির মালিকানা আছে) চেয়ে ১৬ গুণ কম। দরিদ্রদের আয়ের অধিকাংশ (৮৭%) খাদ্য বাবদ ব্যয় হয়, যেটা অদরিদ্রদের ক্ষেত্রে ৩৭%, আর ধনীদের ক্ষেত্রে বড় জোর ১০%। অর্থাৎ জীবনমানের অন্যতম মাপকাঠি খাদ্য-বহির্ভূত ব্যয়-এর নিরিখে ভূমি-দরিদ্রদের প্রান্তিকতা সুস্পষ্ট। সেই সাথে খাদ্য পরিভোগের কাঠামোতে পরিবারে নারী-পুরুষ বৈষম্যও এমন মাত্রায় যেখানে নারীরা দ্বিগুণ দরিদ্র। গ্রামে ভূমি মালিকানা দিয়েই নির্ধারিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমাত্রা (সারণি ৩)। যেমন নারীদের শিক্ষার সাথে পরিবারের জমি মালিকানার সম্পর্ক সরাসরি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়–যেমন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানেও গরিব মানুষ ধনীদের তুলনায় পাঁচগুণ কম সুবিধা ভোগ করেন।

সারণি ৩ঃ ভূমি মালিকানার ধরন অনুযায়ী আয়, স্বাস্থ্যসেবা খরচ, শিক্ষা খরচ, খাদ্য ভোগ খরচ, পুঁজি-সম্পদের মূল্যমান (টাকায়) এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (কিলোক্যালরি)

ভূমি মালিকানা বর্গ	বাৎসরিক গড় আয় (টাকা)	বাৎসরিক গড় স্বাস্থ্যসেবা খরচ (টাকা)	বাৎসরিক গড় শিক্ষা খরচ (টাকা)	বাৎসরিক গড় খাদ্য-ভোগ খরচ (টাকা)	পুঁজি-সম্পদের মূল্যমান ২০০২ (টাকা)	দৈনিক মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ (কি:ক্যাল:)
ভূমিহীন (০-৪৯ শতাংশ)	৩৮,৯৮৯	২,৬৭৯	১,০৪০	৩১,৯৭৪	১৭৬,৫১০	২,১৯৪
প্রান্তিক (৫০-১৪৯ শতাংশ)	৪৬,১৭১	৩,১১৫	১,৫৩৮	৩৩,০৩৮	৪৭৮,৭৬৯	২,২৭৮
ক্ষুদ্র (১৫০-২৪৯ শতাংশ)	৭৬,৪৭০	৩,০১১	১,৮১২	৩৮,২৮০	৭৫৯,৭১২	২,২৮১
মধ্য (২৫০-৭৪৯ শতাংশ)	৮৪,৫৭৯	৩,০৩৪	৩,৭৮১	৪৮,০৪৬	১,০৯৫,০৩৩	২,৬৬৬
বৃহৎ (৭৫০শতাংশ এবং তার বেশি)	১৯৫,১৬৫	৬,২২৬	৪,৭৪৮	৭১,৪৪৯২,	৭৯১,৯৫৯	২,৮৮০

উৎস: *Government of Bangladesh, 2003.*

এমনকি খানায় বিদ্যুত সুবিধার ক্ষেত্রেও জমি-মালিকানা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। এখানেও বৈষম্য স্পষ্ট। যেসব গ্রামে বিদ্যুত আছে (দেশের প্রায় ৯০,০০০ গ্রামের মধ্যে ৪০,০০০ গ্রামে) সে সব গ্রামে ধনী পরিবারের ৯০%-এর ঊর্ধ্বে আর দরিদ্র পরিবারের মাত্র ২১%-এ বিদ্যুত সংযোগ আছে[৪]। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যটি এমনি যে তা সুপেয় পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য– আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে দরিদ্রদের মধ্যে ধনীদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি (পুষ্টিহীনতা ও স্বল্প আয় প্রধান কারণ)। যে কারণে বলা হচ্ছে "আর্সেনিকোসিস–দারিদ্র্যের রোগ"।[৫]

আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা

বাংলাদেশ একক জাতিসত্তার রাষ্ট্র নয়। সরকারি হিসেবে এ দেশে জনসংখ্যার ১.২% মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) ৩২ টি (৪৮ পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে) বিভিন্ন আদিবাসী নিয়ে গঠিত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে "আদিবাসী মানুষ" হিসেবে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। সেই সাথে আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা ও সংস্কার প্রশ্নে একথা স্বীকার করা উচিত যে তাদের ভূমি-বন মালিকানা বিশেষত "সর্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার" (common property rights) বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত।[৬]

আদিবাসী মানুষের কাছে ভূমি ও বন মা-তুল্য; তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ভিত্তিও ঐ ভূমি ও বন। কিন্তু আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তাও সহজে হরণ-যোগ্য। অন্যের দ্বারা এদের ভূ-সম্পত্তির জবরদখল যথেষ্ট বিস্তৃত। সমতলের সাঁওতালদের ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙালিদের চেয়ে জোর তালে চলে। সাঁওতালদের ৭২% এখন ভূমিহীন। আর পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের অবস্থা আরও খারাপ। গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানি করা বাঙালিদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়িরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল আর সেটলার বাঙালিদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমলা-প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫%, আর এখন তা মাত্র ৪৭%। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; শান্তি চুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কোনো ভূমি কমিশন নেই। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের প্রসঙ্গটি কখনও কার্যকরীভাবে উত্থাপনই করা হয়নি।

প্রান্তিকতার যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেশ রীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই জাতীয় দৈনিকে এসব খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে। "নওগাঁয় আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা" শিরোনামে লেখা হয়েছে *"সোমবার সকালে পত্নীতলা উপজেলার উত্তর কাজিপাড়া আদিবাসী*

পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীরা ওই পল্লীতে বসবাসরত আদিবাসী নারী-পুরুষদের বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে। সেই সঙ্গে আদিবাসীদের অন্তত ২৪টি বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে চালিয়েছে ভাংচুর ও লুটপাটসহ সন্ত্রাসী তাণ্ডব। এ ঘটনায় মহিলাসহ ১৫ আদিবাসী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে থৈয়, তারা, শান্তি, সুখো, মালতি ও শান্তিকে সাপাহার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পত্নীতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ইউপি মেম্বার হেলালউদ্দিন, মতিবুল, আজিজার, লুৎফর রহমান সাগর নামে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, উপজেলার দিবর ইউনিয়নের উত্তর কাজিপাড়ায় প্রায় অর্ধশত আদিবাসী পরিবার পাকিস্তান আমল থেকে বসবাস করে আসছে। দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে ওই পাড়াটি আদিবাসী পল্লীতে পরিণত হয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আদিবাসীরা পল্লীর পুকুরপাড়ে কেউ ঘর তুলে, কেউ-বা ফসল ফলিয়ে ভোগ দখল করে আসছিল। হঠাৎ শেখপাড়া গ্রামের ইদ্রিস আলী মাস্টার পুকুরপাড়ের জমি ১৯৯১ সালে সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী লিজ নিয়েছেন বলে দাবি করেন। এতে ভূমিহীন আদিবাসীরা তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু রক্ষার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে ছোটাছুটি করে। এ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা নিরসন করতে পত্নীতলা থানা পুলিশ উভয় পক্ষকে থানায় ডেকে বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়ার প্রস্তাব দেয় এবং মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এর এক পর্যায়ে সোমবার সকাল ৭টায় ইদ্রিস আলী মাস্টার ও তার ভাই আদিবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে ওই পল্লীতে সশস্ত্র হামলা চালায়। ঘটনার পর পত্নীতলার ইউএনও আব্দুল মান্নান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা খোলা আকাশের নিচে অনাহারে অর্ধাহারে অবস্থান করছে। এ ঘটনায় আদিবাসীদের পক্ষে পত্নীতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৭)।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রিক প্রান্তিকতা: শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন

পাকিস্তানের সামন্ত-সেনাশাসকেরা জন্মসূত্রেই ছিলেন বাংলাভাষা ও বাঙালি-বিরোধী। যে কোনো কায়দায় ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত, দেশচ্যুত করা গেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করা সোজা হবে– এ ভাবনা থেকেই পাকিস্তানী সেনাশাসকেরা কালক্ষেপণ না করে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে "শত্রু সম্পত্তি আইন" (Enemy Property Act) জারী করে। যে আইনের মূলমন্ত্র ছিল: হিন্দুস্থান=শত্রুস্থান, ও হিন্দু=শত্রু। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান, মানবাধিকার, জন্মসূত্রে মালিকানার বিধান– এসবের পরিপন্থী হলেও শত্রু সম্পত্তি আইনটি কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে বাতিল ঘোষিত হয়নি; নাম

পরিবর্তন হয়েছে মাত্র– নূতন নাম, অর্পিত সম্পত্তি আইন (Vested Property Act)। বিষয়টি অন্যের জমি-সম্পত্তি বেদখলের চেয়েও অনেক গভীরের– একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ১০ লাখ হিন্দু খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মোট হিন্দু খানার ৪০%)[৭]। এই আইনে ভূমি-চ্যুতির পরিমাণ ২১ লাখ একর যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায়) ৫৩%। ক্ষতিগ্রস্ত ২১ লাখ একরের প্রায় ৮২% কৃষিজমি, ১০% বসতভিটা, ২% বাগান, ২% পুকুর, ১% পতিত ও ৩% অন্যান্য। ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি গড় জমি-ক্ষতির পরিমাণ ২৮৩ ডেসিমেল, যার মধ্যে ২১৯ ডেসিমেল (আইনে) সরাসরি ক্ষতি আর বাদবাকি ৬৪ ডেসিমেল ক্ষতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা ও ক্ষতিজনিত আর্থিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যয়িত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খানার ৭৮% হারিয়েছেন কৃষি জমি, ৬০% হারিয়েছেন বসতভিটা ও ২০% হারিয়েছেন অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি। অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপকহারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতিও (movable assets) ঘটেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায় বর্তমানে এ সম্পদ প্রায় ৬.৫ গুণ হ্রাস পেয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি আইনে আর্থিক ক্ষতির (ভূমি-জলা ও স্থানান্তর যোগ্য সম্পদ) মোট মূল্যমান হবে বর্তমান বাজার দরে কমপক্ষে ২৩০,৫২০ কোটি টাকা, যা আমাদের বর্তমান মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৭০%। আর্থিক এ ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশ মাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মা'-র পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানব সম্পদবিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা - এ সকল ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান অসীম যা নির্ধারণ করা কোনো হিসাববিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়।

গত ৪০ বছরে বিভিন্ন সরকারের আমলে ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০% ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫% হয়েছে ১৯৬৫-৭১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২০.৬% ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩.৬% ঘটেছে ১৯৭৬-৯০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তিকরণ ও পরবর্তীতে সেগুলির বেদখল প্রক্রিয়াটি জটিল। এই প্রক্রিয়ার দুই প্রধান নায়ক হলেন - স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও ভূমি অফিস (তহসিল ও এ সি ল্যান্ড)। সম্পদ দখল হয়েছে প্রধানত পাঁচ ভাবে:

১. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সাথে যোগসাজশে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন (৬৩%
ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
২. ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন (৪২% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
৩. স্থানীয় প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করেছেন– প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে
আগ্নেয়াস্ত্র, মাস্তান, জোরপূর্বক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, দেশত্যাগে বাধ্য করা, ইত্যাদি (৩০%
ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
৪. প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারীদের একজনের মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ শত্রু/অর্পিতকরণের
কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৩৩% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);
৫. স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে ভূসম্পত্তি দখল
করেছেন (১৬% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)।

'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টি কোনো অর্থেই হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা নয়। যারা বিষয়টিকে এভাবে দেখাতে চান তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন ও সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করার একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র, যে প্রক্রিয়ায় লুটপাটের ভাগীদার হয় গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি/শ্রেণী/গোষ্ঠী। সম্পত্তি হিন্দুর নাকি মুসলমানের নাকি সাঁওতালদের তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। সম্পত্তি সম্পত্তি কি না, কার সম্পত্তি এবং কোন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে বেদখল করা যায় সেগুলিই জোরদখলকারী দুর্বৃত্তদের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ দিক থেকে সমস্যাটি হল একদিকে (সর্বশেষ ২০০৬-এর গবেষণা অনুযায়ী) ক্ষতিগ্রস্ত ১২ লাখ হিন্দু পরিবার (যারা ২২ লাখ একর ভূমিসহ বহু ধরনের সম্পদ খুইয়েছেন) আর অন্যদিকে ৪ লাখ ভূমি-দস্যু সম্পদ-জবরদখলকারীর একটি গোষ্ঠী। কারণ-পরিণাম সম্পর্কের বিচারে এই ৪ লাখ জবরদখলকারী দুর্বৃত্তদের ধর্মীয় পরিচিতি আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদি ধরেও নেই যে, এই ৪ লাখ জোরদখলকারীর সকলেই মুসলমান নামধারী, সেক্ষেত্রে তারা এ দেশের মোট মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাত্র ০.২৭ ভাগ। অর্থাৎ আমাদের দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর ৯৯.৭৩ ভাগই (যাদের অধিকাংশই দরিদ্র থেকে মধ্যশ্রেণীভুক্ত) অন্যের সম্পদ জোরদখলের সাথে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে দেশের মানুষ ব্রিটিশ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন করেছেন এবং যে দেশের মানুষ পাকিস্তানী সামন্ত শাসক-শোষক বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন সে দেশে

'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টিকে যারা হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছেন তাদের সুদূরপ্রসারী হীন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন হতে হবে। অন্যথায় স্বাধীনতা ও মুক্তির অন্তর্নিহিত মূল চেতনাটিই বিনষ্ট হয়ে যাবে। অসম্ভব হয়ে পড়বে সমগ্রক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, যা ছাড়া এ দেশের সামগ্রিক টেকসই মানবকল্যাণকামী উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করেছেন তাদের কেউই লুণ্ঠনকালীন সময়ে গ্রামের বা শহরের দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, অধিকাংশই ছিলেন স্থানীয় প্রভাববলয়ের মাতব্বর গোষ্ঠীভুক্ত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তি। অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা তাদের অন্তর্নিহিত চরিত্রের অংশ; সেটাই তাদের ধর্ম এবং সে ধর্মই তারা পালন করেছে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যায় প্রশ্রয়কারী রাষ্ট্রযন্ত্র ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সুস্পষ্টভাবে কাজ করেছে। জোরদখলকারী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক অবস্থান চমকপ্রদ - তারা সদা-সর্বদা সরকার ও ক্ষমতার কাছাকাছি।

জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনে সীমিত, বাস্তবে অনুপস্থিত

জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনগতভাবে সীমিত, আর বাস্তবে নেই বললেই চলে। নারীর ক্ষমতায়নে এ এক অন্যতম বাধা। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক প্রাকটিস– এ সবই নারীর প্রতি বৈষম্য চিরস্থায়ীকরণের অন্যতম মাধ্যম। এ দেশে নারীর উত্তরাধিকার আইন ধর্মভিত্তিক "পার্সোনেল ল" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত– মুসলিম ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে শরিয়া আইন, আর হিন্দু ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে দায়ভাগ আইন। শরিয়া আইনে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সীমিত-স্বীকৃত, আর দায়ভাগ আইনে নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। বাস্তবে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আসলে কার্যকরী নয়। মুসলিম আইনে সীমিত-স্বীকৃতি থাকলেও এ দেশে মুসলিম নারী সম্পত্তির মালিকানা অধিকার থেকে কার্যত বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে "গুড সিস্টার" কনসেপ্টটি পুরোপুরি কাজ করে। "গুড ব্রাদার" মূল্যবোধ অন্তত সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে কাজ করে না। একদিকে পিতৃতান্ত্রিকতা আর অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র্য– উভয়ই সম্ভবত এ অবস্থা জিইয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে। যে কারণে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারাগুলি সংশোধনের জন্য প্রগতিশীল নারী আন্দোলনসহ সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজ এখন যথেষ্ট মাত্রায় সোচ্চার।

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতা: জল-জলায় অধিকার নেই

এ দেশে ১ কোটি ৩২ লাখ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য জল-জলা সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৎস্যখাতে সার্বক্ষণিক সরাসরি কাজ করছে ১২ লাখ মানুষ,

আর ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ কাজ করছে ঋতুভিত্তিক-সাময়িক। ১ কোটি ৩২ লাখ মৎস্যজীবীর ৮০ লাখই দরিদ্র। সদস্য-সদস্যাসহ মৎস্যজীবী পরিবারে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যাদের অর্ধেকের বেশি যে কোনো মাপকাঠিতেই দরিদ্র এবং যাদের দৈনন্দিন আয়-প্রবাহ অতিমাত্রায় অনিশ্চিত।

মৎস্যজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতার প্রধান কারণ হল জল-জলায় আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত (legal and justiciable) অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। জলমহাল লিজ-চুক্তি আর্দ্র ভূমিতে তাদের আইনগত অধিকার ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম। আইনগতভাবেই জলমহাল লিজ নেবার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের-সমবায় অগ্রাধিকার পাবার কথা। বাস্তব অবস্থা উল্টো। সম্পদবান দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি-কারচুপির মাধ্যমে জলমহাল লিজ নেন এবং/অথবা লিজ গ্রহণকারীর কাছে কমিশন নেন (নিয়মিত অথবা এককালীন)। জলমহালের অকশন মূল্য সাধারণত খুবই কম। ফলশ্রুতিতে সম্পদবান লিজ- হোল্ডার প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শুধু বঞ্চিতই করছেন না তাদের শ্রমের ফসল (জলা-খাজনা) আত্মসাৎ করছেন; মুনাফার হার এক্ষেত্রে ১০০০% পর্যন্ত হতে পারে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দরিদ্র মৎস্যজীবীর দারিদ্র্য হ্রাস (দূরীকরণ আরো পরের কথা) অসম্ভব। একথা আরো সত্য এ জন্য যে এ দেশে মোট ১২ লাখ একর খাস-জলাভূমির মাত্র ৫% এ পর্যন্ত দরিদ্রদের মধ্যে লিজ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ৯৫% বেদখল-জোরদখল করে আছে জল-দস্যুরা।

বাংলাদেশে মাছ বাজারজাতকরণ এক জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় থাকে কমপক্ষে ৬ ধাপের মধ্যস্বত্বভোগী। এসব মধ্যস্বত্বভোগীরা 'ভ্যালু চেইনে' তেমন কোনো ভ্যালু সংযোজন করে না অথচ অতি মুনাফার লোভে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শোষণ করার মাধ্যমে তাদের আয়-রোজগার কমাতে ভূমিকা রাখে।

এদেশে এখন ১ কোটি ৩২ লাখ মৎস্যজীবীদের মাত্র ১০% এ পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে জল-জলা সমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্যজীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি সম্ভব যদি দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে "জাল যার জলা তার"। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টি সংক্রান্ত দারিদ্র (income and nutrition poverty) যথেষ্ট মাত্রায় দূরীকরণ হতে পারে। এসবই মৎস্য খাতে ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত ৪৩ লাখ হেক্টর জলাভূমি ও ৭১০ কিলোমিটার উপকূল। বছরে আনুমানিক প্রায় ১৭-১৮ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মাছ রপ্তানি থেকে রপ্তানি আয় ১৯৮৬-৮৭ সালে ১ কোটি ৬ লাখ ডলার থেকে ইদানিং কালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলারে। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা একচুলও

কমেনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও যে দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস না-ও হতে পারে– এ দেশের চলমান মৎস্য খাত তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এ সমীকরণ পরিবর্তন সম্ভব– যখন মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে আর সেই সাথে মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। বিষয়টি জল-জলায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মালিকানা ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত । বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই জলা- সংস্কারের (aquarian reform)।

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ– দারিদ্র্য ও বঞ্চনার এক নূতন মাত্রা

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প-বাণিজ্য বিষয়টি এ দেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনার ইতিহাসে এক নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। এদেশে ১৫-২০ লাখ দরিদ্র শ্রমজীবী লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিষয়ক আলোচনা-বিশ্লেষণ ও নীতি-কৌশল নির্ধারণে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের প্রায় ৩২ লাখ হেক্টর উপকূল অঞ্চলের ২০ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য। এসব অঞ্চলের বিস্তৃতি ১৫ জেলার ৯৮টি উপজেলায়। দেশের মোট ১৪ কোটি জনসংখ্যার ২ কোটির বসবাস উপকূলীয় অঞ্চলে। উপকূলের মোট জমির ১০ লাখ হেক্টর এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রত্যেক দিন জোয়ার-ভাটার আওতায় থাকে; শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বাড়ে; জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণে উপকূল অঞ্চলে ফলনের তীব্রতা স্বল্প।

বন্যা আর লবণ পানি থেকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ (পোল্ডারসহ) কাজ শুরু হয় ষাটের দশকে। পোল্ডার নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দুর্বৃত্তদের ঠেলায় তা সম্ভব হয়নি। আসলে যা হয়েছে তা হল: অভ্যন্তরীণ (দেশজ) মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট; ফসল উৎপাদন ব্যাহত; চিংড়িসহ মিঠাপানি ও লবণ পানির প্রাকৃতিক মৎস্য বিচরণ ও বংশ-বিস্তার ক্ষেত্রসমূহ সঙ্কুচিত হওয়া ইত্যাদি। আর সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোল্ডারে চিংড়ি চাষ বাড়ল। পোল্ডারে জলাবদ্ধতার কারণেও চিংড়ি চাষ বাড়ল। সেইসাথে ১৯৮০-৮৫-এর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিংড়ি চাষকে যখন শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেয়া হল সাথে সাথে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা পাবার কারণে উচ্চ মুনাফার ব্যবসায় রূপান্তরিত হল। অতএব একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ (৬০-৭০ দশকে), আর অন্যদিকে ভালো-মন্দ বিচার না করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (৮০-৮৫ সালে) চিংড়ি চাষকে শিল্পের মর্যাদা দেয়ার ফলে ঘটে গেলো অঘটন– "উন্নয়ন"-এর সামাজিক অভিঘাত বিবেচনা না করার ফলে

সৃষ্টি হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সীমাহীন দুর্দশার বিস্তৃত ক্ষেত্র। সালওয়ারি চিংড়ি মাছের উৎপাদন প্রবণতা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে: ১৯৭৯-৮০ সালে এ দেশে মাত্র ২০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হত, ১৯৮৮-৮৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৮,০০০ হেক্টরে, ১৯৯৩-৯৪-এ ১৩৮,০০০ হেক্টরে, আর ১৯৯৬-৯৭-এ ৪১০,০০০ হেক্টরে।

সুপার মুনাফার লোভে নির্বিচারে চিংড়ি চাষের আওতায় চলে এসেছে অতীতের সু-ফসলী ধানী জমিসহ উপকূলীয় এলাকার বাঁধের ভিতরের আর বাইরের সকল জমি, লবণ উৎপাদনের জমি, পরিত্যক্ত ও প্রান্তীয় জমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, আর্দ্রভূমি ইত্যাদি। অপরিকল্পিত ও বিস্ফোরণমূলক এ প্রবৃদ্ধি নির্বিচারে ধ্বংস করেছে প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ সবকিছুই; পানির গুণগত মান লোপ পেয়েছে; জীনবৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়েছে; ঔষধি গাছ-গাছলার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে (এদেশে এখনও ৩২% মানুষ ঔষধি গাছ-গাছলা ভিত্তিক চিকিৎসা নির্ভর); গাছ-পালা ফলমূল-এর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে; লবণাক্ততা বিনষ্ট করেছে জমির প্রাকৃতিক গুণাবলী; হাঁস-মুরগিসহ গো-সম্পদ বিলুপ্ত প্রায় (প্রায় ২ কোটি মানুষের খাদ্যাভাসে প্রোটিন ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

চিংড়ি চাষের অঞ্চলে জমির লবণাক্ততা দানাদার ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করেছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণের উপস্থিতি ফলন-বৃদ্ধি চক্রের উপর মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে। শুধু মাত্র একর প্রতি ফলনই হ্রাস পায়নি, এমনও হয়েছে যখন পুরো ফসলই মার গেছে। ফারাক্কা বাঁধ আর সেই সাথে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় কৃষি জমিতে অম্লের (ধপরফ) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, লবণ-পানির জলাবদ্ধতা বেড়েছে এবং কাদামাটির প্রাকৃতিক গুণাগুণ লোপ পেয়েছে। এসবই ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা পড়েছে হুমকির মুখে। শুধু তাই নয়, চিংড়ি চাষের ফলে উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পানির ভৌত, রাসায়নিক, ও জৈবিক গুণাবলী এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা বিপন্ন করছে হাজার বছরের প্রকৃতি ও পরিবেশ। এ বিপন্নতা অনবায়নযোগ্য সম্পদ বিনষ্ট করছে। এ বিপন্নতা বংশ-পরম্পরা। এ বিপন্নতার ঋণাত্মক অভিঘাত দীর্ঘমেয়াদি হতে বাধ্য।

চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা প্রকৃতই দুর্বৃত্ত– দোর্দণ্ড প্রভাবশালী (ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী)। চিংড়ি ঘের-এর জমির মালিকানা হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন অথবা সরকারি মালিকানাধীন (খাস)। ব্যক্তিমালিকানাধীন ঘেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত মালিক প্রান্তিক অথবা ক্ষুদ্র কৃষক, যার কাছ থেকে ঘেরের প্রভাবশালী মালিক চুক্তি ভিত্তিতে জমি নিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এসব চুক্তি করতে বাধ্য হন। বৃহৎ চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা একই সময় অনেকের সাথে ২-১২ বছরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হন। বাৎসরিক চুক্তির আর্থিক মূল্যমান (হারি =contract money for leasing of land) একর প্রতি ২,০০০-৬,০০০ টাকা। আধা-নিবিড়

(semi-intensive) চিংড়ি ঘেরে গড়ে একজন চিংড়ি মালিক বছরে একর প্রতি পাচ্ছেন ২০০,০০০ টাকা কিন্তু জমির মালিক (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক) পাচ্ছেন মাত্র ২,০০০-৬,০০০ টাকা। অনেক ক্ষেত্রেই ঘের মালিক কর্তৃক বিভিন্ন কায়দায় জোরপূর্বক অন্যের (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের) জমি দখল এবং/অথবা নামমাত্র হারি (চুক্তির অর্থ) প্রদান না করার কারণে সংঘর্ষ-সংঘাত, মামলা-মোকদ্দমার সূচনা ঘটে। একদিকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহন আর অন্যদিকে আয়-মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হবার কারণে দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার পরিচালনে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ভূমিহীনতার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে সম্পদ হারানোর প্রক্রিয়া– এসব মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন। নিজ মালিকানাধীন জমির উপর আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক হতে বাধ্য হচ্ছেন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক। এ লড়াইয়ে ঘের মালিকেরা প্রায়শই সশস্ত্র-পেশীশক্তি ব্যবহার করেন, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ থানা-পুলিশ কোর্ট-এর ওপর তাদের প্রভাব সীমাহীন। এমনকি প্রশাসনে পোস্টিং-ট্রান্সফারও তাদেরই হাতে। এ প্রক্রিয়ায় খুন-জখম-গুম-এর শিকার হচ্ছেন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং এ অন্যায় প্রতিবাদকারী ব্যক্তি ও সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। অনেকেই এ প্রক্রিয়ায় নিজ এলাকা ত্যাগ করে দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। আবার ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুদ্র মালিকেরা যখন জমির ঋতু-ভিত্তিক লিজ দেন (অথবা দিতে বাধ্য হন; জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত) তখন লিজ-পরবর্তী কয়েকমাসে কৃষিতে ধান উৎপাদনের চেষ্টা করলেও জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাসের ফলে ফলন তেমনটি পান না।

সরকারি মালিকানার খাস জমিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের বিষয়টি জাল-জোচ্চুরি-দুর্নীতিতে ভরপুর। এক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন প্রশাসনের অন্য সবার সাথে আঁতাত করে চিংড়ি ঘের মালিকদের কাছে উৎকোচ নিয়ে খাস কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন (class change of khas land) করে থাকেন– কৃষি খাস জমি হয়ে যায় খাস জলা যা চিংড়ি চাষের জন্য লিজ পেয়ে যান সম্পদবান-প্রতাপশালী দুর্বৃত্ত ঘের-মালিক; আবার ক্ষেত্র বিশেষে ঐ অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে জাল দলিল করে ঘের-মালিক বনে যান খাস জলা-জমির মালিক। অর্থাৎ অভিনব এসব পন্থা কার্যকরী হবার ফলে খাস জলা-জমির আইনি মালিক যাদের হবার কথা সেসব ভূমিহীন, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ সরাসরিভাবেই খাস জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হন। দরিদ্র মানুষ তার অধিকার নিশ্চিত করার এ লড়াইয়ে নামলে খুন-জখম হন, মামলা- মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন– দরিদ্রদের ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের এ-ও এক অভিনব পন্থা। সেই সাথে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হিমায়িত কারখানায় আছে স্বল্পমজুরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশু শ্রম, শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা (fungal, intestinal, respiratory diseases)| সুতরাং চিংড়ি-চাষ ও বাণিজ্য একদিকে যেমন গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত ঘের-মালিক, শিল্পপতি ও রপ্তানিকারকের আর্থিক ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন

করে, আর অন্যদিকে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জলা-জমির উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকাকে করে তোলে অনিশ্চিত।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ইতোমধ্যে উপকূলীয় ব্যাপক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাসহ ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার সকল শর্ত বিলুপ্ত করেছে। সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, ভূমি সংক্রান্ত অফিস-আদালত, সন্ত্রাসী বাহিনী ঘের- মালিকদের পক্ষ নেবার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের দু'কোটি মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ওভার ইনভয়েসিং (যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে) ও আন্ডার ইনভয়েসিং (রপ্তানির ক্ষেত্রে)-এর মাধ্যমে কাস্টমস ও আয়কর বিভাগ আর ঋণসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক-বীমাসহ জলাধার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির ফাঁদে ফেলেছে– যারা দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই অতিমাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ এ দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই কাজ করছে।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে অর্থনীতি বিষয়ক সরকারি ও দাতাগোষ্ঠির পরামর্শদাতারা প্রায়ই বাহ্যিকতা (externalities)-র বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যান। সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চিংড়ির উৎপাদন ব্যয়ে যেসব ব্যয়-অভিঘাত কোনোভাবেই দেখানো হয় না সেগুলো হ'ল: উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি অবকাঠামোর বিলুপ্তি, উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতি, বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ও অভিঘাত, পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতি, ক্ষুধার্ত-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, পানির দূষণ, নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয় এবং হারির দলিলে ন্যায়-অধিকার লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন। এসব ব্যয়ের কোনোটিই কল্পিত নয়, সবই বাস্তব। এসব ব্যয়ভার বহন করছেন ও করবেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম। সুতরাং বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষকে bad economics বলাই যথেষ্ট হবে না, তা পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতী (ecologically suicidal), সামাজিকভাবে নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক (socially impoverishing), এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যায় (economically unjust)| এসবই লোনা পানি সম্পদে কৃষি-জলা সংস্কারের যুক্তিকে শক্ত পায়ে দাঁড় করায়।

খাস জমি ও জলা– দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই হিস্যা কিন্তু লুট নিরন্তর

ঔপনিবেশিক "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত) জমিদারদের প্রজাপীড়নের সুযোগ দিল। এ নিয়ে কৃষক– জমি ও জলার উপর তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। কৃষকের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফসল "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫" যদিও-বা অর্জিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। অবশেষে ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে যাবার পর ১৯৫১ সালে গৃহীত হল "পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (EBSATA[8]-

1951)" যেখানে আইনের দৃষ্টিতে কৃষককে তার ন্যায্য অধিকার পুরোপুরিভাবে দেওয়া হয়েছিল। আইনে স্পষ্ট বলা ছিল *"রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী সত্তা থাকবে না"*।

খাস জমির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে এদেশের কৃষক প্রজাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে এমনটি আশা করা হয়েছিলো। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক সামন্ত সেনাপ্রভুরা EBSATA-কে কৃষক স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহৃত হতে দেয়নি। EBSATA-কে তারা বার বার পরিবর্তন করে। উদ্দেশ্য ছিল, দেশে এমন একটি শ্রেণীকাঠামো তৈরি করা যা ঐসব সেনাশাসকদের হীন স্বার্থ হাসিল করতে পারে। ফলে পাকিস্তানী শাসনের পুরো সময়কালে খাস জমির বণ্টন কর্মসূচি প্রকৃত গরিব কৃষকশ্রেণীর ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনি। পরবর্তীতে ১৯৭১-এ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে কৃষকের স্বপ্ন লালিত ছিল দেশের সম্পদের উপর নিজেদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গরিব, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি এবং দুস্থ ও হতদরিদ্র মানুষগুলো খাস জমি ও জলার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে খাস জমি-জলা তেমনটি বণ্টিত হয়নি। আর অন্যদিকে যে সামান্য অংশ বণ্টনের আওতায় এসেছে সেক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় গ্রাম্য টাউট, মাতব্বর, অসৎ রাজনীতিবিদ ও শহুরে উঠতি বুর্জোয়াদের একটা পরজীবী আঁতাত (অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়ন-চক্র) গড়ে উঠেছে, যা বাংলাদেশে প্রকৃত মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা।

গত তিন দশকে বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন-প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শহরে পাড়ি জমিয়েছে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে বড় বড় শহরগুলোর বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন প্রণালী মেনে নিতে বাধ্য। সমগ্র নগরায়ন (urbanization) প্রক্রিয়াটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে আসলে বস্তিয়ায়ন[৯] (slumization)। বৃহৎ অর্থে কৃষি সংস্কারের (agrarian reform) আওতায় খাস জমির সুষম বণ্টনই কেবল দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংকোচনের ফলে সৃষ্ট এই "গলা-ধাক্কা অভিবাসন" (rural push migration) মোকাবেলা করতে পারত। এটি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিরও অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য হতে পারত। সরকারের তরফ থেকে ঘোষণাপত্রের কমতি ছিল না। বলা হচ্ছিল "খাস জমি গরিব জনসাধারণের প্রাপ্য।" বাস্তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করা হয়নি। আসলে খাস জমির ইস্যুকে এতটাই অবহেলা করা হয়েছে যে, এমনকি দেশে যে কী পরিমাণ খাস জমি রয়েছে এর কোনো স্বচ্ছ বিস্তারিত হিসাব সরকারের জানা আছে বলে মনে হয় না (তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদীয় কমিটি ২০০৫-০৬ সালে কিছু তথ্য দিয়েছে)।

ভূমি বিষয়ক সর্বশেষ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উল্লেখ করেছিল যে, দেশে মোট খাস জমি-জলার পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ একর। আমার হিসেবে দেশে বর্তমানে চিহ্নিত

এ খাস জমি-জলার (identified khas land) মধ্যে কৃষি খাস জমি ১২ লাখ একর, অকৃষি খাস জমি ২৬ লাখ একর, এবং জলাভূমি ১২ লাখ একর[১০] । এই হিসাব প্রকৃত খাস জমির চেয়ে অনেক কম; কারণ খাস জমির এক বৃহৎ অংশ বিভিন্ন কারণে এখনও সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত নয় । খাস জমির সরকারি হিসাব মারাত্মক বিভ্রান্তিকর । সরকারি হিসাবেই ২৩ লাখ একর খাস জলাভূমি এবং ৭১ হাজার একর খাস কৃষি জমির গরমিল আছে ।

সরকারি হিসাবে বলা হচ্ছে, চিহ্নিত ১২ লাখ একর খাস কৃষি জমির ৪৪% গরিব, ভূমিহীন ও দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে । গবেষণায় এ হিসেব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে । আসলে খাস কৃষি জমির ৮৮% ধনী এবং প্রভাবশালীরা অবৈধভাবে দখল করে আছে । অর্থাৎ যাদের জন্য খাস জমি সেই গরিব ও ভূমিহীন জনগণের সত্যিকার অধিকারে আছে মাত্র ১২% খাস কৃষি জমি । আর বণ্টনকৃত খাস কৃষি জমির সরাসরি সুবিধাভোগীদের কমপক্ষে ২০% আগে থেকেই ভূমি মালিক ।

খাস জমির বিতরণ প্রক্রিয়াটা দরিদ্র কৃষকের জন্য বড় ধরনের বিড়ম্বনা । খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রধান নায়ক হলেন সরকারি ভূমি অফিসের কর্মকতা/কর্মচারী, স্থানীয় গণপ্রতিনিধি, এবং স্থানীয় প্রভাবশালী । মিলেমিশে এরা সৃষ্টি করেছে জমি-দস্যুর শক্তিশালী এক বলয় ।

একজন ভূমিহীন ব্যক্তি খাস জমির সম্ভাব্য বণ্টন তালিকায় স্থান পাবেন কি পাবেন না তা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হল: সে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সমাজভুক্ত কিনা, সে তাদের একই রাজনৈতিক দলভুক্ত কিনা, তালিকা প্রণেতা তার কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে কিনা, এবং ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে তার যোগাযোগ কেমন (?) ইত্যাদি । গবেষণায় দেখা গেছে যে অতীতে অনেক ভূমিহীন তালিকাভুক্ত হয়েছেন অথচ শেষ পর্যন্ত জমির বরাদ্দ পাননি । বরাদ্দ না পাবার অন্যতম কারণসমূহ হল: সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগের অভাব, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে বৈরী সম্পর্ক, খাস জমি অন্যের দ্বারা অবৈধভাবে দখল হওয়া, খাস জমির অপ্রতুলতা, অসম্পূর্ণ ও অনুপযুক্ত আবেদনপত্র ।

খাস জমি বণ্টন কর্মসূচিভিত্তিক বিধি-বিধানে সংশ্লিষ্ট ভূমিহীন যারা খাস জমি পাবার জন্য নির্বাচিত হন তারা 'সালামি' (সরকারি ফি) হিসেবে একর প্রতি ১ টাকা পরিশোধ করতে দায়গ্রস্ত । সরকারি বিধান অনুযায়ী এক্ষেত্রে অন্য কোনো রকম আলাদা পরিশোধের প্রয়োজন নেই এবং এ বণ্টন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম আলাদা পরিশোধ অসাধু কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব নির্দেশ করে । অথচ গবেষণায় স্পষ্ট প্রতীয়মান যে বণ্টন কৌশলে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই ঘুষের সাথে সম্পৃক্ত । তহশিলদারকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ নিতে দেখা যায়, তারপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় টাউটদের নিয়ে গঠিত একদল লোক এবং ভূমি অফিসের লোকজন । ১ একর

খাস জমি পাওয়ার জন্য ঘাটে ঘাটে মোট প্রায় ৭,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয় (সারণি ৪)।

সারণি ৪: খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে ঘুষ

প্রক্রিয়া/উদ্দেশ্য	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
তালিকায়ন প্রক্রিয়া:		
ভূমিহীন হিসেবে তালিকাভুক্ত	তহশিলদার, ইউপি চেয়ারম্যান	খানা প্রতি ২০০ - ১০০০ টাকা
আবেদন প্রক্রিয়া:		
(ক) ফরম বিক্রি	তহশিলদার	ফরম প্রতি ২০ -১০০ টাকা
(খ) ফরম পূরণ	তহশিলদার	ফরম প্রতি ১৫ -৫০ টাকা
(গ) ফরম জমা দেয়া	তহশিলদার	ফরম প্রতি ২০ -৫০ টাকা
ফরমে স্বাক্ষর করা	*ইউপি চেয়ারম্যান*	ফরম প্রতি ৪০ -১০০ টাকা
নির্বাচন প্রক্রিয়া:		
(ক) খাস জমি পাবার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত	তহশিলদার, *ইউপি চেয়ারম্যান*	আবেদন প্রতি ২০০ - ১০০০ টাকা
(খ) খাস জমি পাবার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত	তহশিলদার, ইউপি চেয়ারম্যান	আবেদন প্রতি ১০০০ - ২০০০ টাকা
হস্তান্তর প্রক্রিয়া:		
(ক) আবেদনের উপর খাস জমির হোল্ডিং নম্বর স্থাপন	তহশিলদার, এসি ল্যান্ড, টিএনও, ডিসি, এডিসি রেভ:, স্থানীয় টাউট	আবেদন প্রতি ১০০ - ৩০০ টাকা
(খ) জরিপ রেকর্ড এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য	কানুনগো (জরিপকারী), এসি ল্যান্ড অফিসের কর্মকর্তাগণ	আবেদন প্রতি ১০০ - ৩০০ টাকা
(গ) এডিসি রেভ:থেকে ডিসি-এর নিকট ফাইল		

চালনা	একদল লোক (স্থানীয় টাউট, ভূমি অফিসের কর্মকর্তাগণ)	আবেদন প্রতি ১০০ - ৩০০ টাকা
(ঘ) খাস জমির কবুলিয়ত (চুক্তিপত্র) পাওয়া	কানুনগো, তহশিলদার, এসি ল্যান্ড	আবেদন প্রতি ২০০ - ৬০০ টাকা
(ঙ) খাস জমির বরাদ্দ পাওয়া	এসি ল্যান্ড, তহশিলদার, ইউপি চেয়ারম্যান	একর প্রতি ১০০০ - ৪০০০ টাকা
খাস জমির উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া অবস্থানের অনুমতি	তহশিলদার, পুলিশ, এসি ল্যান্ড, ইউপি চেয়ারম্যান	অর্থমূল্য পরিমাপ করা যায়নি
অবৈধভাবে দখলকৃত খাস জমির ফসল কেটে নেবার জন্য অনুমতি	পুলিশ, তহশিলদার	একর প্রতি ফসলের জন্য ৩০০-৫০০ টাকা
বৈধভাবে দখলকৃত খাস জমির ফসল কাটা অথবা বৈধ দখল সংরক্ষণ করা	স্থানীয় প্রভাবশালীগণ, তহশিলদার, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার	প্রতি ফসলের মৌসুমে ৩০০-৫০০ টাকা

উৎস: বারকাত আবুল, শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (২০০৬), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার, পাঠক সমাবেশ:ঢাকা।

খাস জমি বণ্টনের বিভিন্ন পর্বে ঘুষের মাধ্যমে নির্দেশিত এই অবাধ দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সবচেয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ নিম্নরূপ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত: স্বচ্ছতার অভাব, দুর্বল (অপ) পরিচালনা (দায়বদ্ধতার অভাব থেকে উদ্ভূত), দরিদ্র জনগণের অজ্ঞতা, দুর্বল সুশীল সমাজ, দুর্বল কৃষক আন্দোলন, ইত্যাদি।

খাস জমির অসম বণ্টনের ক্ষেত্রে ভূমি অফিসের দুর্নীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক একর খাস জমি পাবার জন্য গড়ে ৭-১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। একখণ্ড খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য একজন সুফল ভোগীকে গড়ে ৭২ কর্মদিবস ব্যয় করতে হয় (যা সরকার ঘোষিত এই কাজে প্রয়োজনীয় সময়ের ২৪ গুণ বেশি)।

খাস জমি-জলার বণ্টন ও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াটি মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী ঘটনা। ২০০১ সাল পর্যন্ত যত জমি বণ্টিত হয়েছে তার বেশির ভাগই ঘটেছে ১৯৮১-১৯৯৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৯১-৯৬ সনে খাস জমি বণ্টনের অনুপাত ১৯৮১-৯০ সনের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে ৭ বছরে ৫৬%, যেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১০ বছরে ৩৬%।

বাজার অর্থনীতি (অথবা বাজার অন্ধত্বঃ market fundamentalism অর্থে) এমনই যে দরিদ্র মানুষ জমি পাবেন কিন্তু তা ধরে রাখতে পারবেন না (issue of non retention and adverse inclusion)। গবেষণায় দেখা যায় যে ৫৪% সুফলভোগী বিভিন্ন কারণে জমির ওপর তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, ভূমিহীন গরিব জনগণের যে ক্ষুদ্র অংশটি খাস জমি পেয়েছেন তাদেরও প্রতি ২ জনে ১ জন খাস জমি বণ্টনের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও পায়নি। বণ্টনকৃত খাস জমির উপর অধিকার টিকিয়ে রাখতে পেরেছে মাত্র ৪৬% সুফলভোগী (অর্থাৎ দলিল আছে, জমি চাষ করছেন এবং ফসল ঘরে উঠাতে পারছেন)। ভূমি অফিস ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাথে দখলকারীদের যোগসাজশ জমি রক্ষা করতে না পারার প্রধান কারণ। ৫২% সুফলভোগী অবৈধ দখলকারীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। যে সমস্ত কারণে ভূমিহীন মানুষ তাদের মধ্যে বণ্টনকৃত জমি রক্ষা করতে পারেননি সেগুলো হলঃ অবৈধ দখলদাররা ক্ষমতাবান; স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে অবৈধ দখলদারদের যোগসাজশ সুদৃঢ়; আইন প্রক্রিয়া ধনী-সহায়ক; আইনগত জটিলতার বিষয়টিই বেআইনি; সরকারি সহযোগিতা কাগুজে; সমস্যা সৃষ্টিকারী সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়শই নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত; গরিবদের বিভক্ত রাখার জন্য অবৈধ দখলদাররা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে কোনো কার্যকর ভূমি সংস্কার আদৌ সম্ভব কিনা এসব পরিসংখ্যান সেসব বিষয়েই সন্দেহের জন্ম দেয়।

সুফলভোগীদের ৪৬%-এর অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। ভালো হয়নি ৫৪%-এর (যাদের মধ্যে ৩৬%-এর অবস্থা অতীতের তুলনায় খারাপ হয়েছে)। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি মূলত ২টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্তঃ (ক) ভূমির দখলি স্বত্ব ও ফসলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, (খ) জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে লাঙ্গল ও হালের বলদসহ চাষাবাদ-নিমিত্ত অন্যান্য সম্পদের উন্নতি যে ২টি জিনিস নিশ্চিত হয়নি বলেই অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়নি। অর্থাৎ অদক্ষ ও অসম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কহীন খাস জমি-জলা বণ্টন-কেন্দ্রিক ভূমি সংস্কারই সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ– প্রশ্নটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী একখণ্ড খাস জমি প্রাপ্তির আশু সুবিধা অর্জনে দীর্ঘমেয়াদের সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে (করছেনও); সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের আওতায় বাজার অর্থনীতির মারপ্যাঁচে রক্ষা করতে পারছেন না বণ্টিত খাস জমি-জলা (high non-retention rate); মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে "বৈরী অন্তর্ভুক্তিকরণ" (adverse inclusion)-এর

শিকার হচ্ছেন; জোরদখলকারী জমি-জলা-দস্যুরা সংগঠিত কিন্তু দরিদ্ররা অসংগঠিত; ঘুষসহ অন্যান্য অনেক বিধি-বহির্ভূত ব্যয় করতেও দরিদ্ররা খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না (করেন কি?) এসব কারণে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমির বিষয়টি দরিদ্রদের জন্য এক ধরনের অভিশাপের বিষয় হিসাবে গণ্য হতে পারে। আবার বর্তমান কাঠামোতে যখন দেখি যে খাস জমির সুফলভোগীদের ৪৬%-এর অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে– সেটা কিন্তু দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর মধ্যেও কিছুটা আশার লক্ষণ।

খাস জমি-জলাসহ চরের জমিতে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিষয়টি স্পর্শকাতর ও জটিল। তবে 'সমতা এবং রাণীশংকৈলে' খাস জমি-জলায় অধিকার প্রতিষ্ঠায় দরিদ্র মানুষের আন্দোলন- সংগ্রাম বিশ্লেষণে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় লক্ষণীয়, যা ভবিষ্যতে ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে[১১]:

১. ভূমিহীন-প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের প্রধান শক্তি তাদের একতা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের
মধ্যে নিহিত। প্রভাবশালী জোর দখলকারীদের যে কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভূমিহীন-
জলাহীন কৃষকদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে, কারণ তারা কৃষকদের একতা ভেঙে ফেলার
জন্য সব ধরনের পথই অবলম্বন করে। যদি প্রতিপক্ষ এটা অর্জন করতে পারে তবে খাস
জমির উপর দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

২. দরিদ্রদের উভয় লড়াই-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত– মাঠ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে
শারীরিকভাবে মোকাবিলা করা, এবং একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে তহশিল অফিস, সহকারী
কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানা এবং চূড়ান্তভাবে আদালতে তাদের
ন্যায়সঙ্গত কারণে লড়ে যাওয়া।

৩. দরিদ্র মানুষকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন এবং
দরিদ্র-বান্ধব এনজিওসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য প্রস্তত থাকা উচিত, যাদের প্রকৃত
উদ্দেশ্য বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নত করা। দরিদ্র মানুষের নেতৃবৃন্দের সাথে প্রশাসন
এবং নীতিমালা প্রণেতাদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ থাকা উচিত– স্থানীয় প্রভাবশালী

এবং টাউটদের প্রতিহত করা অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, যারা খাসজমি গ্রাস করার সময় অফিস কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কাজ করে এবং বিপথগামী করে।

৪. নাগরিক সমাজ সংগঠন যারা কৃষক আন্দোলন এবং দরিদ্র জনগণের ভূমি-অধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত, এদের পৃষ্ঠপোষকতা সংশ্লিষ্ট আন্দোলন বেগবান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫. জনগণের ন্যায়সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় খবরের কাগজগুলোতে প্রচারিত হওয়া উচিত। খাস জমি বণ্টন কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয় সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া উচিত।

৬. দরিদ্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত এবং তাদের ভূমি-জলা অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদি সুফলের বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি সুফলের জন্য সামষ্টিক-স্বার্থ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বিচ্ছিন্ন অথবা একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পরিণামে কোনো সামষ্টিক সুফল বয়ে আনবে না।

৭. দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার আন্দোলনের সফলতার কাহিনী সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার হওয়া উচিত।

চরের জমি আল্লাহ্ জানে মালিক কে? চরের মানুষের প্রান্তিকতা[১২]

চরের মানুষের দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা কেন যেন চিরস্থায়ী। চর মানেই দারিদ্র্য-পকেট। এ দেশের ৫% মানুষ (৭০-৭৫ লাখ) চরে বাস করেন যাদের ৮০% দরিদ্র। চরের ৬০% মানুষ সম্পূর্ণ ভূমিহীন– যাদের নিজ মালিকানায় কৃষি-জমি এবং বসতভিটা কোনোটাই নেই। আর চরভেদে ভূমিহীনতার এ মাত্রা বিভিন্ন, যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বয়ারচরে ৯৮% মানুষই ভূমিহীন। খাদ্য পরিভোগের নিরিখে চরের মানুষের দারিদ্র্যাবস্থা দেশের গড় অবস্থার চেয়ে অনেক খারাপ– চরের ক্ষেত্রে মাথাপিছু দৈনিক গড় খাদ্য পরিভোগ ১৯০৫ কিলোক্যালরি আর সারাদেশের ক্ষেত্রে ঐ গড় ২২৪০ কিলোক্যালরি। আর চরম দারিদ্র্যের কারণে চরের অধিকাংশ মানুষের খাদ্যতালিকা কার্বোহাইড্রেট সর্বস্ব, প্রোটিন নেই বললেই চলে। আসলে চরের মানুষ যা উৎপাদন করেন তার অধিকাংশের মালিক তারা নন। অথচ হিসেব কষলে দেখা যায় যে চরের

জমি চরের দরিদ্র মানুষের মালিকানায় গেলে মাথাপিছু গড় ক্যালরি ১৯০৫ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩৯৫৯ কিলোক্যালরিতে।

বাংলাদেশে চরের জমির মোট পরিমাণ কত তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। জানা মতে চরের জমির মোট পরিমাণ আনুমানিক ১৭২৩ বর্গ কিলোমিটার, যা দেশের মোট ভূমির ১.২%। চরের জমি প্রধানত খাস জমি। কিন্তু ৭৭% মানুষের দখলে আছে মাত্র ৭% চরের জমি, আর ২৩% মানুষের (যারা প্রধানত জোরদখলকারী) দখলে আছে ৯৩% জমি। অর্থাৎ চরে মালিকানা-বৈষম্য চরম মাত্রায় অসম। সেই সাথে চরের মানুষ যথেষ্ট ভাসমান– গড়ে একই চরে থাকেন ৬ বছর; অধিকাংশই এক চর থেকে অন্য চরে স্থানান্তর করেন এবং অনন্যোপায় হলে শহরমুখী হন। চরের মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে চরম বঞ্চিত। অধিকাংশ চরের মানুষ (৮৬%) নদী ভাঙনের কারণে চরে বাস করেন; দ্বিতীয় কারণ ভূমিহীনতা (২৬%), আর তার পরে আছে জীবিকার সন্ধান (২১%)। সবকিছু মিলে চরের অধিকাংশ মানুষই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেন এবং খাস জমি-জলা-বনে তাদের মালিকানাহীনতা ও অভিগম্যতার অভাবই প্রান্তিকতার মূল কারণ।

চরের দরিদ্র-প্রান্তিক নারী-পুরুষ নিরন্তর উচ্ছেদ আতঙ্কে বসবাস করতে বাধ্য হন। গণমাধ্যম এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই রিপোর্ট করছে। যেমন কয়দিন আগে একটি জাতীয় দৈনিক "দু'দ্বীপচরে সহস্র কৃষক পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে" শিরোনামে রিপোর্ট করেছে *"আমন ধান কাটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গলাচিপার দু'টি দ্বীপচরের অন্তত এক হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছেদ আতঙ্ক। চর দু'টির প্রায় ৬শ' একর জমি প্রকৃত আবাদকারীদের পরিবর্তে ভূমিদস্যু, প্রভাবশালী টাউট-বাটপাড় ও অস্থানীয়দের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আরও প্রায় দেড় হাজার একর জমি একই পদ্ধতিতে বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া চলছে। যার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, সীমাহীন জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ জমি গত বছর বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত জমিতে যারা বছরের পর বছর রোদে পুড়ে বর্ষায় ভিজে চরম মানবেতরভাবে বসবাস করছে এবং কঠোর পরিশ্রমে চাষাবাদ করেছে বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের আবেদন সামান্যতম বিবেচনা করা হয়নি। উপরন্তু তাদের অনেকের আবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বন্দোবস্ত পাওয়া জোতদাররা প্রকৃত কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদে নানা পাঁয়তারা শুরু করে দিয়েছে। চলছে হুমকিধমকি" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৭)*।

চরের জমি-জলা কেন্দ্রিক সংস্কারে হাত দেবার আগে জানা দরকার চরের জমি-জলা-বন সম্পদের আসল মালিক কে? গত কয়েকবছর পত্র পত্রিকায় আমরা অনেক চর-দস্যুর নাম শুনেছি। যেমন, নব্যচোরা গ্রুপ, তালেব ব্যাপারি, রশিদ্দা শেখ, তারা মাতব্বর, বাশার মাঝি গ্যাং ইত্যাদি। তাদের এক গ্রুপের একজন নিবেদিতপ্রাণ

লাঠিয়াল ব্যক্তিগত সাক্ষাতে আমাকে যা বলেছে তা প্রণিধানযোগ্য বিধায় হুবহু উল্লেখ করলাম:

"আমাদের নেতার নির্দেশে আমরা এ পর্যন্ত আনুমানিক ১৫০-২০০ মানুষ খুন করেছি, আর নারী ধর্ষণ করেছি ১৫০০-২০০০। ৬০ হাজার একর বনের মধ্যে ৪০ হাজার একর বন কেটে সাফ করে ফেলেছি.... । আমাদের কাজ হল বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূমিহীন মানুষ খুঁজে নেতার সামনে হাজির করা– নেতা একর প্রতি ৩০০০-৫০০০ টাকার বিনিময়ে তার শর্তে চরের জমি চাষ ও জমিতে বসবাস করার অনুমতি দেন। ....আমাদের গ্যাং-এ আনুমানিক ৩০০ মানুষ। ....ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করি। ....ডিসি সাহেব আমার নেতার মানুষ.... । পুলিশকে আমরা নিয়মিত মোটা অঙ্কের চাঁদা দিই। এমপি সাহেবের এখানে তেমন কোনো কর্তৃত্ব নেই– নির্বাচনে আমরা তাকে উপকার করেছি। ....জরিপওয়ালারা একবার এসেছিল.... ব্যাটাদের ঘাড়ে কয় মাথা – অবস্থা দেখে ভেগেছে। .... আমাদের নেতার মুখের কথাই এখানে আইন.... ।"

ভূমি–মামলায় জাতীয় অপচয়: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের আরেকটি শক্ত যুক্তি

বাংলাদেশে ভূমি-মামলার বিষয়টি যে জটিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এ-ও সন্দেহাতীত যে জমি-জমা কিন্তু এখনও ব্যক্তির অর্থনৈতিক শক্তি, সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম নির্ণায়ক। জমি-এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য, আর আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে তা অধিকমাত্রায় দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং আমাদের দেশে একখণ্ড জমি প্রাপ্তির এবং/অথবা জমি রক্ষার প্রতিযোগিতাও হবে বেশি। আবার "জমি না যম" এ প্রবাদটিও আছে। আর জমি যদি 'যম' হয় তাহলে জমি নিয়ে যে মামলা-মোকদ্দমা হবে তা-ও স্বাভাবিক। অথবা জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ-মনকষাকষি-মামলা-মোকদ্দমা-খুন-জখম-জালিয়াতি-বাটপারি-দস্যুতা (ভূমি-দস্যুতা, জল-দস্যুতা, বন-দস্যুতা) হয় দেখেই সম্ভবত জমিকে 'যম' বলা হয়। আবার জমি যেহেতু এক ধরনের নিরাপত্তা অথবা বীমা (ইন্সুরেন্স) সেহেতু জমি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে রুশোর মতো দার্শনিক অবশ্য বলেছেন "মানুষ যেদিন একখণ্ড বাঁশের মাথায় লাল পতাকা গেড়ে মাটিতে বসিয়ে বলল– এটা আমার– সে দিনটিই ছিল সভ্যতার শেষ দিন"।

ভূমি-মামলার পুরো বিষয়টি এখন পারিবারিক ও জাতীয়ভাবে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়ের মাত্রা নিম্নরূপ[১৩]:

চৌদ্দ কোটি মানুষের এদেশে মামলার দু'পক্ষ, তাদের পরিবারের সদস্য ও সাক্ষীসহ ভূমি-মামলার সাথে সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান (এদের প্রত্যেকেই যে মামলায় জড়িত তা নয়,

কেউ কেউ একাধিক মামলায় জড়িত)। বছরে ভূমি-কেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লাখ, যা দেশের মোট চলমান মামলার ৭৭%। এ মুহূর্তে যেসব ভূমি-মামলা রায় অপেক্ষমান সেসব মামলায় বাদি-বিবাদি মিলে মোট ভোগান্তি-বর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লাখ বছর। দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লাখ একর যা ক্রমপুঞ্জিভূত ভূমি মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান। ভূমি নিয়ে প্রতি বছর যে সব মামলা হচ্ছে ঐসব জমির বর্তমান বাজার মূল্য ১,২৭,১০০ কোটি টাকা। সমগ্র দেশে ভূমি মামলাক্রান্ত পরিবার (বাদি-বিবাদিসহ) সমূহ বছরে ১২,৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান। ভূমি মামলা-সংশ্লিষ্ট মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ২৪,৮৬০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১% রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় (স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ), ৫০% ঘুষ (যার মধ্যে ৬৫% নেন পুলিশ-থানা, ১৫% ভূমি অফিস, ১৪% কোর্টের কর্মকর্তা)। এ মুহূর্তে সারা দেশে যারা ভূমি মামলায় জড়িত তারা মামলা পরিচালনে ইতোমধ্যে ২৫,০৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন, যা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ১০%-এর সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দের চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে ভূমি-মামলায় বাদি-বিবাদির প্রকৃত ব্যয় উল্লিখিত আর্থিক ব্যয়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশি হবে, কারণ আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসেব করা হয়নি তা হল: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরনের বাহ্যিকতা-ব্যয় (externalities), যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চির ধরেছে তার অর্থ মূল্য, ভূমিকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখম-এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থ মূল্য (cost of corruption) ইত্যাদি।

ভূমি-মামলায় পারিবারিক অপচয় মাত্রাহীন। গবেষণালব্ধ সাম্প্রতিক কয়েকটি তথ্যে তা স্পষ্ট: গড়ে প্রতিটি ভূমি মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হন ৪৫ জন মানুষ। গড়ে একটি ভূমি-মামলা নিষ্পত্তিতে সময় লাগে ৯.৫ বছর। ভূমি-মামলা পরিবারের সকল ধরনের দুর্দশা বাড়ায়– অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, মানসিক। মামলাক্রান্ত ১০০%-ই বলেছেন মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধির কথা; ৬০% বলেছেন মামলার কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথা; মামলাক্রান্ত পরিবারের ৯০%-এর আয় আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে; মামলার ব্যয় মিটাতে ৬০% পরিবার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় কর্তনে বাধ্য হয়েছেন; খাদ্য পরিভোগে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন ৭৫% পরিবার; আর ৬০% পরিবার মামলা চালাতে গিয়ে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন। ভূমি মামলার কারণে

আয় হ্রাস ও প্রয়োজনীয় ব্যয় কর্তন বিষয়টি শুধুমাত্র ভূমি মামলায় সরাসরি জড়িত (বাদি ও বিবাদি)-দের জন্যই প্রযোজ্য নয়, তা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মাত্রায় লক্ষণীয়। গড়ে মামলা প্রতি বাদি অথবা বিবাদি নির্বিশেষে প্রতিটি পক্ষের যে সম্পদ হ্রাস পেয়েছে তার বর্তমান বাজারমূল্য হবে ২,২৭,৯৯০ টাকা। বাৎসরিক সম্পদ হ্রাসের পরিমাণ, গড়ে প্রতি পক্ষের ২৩,৯৯৯ টাকা।

সূতরাং ভূমি-মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে সামগ্রিক কৃষি সংস্কার ছাড়া বিশাল এ পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ অসম্ভব। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি মামলা। সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি-মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচারব্যবস্থা অকার্যকর করতেও ভূমিকা রাখছে। ভূমি মামলায় পুলিশ দু’পক্ষের কাছেই ঘুষ খাচ্ছে। তবে যে বেশি ঘুষ দিচ্ছে পুলিশ তার স্বার্থ দেখছে, কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করছে মামলা যেন চিরস্থায়ী হয়। এ বিষয়ে ভূমি অফিস, কোর্ট সিস্টেম, স্থানীয় সরকার, উকিল-মোক্তার– কেউ কারো চেয়ে কম নন। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃংখলা ও বিচারের সিস্টেমে সবচে’ বেশি লাভবান হচ্ছেন তারা যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন। এবং তারাই কিন্তু দুর্নীতি ও সিস্টেমের অকার্যকারিতা চিরস্থায়ী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। ভূমি-মামলায় সবচে’ বেশি দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, মহিলা প্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ (অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ ইত্যাদি)।

ভূমি-মামলায় বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না (losing battle for both), উভয়েই হারেন। কারণ মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও) যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয় তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি। ভূমি-মামলা মামলাক্রান্ত পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন-সহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল করে: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পিছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্য পরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিকস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক জাতীয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক। ভূমি-মামলা পারিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য সম্পর্কের বিনষ্টিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

মামলার বাদি-বিবাদি নন অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠির (যাদের অনেকেই এমনকি ভূমিহীন) একাংশ যারা যে কোনো কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ– মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে নিয়মিত আয়মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুতির ফলে দরিদ্রতর হয়ে পড়েন।

ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি; ভূমি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞানের অভাব (অথবা আবছা ধারণা); আইনের প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা; অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা-মীমাংসার ক্ষেত্রে অকার্যকর ও আইনের সাথে সঙ্গতিহীন বিচার; বিচারের রায় প্রভাবিত করার চেষ্টা (অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রচেষ্টা!); থানা-পুলিশ-ভূমিঅফিস-কোর্টের মানুষ-বিরুদ্ধ অবস্থান; প্রভাবশালী মানুষের (বিশেষত রাজনীতিকদের ও স্থানীয় বাটপারদের) অবৈধ হস্তক্ষেপ (অনেক ক্ষেত্রে এটাও তাদের অবৈধ আয়ের অন্যতম উৎস!); উকিল-মোক্তারের মক্কেল-বিরোধী অবস্থান এবং অনৈতিক ও অপেশাদারসুলভ মানসকাঠামো (অনেক ক্ষেত্রে)– এসবই ভূমি-মামলায় অপচয় বৃদ্ধিতে এবং প্রক্রিয়া প্রলম্বনে ভূমিকা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে এদেশে ভূমি-মামলা ভালো তেমন কিছুই করে না, বিপরীতে মামলাক্রান্ত পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা বৃদ্ধি করে; মানবপুঁজি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-রাজনীতি-মনস্তাত্ত্বিক জগত ভারসাম্যহীনকরণ ও কলুষিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে; সর্বোপরি স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ (freedom mediated) প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নে বড় ধরনের বাধা-বিপত্তির কারণ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সম্পূর্ণ ভূমি-মামলার বিষয়টিকে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে।

ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্বঃ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্যতম ক্ষেত্র

আমাদের দেশে ভাগচাষ ও বর্গাপ্রথার বয়স আমাদের লিখিত ইতিহাসের বয়সের সমান। সেই হিন্দু-আমল থেকে মুসলিম আমল পেরিয়ে অদ্যাবধি বিরাজমান। আর আমাদের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতি সাহিত্য সবধরনের ভাগ-বর্গা চাষকে প্রায়শ সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের নির্দেশক হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে এটা পুঁজিবাদের লক্ষণ- এ কথাও বলা হয়। তবে আমাদের ভাগচাষ-বর্গাচাষ যে অন্ত বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের বাহক হতে পারে এ কথা খুব একটা স্বীকৃত নয়।[১৪]

বাংলাদেশের কৃষিতে বর্গাবাজার বিস্তৃত। ভাগচাষ-বর্গাচাষ-এর বিস্তৃতি ক্রমবর্ধমান। প্রবণতা এরকম যে, একদিকে অপেক্ষাকৃত ধনী ও মাঝারি কৃষক অধিক হারে কৃষি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফামুখী অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছেন (মূলত আর্থিক ও মানবপুঁজির উপর কর্তৃত্বের কারণে), আর অন্যদিকে ভূমিহীন-প্রান্তি

ক-ক্ষুদ্র কৃষকরা বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে কৃষিকাজেই থেকে যাচ্ছেন এবং উত্তরোত্তর অধিকহারে ভাগচাষ-বর্গাচাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন (যে কাজে তেমন কোনো তুলনামূলক আর্থিক লাভই নেই)। বিষয়টির গুরুত্বের কারণেই তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের আগে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতির কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন জরুরি। শুধু সম্পূর্ণ বিষয়টির নিহিতার্থ বুঝবার স্বার্থেই নয় বরঞ্চ যেহেতু আমরা ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ সবধরনের ভোগদখল স্বত্বকে এ দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করি সেহেতু এ প্রয়োজনবোধ।

এটা প্রায় সর্বসম্মত ধারণা যে, বর্গাপ্রথা সামন্তবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই সামন্তবাদ বলতে পশ্চিম ইউরোপীয় ইতিহাসে "ফিউডাল ব্যবস্থা" বলে যা পরিচিত তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অথচ ইউরোপীয় ফিউডাল ব্যবস্থার অনুরূপ কোনো উৎপাদন পদ্ধতি বা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে এখনও কায়েম আছে অথবা ইতিহাসের কোনোকালেই ছিল এই

প্রস্তাবটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ বিতর্কে প্রবেশ না করে বাংলাদেশে প্রচলিত ভাগচাষ-বর্গা প্রথাসমূহের ধরন, তাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদন সম্পর্কগুলোর সারসত্তা বিচার এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে তারা কোন উৎপাদন ব্যবস্থার বাহক হিসেবে কাজ করছে-এসকল পদ্ধতিগত বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

ভাগচাষির সাথে মালিকের (জমির) সম্পর্কটা বহুমাত্রিক: ভূমি-কেন্দ্রিক, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেন্দ্রিক, বিভিন্ন ধরনের খাজনা ব্যবস্থা কেন্দ্রিক, ধার- দেনা কেন্দ্রিক। আবার ক্ষেত্রবিশেষে মালিক-ভাগচাষি সম্পর্কসমূহ বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতি-বহির্ভূত রূপ পরিগ্রহ করে। উপরোক্ত সম্পর্কসমূহ কী পরিমাণে শর্তভিত্তিক, কী পরিমাণেই-বা প্রথাভিত্তিক; কতটা অর্থনৈতিক, কতটাই-বা অর্থনীতি-বহির্ভূত- এই বিচারটা উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে ভাগপ্রথার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভাগীদার-মালিক সম্পর্কসমূহ ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত, আবার ক্ষেত্রবিশেষে সে সম্পর্ক নমনীয় নির্ভরশীলতার রূপ ধারণ করে। ভাগচাষিও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের- ভূমিহীন। স্ব-ভূমি ভাগচাষিও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের-অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ।

বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেওয়া বা মালিকের জন্য বেগার খাটা এবং শ্রম খাজনা (labour rent) – সমার্থক নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রম খাজনার প্রচলন কখনও ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জমিদারি আমলেও প্রজারা খাজনা হিসেবে যা দিত তা হল শস্যের নির্দিষ্ট কোনো অংশ- শ্রমের নির্দিষ্ট কোনো অংশ নয়। আবার শ্রম খাজনা নেই বলে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক নেই সেটাও ঠিক নয়। ইউরোপে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেও দাস উৎপাদন পদ্ধতির নির্ধারকতার আমলে রোমক সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে জমি চাষ হত দাস সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়; খাজনাদাতার সম্পর্কের ভিত্তিতে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে

খাজনা ছিল শস্য বা অর্থ খাজনা - শ্রম খাজনা নয়। ঐ দাস উৎপাদন পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে যখন সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপ নিল তখন কিছু চাষি রয়েই গেল, যারা শস্য ও অর্থে খাজনা দিত এবং ভূমি খণ্ডের সাথে সম্পূর্ণরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত নয় (অন্যরা সার্ফে রূপান্তরিত হল)। আবার সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপ নিচ্ছে সেই উত্তরণকালে শস্য খাজনা (দ্রব্য খাজনা) বিবর্তিত হয়ে অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে শস্য খাজনায়ও রকমফের আছে। "কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের শস্য খাজনা হিসাবে দেওয়া" এবং উৎপাদিত শস্যের কোনো-এক পূর্বনির্ধারিত অংশ খাজনা হিসেবে দেওয়া"[১৫] –সমার্থক নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে খাজনা ব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি (হালের বলদ, সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ সরবরাহ) সরবরাহের দৃষ্টিকোণ থেকে মালিক-ভাগচাষি সম্পর্ক হতে পারে সামন্ত বাদী, পুঁজিবাদী এবং অন্তর্বর্তীকালীন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে উৎপাদক অথবা ভূ-স্বামী। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদক ভূ-স্বামী সম্পর্কটা সামন্তবাদের লক্ষণ, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের। কিন্তু উৎপাদক ভূ-স্বামী যখন ঐসব উপকরণাদির সরবরাহ ভাগাভাগি করে নেয় তখন উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃতি কী হবে? যদি সাময়িক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক–বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে ভাগচাষ হবে অন্ত র্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের বাহক।

ভাগচাষি যখন "নির্ভেজাল" ভাগচাষি নয় অর্থাৎ একাধারে জমির মালিক ও ভাগচাষি– এটা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সম্পর্কের পরিচায়ক। এই প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের দিকে গমনের লক্ষণ, কিন্তু এখনও রক্ত-মাংসে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক নয়। আবার উল্লিখিত "ভাগচাষি মালিক" বা "স্ব-ভূমি-ভাগচাষি" যখন উৎপাদনের উপায়টুকু (মূলত জমি) হারিয়ে মজুরি শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিভূ।

বর্গাপ্রথায় একদিকে বৃহৎ ও ধনী মালিক আর অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র বর্গাদার অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বর্গা মালিক যখন সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহের কারণে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তের একাংশ পুঁজিতে রূপান্তর করছেন এবং অন্যাংশ দিয়ে সুদের ব্যবসা (উৎপাদন বিমুখ) অথবা অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ড করছেন (বাংলাদেশে এটা অত্যন্ত বাস্তব ও বিস্তৃত ঘটনা) সে অবস্থায় বর্গা মালিক-বর্গাদার সম্পর্কটি যেমন আদৌ সামন্তবাদী নয়, ঠিক তেমনি তা সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কও নয়। এটা নিঃসন্দেহে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

ভাগচাষি জমির মালিকের উপর নির্ভরশীল হতে পারে নানাভাবে। ভাগীদার যখন একাধিক মালিকের সাথে ভাগচুক্তি করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত; যখন সে (ভাগীদার) মালিক ছাড়া আর কারও কাছে শস্য বিক্রি করতে পারে না (ভাগীদার

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফসল ওঠার সাথে সাথে শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়); ভাগীদার যখন মালিকের ফাইফরমায়েস শুনতে এবং বেগার খাটতে বাধ্য হয়– এগুলো সবই মালিকের উপর ভাগীদারের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতার প্রকাশ। এসবের কোনোটাই পুঁজিবাদের নয়– প্রাক্ পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

ভাগচাষ-বর্গাপ্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে তাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদন সম্পর্কগুলো নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তার বিভিন্ন সারবস্তু সারণি ৫-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৫: ভাগচাষ-বর্গাপ্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সারসত্তা

প্রক্রিয়া কোন উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণ?

সামন্তবাদী অন্তর্বর্তীকালীন পুঁজিবাদী

১. ভাগ প্রথাধীন জমির সাথে মালিকের সম্পর্ক:

ক. মালিকের জন্য জমি পুঁজি নয়; সে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে না; আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত পুঁজি নয়, সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিমুখভাবে অপচয় করে। মালিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী নয়।

খ. মালিকের জন্য জমি পুঁজি; সে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তকে পুঁজি হিসেবে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে; পুঁজি ও উৎপাদন অবিরাম সম্প্রসারিত হয়। মালিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী (সমস্ত জমি ভাগে দিয়ে দেয়ার উদাহরণ বৃহৎ জমির মালিকদের মধ্যে এখন পূর্বাপেক্ষা স্বল্প)।

গ.মালিকের জন্য জমি-পুঁজি; আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তের একাংশকে পুঁজি হিসেবে এবং অন্য অংশকে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারে এবং/অথবা অকৃষিজ কাজে বিনিয়োগ করে।

২. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের সরবরাহকারী:

ক. উৎপাদক

খ. ভূ-স্বামী

গ. উৎপাদক ও ভূ-স্বামী ভাগাভাগি করে নেয়

৩. খাজনা পদ্ধতি:

ক. শ্রম খাজনা – বিনা মজুরিতে শ্রম দান। ভাগচাষি তার শ্রম

সময়ের একাংশ কাজ করে মালিকের জমিতে যার পুরো ফসল মালিকের প্রাপ্য, আর অন্য অংশ কাজ করে মালিক প্রদত্ত জমিতে যার পুরো বা আংশিক ফসল উৎপাদকের (ইউরোপের সার্ফ-লর্ড সম্পর্ক: ফ্রান্সের করভি ইত্যাদি) । চাষি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধা

খ. শস্য খাজনা

- পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের শস্য- খাজনা হিসেবে দেয়া হয়
- উৎপাদিত শস্যের কোনো-এক পূর্ব নির্ধারিত অংশ খাজনা হিসেবে দেয়া হয়

গ. অর্থ খাজনা

৪. ভাগচাষির মালিকানা:

ক. ভূমিহীন ভাগচাষির কোনো ভূমি মালিকানা নেই

খ. স্ব-ভূমি ভাগচাষি:

- কিছু জমির মালিক এবং আবাদে মূলত পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে ।
- জমির মালিক, অনেক জমি বর্গা নেয় এবং আবাদে মূলত মজুরি শ্রমিক নিয়োগ করে

উৎস*:* আবুল বারকাত ১৯৮৪ (= প্রযোজ্য, ঢ= প্রযোজ্য নয়)

ভাগচাষি যত দরিদ্র, ধার-দেনার প্রয়োজন তার তত বেশি । তার প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ-সুবিধা সীমিত । গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো, ঋণের শর্ত ও নিয়মসমূহের কারণে দরিদ্র ভাগচাষি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগঠিত উৎসের ঋণ নিতে অক্ষম । মহাজনি ধারও পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে নিঃস্ব এবং বন্ধক রাখার মতো কিছু তার নেই । এমতাবস্থায় দরিদ্র চাষির ঋণ প্রাপ্তির একমাত্র উৎস জমির মালিক । আর মালিক ঋণ দেবে কারণ সে জানে যে ভাগচাষি পালাবে না, ঋণ পেলে সে (ভাগচাষি) মালিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে এবং ধার শোধ পদ্ধতিটিও অত্যন্ত সরল (ফসল ভাগাভাগির সময় শোধের অংশ বা ধারের সুদ ভাগীদারের ফসলের ভাগ থেকে কেটে রাখলেই হল) ।

আমাদের দেশে ভাগচাষিরা যেসকল ধার-দেনা পেয়ে থাকে তা হতে পারে তিন রকমের (সুদের হার বিভিন্ন): খোরাকি ধার, আপদকালীন ধার এবং উৎপাদনশীল ধার । প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধার যে ফর্মেই দেয়া হোক না কেন তা পরিশোধিত হয় উৎপাদিত শস্যের মাধ্যমে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানে) । খোরাকি ধার সবচেয়ে বিস্তৃত ও

নিয়মিত ধার। ভাগচাষি তার ভাগের ফসলে বছরের পুরো পারিবারিক খরচ মেটাতে অক্ষম। কিনে খাওয়ার সঙ্গতিও তার নেই। সুতরাং মালিকের কাছে ফসল ধার নেয় (অকালে) এবং ফসল উঠলে শোধ দিয়ে দেয় (বিভিন্ন শর্তে সুদের হার দাঁড়ায় বাৎসরিক ১০ থেকে ৩০০ শতাংশে)।

আপদকালীন ধার নেয়া হয়ে থাকে বিশেষ উপলক্ষে (বিয়ে-শাদি, অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে)। এক্ষেত্রে মালিকের কাছ থেকে ধার নেয়া হতে পারে হয় ফসলে নয়তো অর্থে। তবে পরিশোধিত হয় ফসলে। উৎপাদনশীল ধার আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নতুন প্রক্রিয়া। এই ধার দেয়া হয় চাষের খরচ মেটানোর জন্য এবং এটাকে ধার হিসেবে না দেখে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণে মালিকের অংশ হিসেবেও দেখা সম্ভব। এ ধরনের ধার দেয়া হয় অর্থে নয়, কৃষিজ ইনপুটে (সার, বীজ, সেচ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি) এবং পরিশোধিত হয় ফসলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধারদাতা ধার প্রাপকের সম্পর্কটা আদৌ সামন্তবাদী সম্পর্ক নয়, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরা ভাগচাষি-মালিক সম্পর্কে ধার-দেনার প্রশ্নে প্রায়ই একটি বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দেন না। বিষয়টি হল সুদহীন ধার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সুদহীন ধার বিদ্যমান। কেন তা বিরাজ করছে, সেটা কিসের লক্ষণ? এ বিষয়ে একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। তা হল যে গরুর দুধ দুয়ে গোয়ালা বড়লোক হয় সে কি কখনও ঐ গরু মেরে ফেলবে? নিশ্চয়ই নয়। অনুরূপ অর্থে একদিকে ভাগীদারের শ্রমশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ তারই সৃষ্ট উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করার পূর্বশর্তটিকে বাঁচিয়ে রাখা, অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাকে কেনা গোলাম করে রাখা। আর যেহেতু মালিক ছাড়া অন্য কারো কাছে সে ধার পেতে পারে না, তাই গ্রামীণ দ্বন্দ্বে সে সহজে মালিকের বিপক্ষে যেতে পারে না। এমতাবস্থায় মালিক সুদহীন ধার দেবে না কেন? উপরন্তু ভাগচাষি যদি সম্পত্তিহীন চাষি হয়ে থাকে তাহলে তাকে বিনা সুদে ধার দেয়ার বিপক্ষে যুক্তি কোথায়? আর যার বিক্রির মতো কিছু আছে (শ্রমশক্তি ছাড়াও) তাকে সুদহীন ধার দেবে কেন? ইতোপূর্বে উল্লিখিত ১০ থেকে ৩০০% বাৎসরিক সুদের ধার দেয়া হবে শেষোক্ত গ্রুপের ভাগচাষিদের। কারণ সুদী ধারই হল সেই অন্যতম পদ্ধতি যার সাহায্যে শেষোক্ত গ্রুপের ভাগচাষিদেরকে দ্রুত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতির উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক হিসেবে একই গ্রামে কেউ চড়া সুদে, কেউ বিনাসুদে ধার পেতে পারে– এই দুই প্রথার সহাবস্থান আদৌ বিচিত্র নয়।

মহাজনের কাছে ভাগচাষির দায়গ্রস্ততা ভাগচাষের ক্রমবিকাশে ব্যাপক বিস্তৃত প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে যখন মহাজনের কাছে দায়গ্রস্ততার কারণে কৃষককে মহাজনের ভাগচাষিতে রূপান্তরিত হতে হচ্ছে তখন উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে পুঁজিবাদের জন্ম হচ্ছে বলা যায় না। এ ধরনের প্রক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করে মার্কস তার "অর্থনৈতিক

পাণ্ডুলিপি–১৮৫৭-১৮৫৯”-তে যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হল *“শেষোক্তটা এখনও পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার কবলে পড়েনি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ব্যতিরেকেই পুঁজির শোষণ বর্তমান এটা সে ধরনের মহাজনী, যখন উৎপাদনের উপর পুঁজি শুধু আনুষ্ঠানিকভাবেই পুঁজি। এটা প্রাক-বুর্জোয়া ধরনের উৎপাদনের আধিপত্য”* ।

সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের ভাগচাষ-বর্গা প্রথা (ও তার বিবর্তন) পশ্চিমী ভাগচাষ প্রথা থেকে ভিন্নতর। আমাদের ভাগচাষে যেভাবে পুঁজিবাদের জন্য আবাদী জমি মুক্ত হচ্ছে সেটা উৎপাদকের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং বর্তমান মালিকানা সম্পর্ক কাঠামোর অধীনে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের জন্মদানে প্রায় অপারগ। এ দৃষ্টিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বড়জোর নিকৃষ্ট পথে রক্ষণশীল পুঁজিবাদী (conservative capitalism) বিবর্তনের ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ভাগচাষ-বর্গা প্রথা আলোচনা থেকে পদ্ধতিগত দিক থেকে যেসব উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য গবেষকদের যে সকল সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদান দরকার (যা আমার জানা মতে এখনও অনুপস্থিত এবং দু’একটি যা-ও আছে তার মান সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে) তা হল: ভাগপ্রথায় প্রচলিত উৎপাদন ভাগাভাগির বিভিন্ন অনুপাত; একই গ্রামে একাধিক রকমের ভাগপ্রথার অস্তিত্ব; কৃষির খরচ ভাগাভাগির বিভিন্ন প্রথা; বিভিন্ন উপাদানের খরচ ভাগাভাগির প্রচলন; শস্য ভাগাভাগি ও খরচ ভাগাভাগির পারস্পরিক সম্পর্ক; ভাগপ্রথায় খড়ের বিভাজন; ধান ছাড়া অন্য শস্যের বিভাজন অনুপাত; উচ্চফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে ভাগ প্রথার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য; ভাগপ্রথার অন্যান্য শর্ত (শর্তের মেয়াদ কোন শস্য উৎপাদন হবে এবং উৎপাদিত ফসল কোথায় ঝাড়াই, ভাগাভাগি হবে ইত্যাদির ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত দেবে); বর্গা–জোত, নিজ-জোত ও মিশ্র জোতের উৎপাদনশীলতা; মালিকের ওপর ভাগীদারের নির্ভরশীলতা; মালিক ও ভাগীদারের মধ্যে ঋণের সম্পর্ক; উৎপাদনের জন্য কৃষিজ ইনপুটের উৎস (বাজার থেকে ক্রয় করা হয়, নাকি খামার থেকে সংরক্ষিত); বর্গাজমির মালিকদের অর্থনৈতিক আচরণ; বর্গাপ্রথার গুরুত্ব হ্রাস বা বৃদ্ধি।

আমাদের কৃষিতে ভাগচাষ-বর্গাচাষ ক্রমবর্ধমান। আর ভাগচাষি-বর্গাচাষিরা প্রধানত দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে গত প্রায় ২০ বছরে (১৯৮৭-২০০৪) চার ধরনের[১৬] কৃষকদের মধ্যে মালিক-চাষি এবং মালিক-বর্গাচাষির অনুপাত হ্রাস পেয়েছে আর অন্যদিকে খাঁটি-বর্গাচাষি এবং বর্গাচাষি-মালিক-এর অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৬)। গত ২০ বছরের প্রবণতা দেখাচ্ছে যে মোট কৃষিখামারের সংখ্যার নিরিখে খাঁটি বর্গাচাষি খামার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪% থেকে প্রায় ২৮%-এ, আর (খাঁটি) মালিক-চাষি খামার হ্রাস পেয়েছে ৫৬% থেকে ৪২%-এ। পাশাপাশি বর্গাচাষি-মালিক খামার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪% থেকে ১৮%-এ, আর মালিক-বর্গাচাষি খামার হ্রাস পেয়েছে ১৬% থেকে ১৩%-এ। শুধু খামারের আনুপাতিক হারেই নয় মোট চাষকৃত জমির নিরিখেও বর্গাচাষের

আওতায় জমির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এক্ষেত্রে গত ২০ বছরের প্রবণতা দেখাচ্ছে যে মোট আবাদকৃত জমির পরিমাণের নিরিখে খাঁটি- বর্গাচাষির চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭% থেকে ১৯%-এ, আর (খাঁটি) মালিক-চাষির চাষের আওতায় জমি হ্রাস পেয়েছে ৫৮% থেকে ৪৪%-এ। পাশাপাশি বর্গাচাষি-মালিক খামারের চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫% থেকে ২১%-এ, আর মালিক-বর্গাচাষি খামারের চাষের আওতায় জমি হ্রাস পেয়েছে ২০% থেকে ১৬%-এ। অর্থাৎ জমি চাষের ধরন যে বদলাচ্ছে এবং অধিকহারে বর্গামুখী হচ্ছে– একথা অনস্বীকার্য।

সারণি ৬: বিভিন্ন জমি ব্যবস্থাপনা ও চাষকৃত জমি

জমি চাষ ব্যবস্থা	খামারের অনুপাত (%)		মোট চাষকৃত জমির অংশ (%)	
	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪
শুধু/খাঁটি বর্গাচাষি	১৩.৬	২৭.৬	৬.৭	১৯.৩
বর্গাচাষি-মালিক	১৪.৪	১৮.০	৫.৩	২১.১
মালিক-বর্গাচাষি	১৫.৭	১২.৭	১৯.৮	১৬.১
(খাঁটি) মালিক-চাষি	৫৬.৩	৪১.৭	৫৮.২	৪৩.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: আবদুল বায়েস ও মাহবুব হোসেন (২০০৭, পৃষ্ঠা ৭০), গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি-জীবন জীবিকার পরিবর্তন আলোচনা, রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা।

বর্গা-চাষ সংশ্লিষ্ট গত ২০ বছরের উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব: (১) খাঁটি-বর্গাচাষ বাড়ছে আর খাঁটি মালিক-চাষ কমছে, (২) মুখ্যত বর্গাচাষ (অর্থাৎ যৌথভাবে খাঁটি-বর্গাচাষ ও বর্গাচাষি-মালিক) বাড়ছে– ২০ বছরে বৃদ্ধি-খামারের অনুপাতে ২৮% থেকে ৪৬%-এ, আর চাষকৃত জমির পরিমাণের অনুপাত বৃদ্ধি ২২% থেকে ৪০%-এ। আর এ মুখ্যত বর্গাচাষিরাই গ্রামের সবচে' দরিদ্র গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করে এবং বর্গাচাষ তাদের জীবিকাকৌশলের প্রধান মাধ্যম, (৩) যে হারে ধনী ও মাঝারি কৃষকরা ক্রমাগতভাবে জমি-চাষ ছেড়ে অধিকতর মুনাফামুখী অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছেন তার ফলে ভবিষ্যতে একদিকে যেমন অনুপস্থিত-ভূমি মালিক এবং/অথবা (খাঁটি) মালিক-চাষ হ্রাস পাবে তেমনি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের চাষ ব্যবস্থা যা ব্যাপক দরিদ্র কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে আদৌ লাভজনক নয়। আর অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কৃষি উৎপাদনে এসবের প্রভাব হবে ঋণাত্মক।

উল্লেখ্য যে এখন বাংলাদেশের গ্রামে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষিরাই কিন্তু ৮০% জমি চাষ করেন; বর্গায় দেয়া জমির হিস্যা এখন মোট আবাদকৃত জমির ৩২% (২০ বছর আগে ছিল ১২%) একই সময়ে বর্গায় নেয়া জমির হিস্যা ৪০% (২০ বছর আগে ছিল ২৩%); দরিদ্র চাষিদের ৬৫% এখন জমি বর্গা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। সুতরাং বিভিন্ন প্রতিকূল শর্তে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরণের ভোগ-দখলস্বত্বের বিস্তৃতি প্রবণতা, সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকের জীবন-মান পরিবর্তন না হওয়া (অথবা অধোগতি), এবং ধনী-মাঝারি কৃষকের জমি চাষে ক্রমাগত অনাগ্রহ– এ সবই বর্গাচাষ সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দৃঢ়তর করে। বর্গাচাষ সংক্রান্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে নূতন অনেক ভাবনাই ভাবা যেতে পারে তবে এ মুহূর্তে যা বিবেচনায় আনা যুক্তিযুক্ত তা হল ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইনের আওতাধীন বর্গাচাষির বর্গাস্বত্ব বাধ্যতামূলক করা; সেই সাথে পশ্চিম বাংলার "অপারেশন বর্গা" ধাঁচের সংস্কারের বিষয়াদি আমাদের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা। ভাগ-বর্গাচাষ কেন্দ্রিক এ সংস্কারে অন্যান্যের মধ্যে অন্তত দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি: (১) সংস্কার যেন দরিদ্র-বান্ধব হয়, (২) সংস্কার যেন বর্গাদার কর্তৃক চাষকৃত জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

ভূমি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আইন ও নীতিমালা: দুর্বৃত্তদের স্বার্থ সংরক্ষণের যন্ত্র মাত্র

জমি ও জলা এদেশের মূল ও মৌলিক সম্পদ। অথচ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা – উভয়ই এখনও ঔপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল কাজ তিনটি: (১) রেকর্ড সংরক্ষণ, (২) রেজিস্ট্রেশন, (৩) সেটেলম্যান্ট। সম্পর্কহীন ও সমন্বয়হীন দুটো মন্ত্রণালয়ের তিনটে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অফিসে এসব কাজ করে– এটাই ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার অন্যতম সমস্যা। যা নিরসনে কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নেই। রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় তহসিল অফিস। যেহেতু ভূমির কেনাবেচা এবং উত্তরাধিকার সূত্র চলমান সেহেতু রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি (process of transfer of land right) জরুরি। রেজিস্ট্রেশনের কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সাবরেজিস্ট্রি অফিস। এ কাজটিও জরুরি কারণ এটা হল recording of transfer। আর সেটেলম্যান্ট-এর কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেটলম্যান্ট অফিস। এ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখন যখন জনসংখ্যা ছিল কম আর চাষের আওতায় নূতন জমির হিসেব রাখা ও সংশ্লিষ্ট খাজনা আদায় প্রসঙ্গটি প্রযোজ্য ছিল (অর্থাৎ recording the expansion of cultivable acreage)–এখন এটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। মালিকানা স্বত্বের আইনি রেকর্ড (official record of ownership rights) সম্পন্ন করতে সম্পর্কহীন তিনটে সংস্থার উপস্থিতি– এটা নিজেই এক অপ্রয়োজনীয় জটিলতা। এ অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দূর করে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুসমন্বিত একক কর্তৃত্বে আনা গেলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

জমি-জলার মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা শুধু যে বেশি তাই নয়– এ প্রক্রিয়া বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে উভয়েরই নিঃস্বকরণে সহায়ক; এ প্রক্রিয়া সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে এবং সেই সাথে এদেশে সামাজিক পুঁজি বিকাশে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। ধরুন জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হল। নিষ্পত্তির প্রধান পূর্বশর্ত হল মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করা। একই জমির মালিকানার দাবিদার তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি মালিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে দাখিল করলেন তহসিল অফিসের কাগজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাখিল করলেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কাগজ, আর তৃতীয় ব্যক্তি পেশ করলেন সেটেলম্যান্ট অফিসের কাগজ। আসলে ঐ জমির মালিক কে? তিনজনই তো ভূমি সংক্রান্ত নির্বাহী সংস্থা (executive body)'র কাগজ দেখাচ্ছেন–আইনের দৃষ্টিতে তো তিনজনই মালিক। সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশের মানুষের জমি মালিকানা সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ একত্রিত করলে জমির পরিমাণ দাঁড়াবে এদেশে মোট যত জমি আছে তার চেয়ে তিনগুণ বেশি। আসলে আমরা যাকে জমি রেজিস্ট্রেশন বলি তা আসলে দলিলের রেজিস্ট্রেশন (registration of deed)– জমির মালিকানার রেজিস্ট্রেশন নয়। জমির পরচা বা নকশা (RR-Record of Right) মিলালে হাজারো ত্রুটি দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত কোনো মালিকের জমি তার নামে নামজারি বা জমা-খারিজ (mutation) করার জন্য দুটো অফিসে যেতে হয়: সেটেলম্যান্ট অফিসে কার জমি কোনটা তার মানচিত্র আঁকা হয় (প্রথম সেটেলম্যান্ট সার্ভেতে লেগেছিল ৬০ বছর– ১৮৮০-১৯৪০; এরপর ১৯৫০-এ State Acquisition Settlement, তারপরে রিভিশন্যাল সেটেলম্যান্ট যা এখনও চলছে, কবে শেষ হবে কেউই জানে না!); আর তহসিলদার, এসিসট্যান্ট কমিশনার (ভূমি), জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় প্রশাসক ইত্যাদি। এভাবে একই জমি বিভিন্ন ব্যবস্থায় মালিকানা বা নামজারি করার ফলে জমির মালিক হয়রানির শিকার হন। সুতরাং স্পষ্ট যে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুরো সিস্টেমটি অযোগ্য, অদক্ষ, অকার্যকর, অস্বচ্ছ, দ্বৈত-মালিকানা সৃষ্টিতে সহায়ক, জাল রেকর্ড প্রণয়নে সহায়ক, মামলা-মোকদ্দমার ভিত্তি সৃষ্টির সহায়ক, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা-বিরুদ্ধ, ভূমি-জল দস্যুবৃত্তির সহায়ক, ভূমি-জলা কেন্দ্রিক যত ধরনের দুর্নীতি ঘটানো সম্ভব তার সক্রিয় সহযোগী। আর এসব কারণেই মাঝখান দিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে ভূমি-জলা সন্ত্রাসীরা; ভূমি-জলা সংক্রান্ত দুর্নীতি ডালপালা গজিয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে; সৃষ্টি হচ্ছে ভূমি-জলা জোচ্চোর-দালাল গোষ্ঠি এসবই ইতোমধ্যে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন অধিকহারে পুনরুৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

এ দেশে ভূমি আইনের বিবর্তন বিশ্লেষণে মানুষ-বিরোধী তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: (১) সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন জটিল ও দুর্বোধ্য– মানুষের কল্যাণে আইন প্রণয়ন হয়নি; (২) ঔপনিবেশের স্বার্থ রক্ষার আইন-কানুন এখনও বহাল আছে; এবং (৩) একই বিষয়ে পরস্পর -বিরোধী আইন-কানুন পাওয়া যায় যা ধনী-স্বার্থ সহায়ক।

ভূমি সংক্রান্ত সবচে' জনকল্যাণকামী আইনটি হল "পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন" (১৯৫১), যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে "রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী সত্তা থাকবে না"– যে আইন গত অর্ধ শতকেও বাস্তবায়ন হয়নি। সেইসাথে জমির মালিকানা সিলিং পাল্টানো হয়েছে কয়েক দফা; সিলিং-উদ্বৃত্ত খাস জমি সবসময়েই প্রাক্কলিত হিসেবের তুলনায় পাওয়া গেছে কম এবং যা-ও পাওয়া গেছে তা স্বল্প-মাত্রায় উর্বর; সিলিং-উদ্বৃত্ত জমি বিতরণের ক্ষেত্রে আইন করে পরিবারের সংজ্ঞা পাল্টানো হয়েছে বহুবার; জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির আইন-কানুন যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, স্থানীয়ভাবে সমাধানের আইন কার্যকরী নয়, উচ্চ-আদালতে নিষ্পত্তির প্রয়োগ-কৌশল ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে; খাস জমিতে ভূমিহীনদের সমবায় সৃষ্টিতে আইন থাকলেও কখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি; সরকারি নীতিমালায় নাগরিক সমাজসহ কৃষক সংগঠন, বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠন ও জনকল্যাণকামী বেসরকারি সংস্থাসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা স্বীকৃত নয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সম্ভব

আমাদের অনেকেই খাস জমি-জলা সংক্রান্ত বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে না বুঝে অথবা আংশিক বুঝে– বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের অসম্ভাব্যতার কথা বলেন। নাকচ করে দেন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা। মোদ্দা হিসেবে দেশে প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি আছে আর সেই সাথে আছে গ্রামে ১ কোটি ভূমিহীন খানা, অর্থাৎ সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেবেই ভূমিহীন খানা প্রতি ২ বিঘা খাস কৃষি জমি বণ্টন সম্ভব। আসলে দেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ খাস জমি চিহ্নিত করা গেছে তা দিয়েই প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে ০.৫৫ একর খাস কৃষি জমি এবং ০.৫৫ একর খাস জলাভূমি বণ্টন করা সম্ভব। আর সব ধরনের খাস জমি (কৃষি, অকৃষি, জলা) মিলিয়ে প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ২.৩ একর বণ্টন করা সম্ভব।

জেলা ভিত্তিক বিবেচনায়, গড়ে প্রতিটি জেলার ভূমিহীন পরিবারে ১.৭৩ একর খাস জমি (কৃষি ও অকৃষি জলাভূমি বাদে) বণ্টন করা সম্ভব। আর ৬৪টি জেলার কমপক্ষে ১৪টি জেলায় ভূমিহীন পরিবার প্রতি গড়ে ২.৩ একরেরও বেশি জমি বণ্টন সম্ভব। আর এ পরিমাণ কৃষি জমি তো এদেশের ক্ষেত্রে শ্রম-ঘন উচ্চ-উৎপাদনশীল জোত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

শহরের খাস জমির বাজার মূল্য গড়ে গ্রামীণ খাসজমির তুলনায় ১০০ গুণ বেশি; আর ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনার মেট্রোপলিটন এলাকার সাথে তুলনা করলে তা হবে কয়েক হাজার গুণ। শহুরে খাস জমি এখন পুরোটাই আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এ দখলিস্বত্ব বজায় রাখতে এবং দখল বাড়াতে দুর্বৃত্তরা রীতিমতো সশস্ত্র মাস্তান পুষছে, যে মাস্তানি এখন আর শুধু জমি-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে সীমিত নয়। ঢাকা শহরের প্রায় ৪০০০-এর উপরে বস্তির নাম এখন ব্যক্তির নামে; ঢাকার ভিতরে আর

চারপাশে কয়েক লাখ একর নিচু-খাস জলা-জমি এখন বেআইনি ভরাট চলছে। এসব খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে এ বিষয় এড়িয়ে গেলে অন্যায় হবে।

উচ্চমূল্য ও ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে শহুরে খাস জমি-জলা নিয়ে হেন তেলেসমাতি নেই যা করা হয় না। আর এর সাথে জড়িতরা সবাই প্রচণ্ড প্রভাবশালী; এমনকি সরকারের উচ্চমহলের ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ তেলেসমাতির অংশীদার। এসব নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকরা যথেষ্ট সোচ্চার। এ বিষয়ে একটি জাতীয় দৈনিক "ধরা পড়েছে টাস্ক ফোর্সের হাতে: খাস জমি এড়িয়ে ব্যক্তিমালিকানার ভূমিতে লালবাগে বাজার নির্মাণে কারচুপি" শিরোনামে কয়েকদিন আগে লিখেছে *"দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারি খাস জমি এড়িয়ে ব্যক্তিমালিকানা জমিতে লালবাগ পাইকারি কাঁচাবাজার নির্মাণের কারচুপি টাস্কফোর্সের হাতে ধরা পড়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ভূমি মন্ত্রণালয় ও ডিসি অফিসের কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে টাস্কফোর্স। জানা গেছে, নগরীতে চারটি নতুন পাইকারি কাঁচাবাজার নির্মাণের সরকারি সিদ্ধান্তের একটি হচ্ছে লালবাগ পাইকারি কাঁচাবাজার। এ কাঁচাবাজার নির্মাণে জমি চেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। ডিসিসির আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসি অফিসকে এ দায়িত্ব দেয় ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি মন্ত্রণালয়কে এ বছরের ২৮ মে দেয়া জবাবে ডিসি অফিস জানিয়ে দেয়, প্রস্তাবিত ৩০০১ দাগের ৭ দশমিক ৭০ একর জায়গাটি খাস জমিতে পড়ে না। ...পরবর্তীতে টাস্কফোর্স তদন্ত শুরু করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসতে থাকে। টাস্কফোর্স সূত্র জানায়, প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রস্তাবিত ৭ দশমিক ৭০ একর জায়গাটি খাস জমি। এ জমিটি খাস খতিয়ানে 'খাস জমি' হিসাবে উল্লেখ রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর 'ওই জায়গাটি খাস জমি নয়' বলে ডিসি অফিসের পাঠানো চিঠিটি সঠিক নয়" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৭)।*

দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ খাস জমি-জলা রয়েছে তা দিয়েই একটি বণ্টনযোগ্য "ভূমি সংস্কার" সম্ভব। আর অতীতে যেহেতু কোনো সরকারের আমলেই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সত্যিকার আন্তরিক ও উদ্যোগী প্রয়াস নেয়া হয়নি, তাই যারা ভূমি সংস্কারের সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুলছেনুআমার বিবেচনায় হয় তারা না জেনে-শুনে করছেন, না হয় নিছক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করছেন। ভয়-ভীতি অথবা অন্য কোনো কারণ থাকলে কৃষি-ভূমি সংস্কারের পক্ষে কথা না বলা অন্যায় হবে না, তবে বিরুদ্ধ-যুক্তি প্রদর্শন হবে বুদ্ধিবৃত্তিক অপরাধ।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: কিছু সুপারিশ

জনকল্যাণকামী একটি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির গবেষণা-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপনে চেষ্টা করেছি।

বিষয়টি দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে আমাদের দেশে সবচে' অমীমাংসিত বিষয়। বিষয়টি জটিল ও পরস্পর- সম্পর্কিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে জনকল্যাণকামী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দেশের সকলের বিবেচনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমূলক সপ্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। বাস্তবায়নযোগ্যতার নিরিখে প্রস্তাবসমূহ অগ্রাধিকারভিত্তির কাজটি জরুরি। জনগণের সম্পৃক্ততায় এ কাজটি করতে পারে একটি জাতীয় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কমিশন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত সুপারিশ আপনা-আপনি বাস্তবায়িত হবে এমনটি আমি মনে করি না[১৭]। জমি-জলা বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই অবগত। সে কারণেই বিশ্বাস করি যে বিষয়টির সুরাহা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি, সদিচ্ছা, অঙ্গীকার, যোগ্যতা এবং দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগঠিত কর্মকাণ্ডের উপরেই নির্ভর করছে। প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আমি পাঁচটি বৃহৎ বর্গে বিভক্ত করেছি (অবশ্যই এসবই পরস্পর-সম্পর্কিত):

(ক) খাস জমি ও জলা সংক্রান্ত,

(খ) অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত,

(গ) আদিবাসী মানুষদের জমি-জলা-বনভূমি সম্পর্কিত,

(ঘ) ভূমি-মামলা সংক্রান্ত, এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা সংক্রান্ত।

খাস জমি-জলা সংক্রান্ত সুপারিশ

১. ভূমি বিষয়ক সংসদীয় কমিটি (২০০৫ সালে) যে ৫০ লাখ একর খাস জমি (কৃষি, অকৃষি ও জলাভূমি)-র কথা বলছেন তা অবিলম্বে চিহ্নিত করে জনগণকে অবহিত করা।

২. ৫০ লাখ একর খাস কৃষি জমি-অকৃষি জমি ও জলা অবিলম্বে দেশের দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করা।

৩. প্রাপ্য সমস্ত অকৃষি শহুরে খাস জমি শহরের গরিব জনগণের মধ্যে বণ্টন করা। বস্তি থেকে নগর-দরিদ্রদের উচ্ছেদ বন্ধ এবং সহজ কিস্তিতে খাস জমিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৪. দলিত, বেদেসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা।

৫. উপকূলীয় অঞ্চলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত খাস জমি অবিলম্বে ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেয়া।

৬. প্রকৃত পেশাদার জেলে সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাস জলাভূমিসমূহ বণ্টন করা।

৭. খাস জমি চিহ্নিতকরণের সমস্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচার মাধ্যমসমূহে (রেডিও, টিভি ও বাংলা দৈনিকসহ) প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

৮. চরের সকল জমি দিয়ারা জরিপ পূর্বক খাস খতিয়ানভুক্ত করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা।

৯. খাস জমির বিভ্রান্তিকর শ্রেণীবিভাজন বন্ধ করা (যেমন কৃষি জমিকে জলাভূমি হিসেবে দেখানো)।

১০. বণ্টনকৃত ও বণ্টনযোগ্য সমস্ত খাস জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করা।

১১. খাস জমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে কৃষক সংগঠন, ক্ষেতমজুর, রাজনৈতিক দলসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসমূহ ও স্কুল-শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

১২. এসব কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া।

১৩. খাস জমি চিহ্নিতকরণ, বাছাই, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ত স্থানীয় সরকারের ফলপ্রদ সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা।

১৪. কৃষক ও ভূমিহীনদের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক উপস্থিতির ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে একটি খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও জেলা পর্যায়ে একটি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন কমিটি গঠন করা। খাস জমি উদ্ভূত যে কোনো ধরনের বিবাদ অনুসন্ধান/তদন্ত করা এবং মালিকানা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা এই কমিটিকে প্রদান করা।

১৫. খাস জমির চিহ্নিতকরণ, বাছাইকরণ, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গরিব জনসাধারণ ও তাদের সবধরনের প্রতিষ্ঠান/সংগঠনসমূহের সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬. খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য বাংলায় লিখিত ফরম গরিব জনগণের মাঝে বিতরণ করা।

১৭. ভূমিহীনরা যেন তাদের মাঝে বণ্টনকৃত জমি-জলা রক্ষা করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনি-ইনপুট সরবরাহ করা ও আইনি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা।

১৮. জমির দখলী স্বত্বের সমস্যা ও ফসলের ওপর কর্তৃত্বের সমস্যা নিরসনে আইনগত সহায়তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এসব ব্যাপারে এনজিও ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সংস্থার সহায়তা (যেমন আইনগত পরামর্শ) ব্যবস্থা জোরদার করা।

১৯. উৎপাদনমুখী উপকরণ ও কৃষিজ-ইনপুট কেনার ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে ঋণ সুবিধার প্রসার ঘটানো। উৎপন্ন ফসলের বাজারজাতকরণের সহায়ক ব্যবস্থা চালু করা।

২০. সরকারের পক্ষ থেকে গরিব ভূমিহীন জনগণকে পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি সহায়তা প্রদান করা।

২১. কৃষি খাস জমি বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জাতীয় প্রচারমাধ্যমসমূহে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

২২. সম্ভাব্য সব ধরনের পরিস্থিতিতে সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা গঠনে প্রণোদনা দেয়া। ২৩. ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সাথে সাথে স্থানীয় তহসিল অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার থানা এবং সর্বোপরি কোর্ট থেকে ন্যায়সম্মত অধিকার আদায় করে নেবার জন্য কৃষকদের সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলা।

২৪. কৃষক আন্দোলন/গরিব মানুষের অধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত নাগরিক সমাজ-সংগঠনগুলোর প্রচার-এডভোকেসি কার্যক্রম জোরদার করা।

২৫. কৃষক আন্দোলনের সফল কাহিনীসমূহ সঠিকভাবে নথিভুক্ত, প্রকাশ ও ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

২৬. ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা।

২৭. বণ্টন-পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি Watch dog mechanism (যেমন নাগরিক কমিটি) প্রতিষ্ঠা করা।

২৮. বণ্টন প্রক্রিয়ার গতি দ্রুততর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি আইনের পরিবর্তন/পরিমার্জন/মান উন্নয়ন করা।

২৯. খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়াকালীন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩০. খাস জমি ও ভূমিহীন ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের জন্য সরকারি জরিপের পাশাপাশি ভূমিহীন কৃষক, কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও এনজিও-সমূহের প্রতিনিধি নিয়ে একটি স্বাধীন জরিপ কমিটি গঠন করা।

৩১. ভূমিহীনদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩২. প্রভাবশালীদের জমি আত্মসাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় ভূমিহীন ও সচেতন নাগরিকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি চাপ সৃষ্টিকারী জোট (pressure group) গঠন করা।

৩৩. ভূমি-সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন সহজবোধ্যভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

৩৪. প্রভাবশালীদের দ্বারা দায়েরকৃত ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে যত ধরনের মামলা আছে তা প্রত্যাহার করা।

খাস জমি নিয়ে অতীতে বাগাড়ম্বর হয়েছে অনেক। কাজের কাজ হয়েছে যৎসামান্য। দেশের শতকরা ৬০ জনকে ভূমিহীন রেখে উন্নতি অসম্ভব। দেশে প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ তথা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহিস্থের (excluded) অন্তর্ভুক্ত (include) করতে একটি মৌলিক কৃষি সংস্কার (ভূমি ও জলা সংস্কার যার অনুষঙ্গ) অনস্বীকার্য। আর তা

বাস্তবায়ন করতে ক্ষমতায় যে সরকারই থাকুক-না কেন থাকতে হবে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, হতে হবে তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, উদ্যোগী ও আন্তরিক। আমাদের চিহ্নিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ (enabling environment) নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পূর্বশর্তসমূহ পালন করতে হবে :

১. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে খাস জমি-জলা আত্মসাৎ করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে দেশে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি সৃষ্টি হয়েছে, যারা খাস জমির সুষম বণ্টনে প্রধান অন্তরায়।

২. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে অবৈধ দখলদারদের বড় অংশ সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের সম-দলভুক্ত।

৩. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে খাস জমি-জলা চিহ্নিতকরণ ও বিলি-বণ্টন ফলপ্রদ করা জনকল্যাণকামী স্থানীয় সরকার ও সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব নয় (যা সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন"-এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ)।

৪. ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড ব্যবস্থা সেকেলে; ভূমিসংশ্লিষ্ট অফিস-আদালত অদক্ষ ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। রেকর্ড ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য মাত্রার স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সরকার ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে অনুধাবন করতে হবে যে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব যদি প্রকৃত ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাস জমি বণ্টন করা যায়। ৬. খাস জমির চিহ্নিতকরণ, বণ্টন এবং কৃষকের কার্যকর অধিকার নিশ্চিতকরণ এসব ইস্যুতে জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিবেশন আহবান করা উচিত।

৭. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে খাস জমি-জলা সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যুতে ভূমিহীন, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে স্পষ্ট ঘোষণা থাকা প্রয়োজন।

৮. গরিব জনগণের অধিকারের প্রশ্নে সমস্ত কৃষক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নীতি ও খাস জমির বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের অদক্ষতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা।

৯. খাস জমি বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় এবং থানা পর্যায়ের সমস্ত সামাজিক সংগঠন, এনজিও ও রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের কণ্ঠ প্রসারিত করা।

অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্কিত সুপারিশ

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি যেহেতু অত্যন্ত জটিল সে জন্যই সমাধান নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু পূর্বশর্তের কথাও উল্লেখ

করেছি। সমাধানযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জবরদখলকারী গোষ্ঠী ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্টরা ইতোমধ্যে পরিকল্পিতভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করছেন। আর ধর্মভিত্তিক উগ্রসাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের ভিত প্রশস্ত হওয়ার ফলে এ প্রক্রিয়া দৃঢ় হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতাধীন সম্পদ-সম্পত্তির মালিক সরকার নয়, সরকার হল রক্ষক/জিম্মাদার (custodian not owner)। সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা হল ঐ সম্পত্তি মূল মালিক এবং/অথবা তার উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে দেয়া; সেই সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত (লিজ) দেয়া এবং বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারদের অগ্রাধিকার দেয়া। সরকার যখন নিজেই বলছেন যে ২ লাখ একরের বেশি তার হাতে নেই[১৮], তখন ধরে নিলে হিসেবে কোনো ভুল হবে না যে ২০ লাখ একর দুর্বৃত্তরা গ্রাস করেছে।

আমি স্পষ্ট মনে করি যে সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট (specific) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। যেহেতু সমস্যাটি ভূমি সম্পদকেন্দ্রিক ও তা ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছে সেহেতু সুপারিশকৃত কোনো কোনো সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞজনের অভিমত/মতামত নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার প্রধান সুপারিশগুলো হল নিম্নরূপ:

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন [The Vested Property Repeal (Return) Act-2001]- আর কালক্ষেপণ না করে বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ আইনে বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে যে সব পরিবর্তন সুপারিশ করেছেন সে সব বিবেচনা করা।
২. জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সরকারি ঘোষণা হিসেবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া যে উক্ত আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
৩. শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সম্পদ প্রত্যর্পণের লক্ষ্যে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা (জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণসহ)।
৪. সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারি রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি মূল মালিক/ উত্তরাধিকারীদের কাছে লিজ (বন্দোবস্ত) দেয়া।
৫. শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে অধিগৃহীত যা কিছু ৯৯ বছরের লিজ (বন্দোবস্ত) দেয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করে মূল মালিক/উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেয়া।
৬. সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (priority) দেয়া, যেমন
  ক) অর্পিতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়েছেন,
  খ) যে সব পরিবারের প্রধান হলেন মহিলা,
  গ) অর্পিতকরণের ফলে যারা বসতভিটা হারিয়েছেন,
  ঘ) অর্পিত মন্দির, প্রার্থনাস্থল, শ্মশান ঘাট ইত্যাদি,

ঙ) তহসিলদারসহ ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে সব সম্পত্তি দখল করেছেন,

চ) যে সকল ক্ষেত্রে প্রায় সকল উত্তরাধিকারী এ দেশের নাগরিক

ছ) ১৯৬৫-৭১ পর্যন্ত যাদের সম্পত্তি শত্রু-সম্পত্তি হয়েছে এবং যারা/যাদের আইনি উত্তরাধিকার এদেশের নাগরিক,

৭. জবরদখলকৃত সম্পত্তি (যা সরকারিভাবে বন্দোবস্তকৃত নয়) চিহ্নিত করে বিস্তারিত তালিকা

প্রণয়ন করা।

৮. যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিভিন্নকারণে বিলম্বিত হতে পারে অথবা সমাধান বিঘ্নিত হতে পারে তাদের জন্য বিশেষ 'ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ'-এর ব্যবস্থা করা।

ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সরকারি খাস জমি-জলা, বন্ড, ঋণ সুবিধা (অর্থে এবং/ অথবা পণ্যে) ইত্যাদি।

৯. যে সকল শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির আইনগত দাবিদার (উত্তরাধিকারী) অনুপস্থিত সে সকল সম্পত্তি মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র হিন্দু জনগোষ্ঠীর (বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের) উন্নয়নে ব্যবহার করা।

১০. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারকে (সংবিধানের ৫৯-৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক) সর্বোচ্চ মাত্রায় সম্পৃক্ত করা।

১১. সমস্যার সমাধানকাজ শুরু করা যেতে পারে সে সকল অঞ্চলে যেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির (রাজনৈতিক ও বেসরকারি সংস্থা) গণভিত্তি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ১২ লাখ হিন্দু পরিবার ২৬ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন

(সর্বশেষ ২০০৬-এর গবেষণা অনুযায়ী)। অমানবিক এই সমস্যাটি গত ৪০ বছর যাবত জিইয়ে রাখা হয়েছে ; ভূ-সম্পত্তি হাত বদল হয়েছে যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আইনগতভাবে প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাও হয়তো-বা দুষ্কর ; সরকার বলছেন তাদের হাতে মাত্র ২ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ প্রায় সকল সম্পত্তি সরকারের বেহাত হয়েছে; জোরদখলকারীরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবলয়ের সাথে সুসম্পর্কিত– সুতরাং কেউ কেউ হয়তো-বা ভাবতে পারেন যে সমস্যার সমাধানে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কল্পনাপ্রসূত অথবা যথেষ্ট বাস্তবমুখী নয়। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট– সমস্যাটি মানব-সৃষ্ট কিন্তু মনুষ্যবিরোধী। সুতরাং সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান হতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যতে একই ধরনের এবং অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় অনিবার্য।

আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি সংক্রান্ত সুপারিশ

১. বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে) তা পূর্ণভাবে (কোনোভাবেই খণ্ডিত নয়) এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

২. শান্তিচুক্তির যে সকল ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনও কার্যকরী হয়নি সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া, যেমন ভূমি কমিশন সক্রিয় করা।

৩. আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও ঐতিহ্যগত শাসনকাঠামোর সর্বোচ্চ সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা।

৪. জোরপূর্বক দখলকৃত পাহাড়ি জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি-শান্তি চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া মোতাবেক– ভূমি কমিশনে প্রেরণ ও সমাধান করা।

৫. সমতল ভূমির যে সকল বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছেন– তাদের স্বেচ্ছায় সমতল ভূমিতে ফিরে আসার জন্য প্রণোদনা দেয়া।

৬. সমতল ভূমির বাঙালি বসতি স্থাপনকারী অথবা বসতি নন, বন বিভাগ, সেনা বিভাগসহ সরকারের এজেন্সি (উন্নয়ন প্রকল্পসহ) কর্তৃক ব্যক্তিগত অথবা যৌথ ভূমি-বন অধিগ্রহণ এখন থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা (complete moratorium)।

৭. আদিবাসী মানুষের ভূমি-অধিকার (যা আংশিকভাবে CHT Regulation ১৯০০-এ স্বীকৃত) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া।

৮. ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির সাথে ভূমি কমিশন আইন ২০০১-এর যে সব ধারা সাযুজ্যহীন সেগুলো সংশোধন করা (শান্তি চুক্তি অনুযায়ী)।

৯. পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা নন অথচ রাবার চাষসহ অন্যান্য প্লানটেশন চাষের জমি নিয়েছেন এবং গত ১০ বছর চাষাবাদ করছেন না এমন সব চুক্তি বাতিল করা।

১০. আদিবাসীদের প্রথা ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া। ১১. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।

১২. আদিবাসীদের ভূমি জোরদখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

১৩. বনের আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা ও বনবিভাগের হয়রানি মামলা প্রত্যাহার করা।

১৪. ইকো পার্কের নামে বন উজাড় বন্ধ করা।

ভূমি-মামলায় পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ সংক্রান্ত সুপরিশ

সামগ্রিক দূর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো বহাল রেখে যেমন সমস্যার আদর্শ সমাধান সম্ভব নয় তেমনি এটাও ঠিক যে কাঠামো পরিবর্তন না করেও "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" হিসেবে কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এদেশে ভূমি-মামলার বিষয়টির সুরাহা দেখতে হবে সামগ্রিক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (agrarian- land-aquarian reform) সহ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত মানব উন্নয়ন-এর অংশ হিসেবে। আর এসব বৈপ্লবিক এবং/অথবা বড় মাপের সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত না করা গেলেও কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব যা ভূমি-মামলা-সংশ্লিষ্ট দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-ক্লেশ প্রশমনে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে সংস্কারের আওতায় আসতে পারে: (ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন; (খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইন ব্যবস্থা; (গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা। এবং অবশ্যই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১)-বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের লাগাতারভাবে বলে যাওয়া এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব কার্যকর করার প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এসব বিবেচনা থেকেই আমার প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোর্ট, ভূমি প্রশাসন, ও থানা-পুলিশের দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. বিচার বিভাগের স্বায়ত্তশাসনকে এ সমস্যা সমাধানে কার্যকর করা।

৩. স্থানীয় পর্যায়েই (গ্রাম/ইউনিয়ন/পাড়া/মহরল্লা) প্রচলিত প্রথাগত 'শালিস' পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

৫. দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি ট্রাইবুনাল গঠন করা।

৬. ভূমি-মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা– তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণ আইনসম্মত (কারণ দ্রুত নিষ্পত্তি আর্থিক-পেশী প্রতিপত্তিবানদের জন্য লাভজনক হতে পারে)। ভূমি-মামলা শ্রেণীবদ্ধ করে বিভিন্ন শ্রেণীর মামলার নিষ্পত্তির সময়-সীমা বেঁধে দেয়া।

৭. উন্নত মানস-কাঠামো সম্পন্ন অধিক সংখ্যক দক্ষ পেশাজীবী বিচারক নিয়োগ দেয়া।

৮. ন্যায়বিচারের রায় কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা (এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা স্বচ্ছ করা)।

৯. ভূমি-মামলা কোর্টে আসার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিক সমাজের মতামত জানা।

১০. উপজেলা কোর্ট পুনঃস্থাপন করা (জনকল্যাণকামী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ)।

১১. ভূমির প্রকৃত মালিক অথবা তার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিরূপণ করা (বিক্রেতার মালিকানা নিশ্চিত না হয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা; জাল দলিল নিরূপণ করার ব্যবস্থা করা)।

১২. রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেশন-এর ব্যবস্থা করা।

১৩. মাঠ পর্যায়ের তদন্ত ছাড়া *মিউটেশন* (নামজারি অথবা জমা-খারিজ) না করা।

১৪. ভূমি রেকর্ড সিস্টেমে কোর্টকে সম্পৃক্ত করা।

১৫. ভূমি-মামলার রায় প্রভাবিত করতে রাজনীতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরত রাখা– বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা (সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা)।

১৬. যারা জমির জাল দলিল/কাগজপত্র করা এবং অবৈধ জমি দখলের সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা (এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা)।

১৭. এমন আইন করা যাতে জমি-জমার জাল দলিলকরণের সাথে সম্পৃক্তরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

১৮. সার্ভেয়াররা যেন ভূমির রেকর্ড এবং সেটেলমেন্ট-এর কাজ সঠিক এবং প্রভাবমুক্তভাবে করতে সক্ষম হন– সরকারকে এ দায়িত্ব নেয়া।

১৯. আইনজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পেশার মানবিকীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; কেসের শ্রেণীভিত্তিক ফিস্ নির্ধারণ; ম্যাল-প্রাকটিস দূর করা ইত্যাদি)।

২০. জমি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের মালিকানাস্বত্ব গুরুত্বসহ বিবেচনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা।

২১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন এবং এ আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয় খতিয়ে দেখা (বিষয়টি জন্মসূত্রে মানুষের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের সাথে সম্পর্কিত)।

আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা সংক্রান্ত অন্যান্য সুপারিশ

১. খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ অকৃষি খাস জমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

২. ১৯৯৪ সালের শিকস্তি-পয়স্তি আইনের সংশোধনী বাতিল করা এবং শিকস্তি-পয়স্তির সকল চর-ভূমি খাস হিসেবে ঘোষণা দেয়া।

৩. রিয়াল এস্টেট ব্যবসা অথবা তথাকথিত গৃহায়নের নামে খাস জমি, জলাশয়-জলমহাল দখল ও ভরাট কঠোরভাবে দমন করা।

৪. খাস জমি-জলা ও উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত জমি-সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার সংবিধানিক অধিকার) ও ভোগদখল নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

৫. সকল ভূমি জরিপ কাজ প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও স্থায়ী জরিপকারীদের দিয়ে করার ব্যবস্থা নেয়া। ৬. ভাগ/বর্গাচাষসহ অন্যান্য ভোগদখল স্বত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের আদলে করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা। বর্গাস্বত্ব আইন যথাদ্রুত সংস্কার ও বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা যেন তা দারিদ্র্য-বান্ধব হয় এবং বর্গাধীন জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

৭. কৃষি খাতে কর্মরত দিনমজুরসহ নারী-পুরুষভেদে সকলের জন্য বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমান নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতর করতে রেকর্ড সংরক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন ও সেটেলম্যান্ট একই মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা।

৯. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আদিম পদ্ধতি বাতিল করে সম্পূর্ণ বিষয়টি সমন্বয়পূর্ণ একক কর্তৃত্বে আনার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার একক পদ্ধতির আওতায় সার্টিফিকেট (CLO: Unitary System of Certificate of Land Ownership) প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা (এক্ষেত্রে বাধার বিষয়াদি বিবেচনা করে জনগণকে অবহিত করা)।

১০. ভূমি ও জলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি "জাতীয় ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি" (National Land-water Utilization Policy; National Land Use Policy) প্রণয়ন করা।

১১. সরকারিভাবে ভূমি-জলা ব্যাংক (Land-Waterbodies Bank) প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যাংকে ভূমি-জলা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদির হালনাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে কেউ তথ্য পেতে পারেন: খাস জমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্ত অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সকল অর্পিত সম্পত্তির ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্ত অন্যান্য; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবরদখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা ইত্যাদি;

চিংড়ি ঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবর দখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা; সকল ভূমি-

মামলার ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধের কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা; সকল বর্গাদারের বর্গাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট তথ্যের হাল নাগাদ অবস্থা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারঃ প্রয়োজন এবং সম্ভব

জমি, জলা আর জনমানুষ (যাদের বেশিরভাগই গ্রামে বাস করেন এবং দরিদ্র)– এসব বাদ দিলে বাংলাদেশে সম্পদ কোথায়? আর এ তিন সম্পদের কার্যকরী সম্মিলনই তো আসলে উন্নয়ন। যে মানুষ জমি ও জলায় শ্রম দেন তিনি তার মালিক নন– এটাই দুর্বৃত্তবেষ্টিত বাংলাদেশের বর্তমান

বাস্তবতা। জমি-জলা তো সম্পদের মাতা আর জমি-জলায় শ্রমদাতা হলেন সম্পদের পিতা। মাতা-পিতার প্রাকৃতিক স্বাভাবিক এ সম্পর্কটি এ দেশে অস্বীকৃত। এখানেই তো অনুন্নয়নের গোড়ার কথা।

একথা তো ধ্রুব সত্য যে জমি ও কৃষকই হল সভ্যতার ভিত যেখানে কর্ষণ হল সভ্যতার সাংস্কৃতিক ভিত্তি। জমি দুস্প্রাপ্য সম্পদ, আর সে কারণেই এ সম্পদের মালিকানা সবসময়ই পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক। আর জমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা সম্পৃক্ত বিষয়াদি সন্ত্রাস, কালো কর্মকাণ্ড, মামলা-মোকদ্দমাসহ প্রায় সকল ধরনের উৎপাদন-বিরোধী ও মানব-কল্যাণ বিমুখ কর্মকাণ্ডের উৎস। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎসও জমি। সুতরাং বর্তমান কাঠামোতে কোনো ধরনের জমি-জলা বণ্টন (খাস-অখাস নির্বিশেষে) নিঃসন্দেহে প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। সেই সাথে একথাও অনস্বীকার্য যে, গরিব মানুষকে জমি দেবার কথা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করেননি এহেন সরকার এখনও পর্যন্ত এদেশে বিরল। কিন্তু যেহেতু আইনগতভাবেই দরিদ্র জনগণই খাস জমি ও জলার প্রকৃত মালিক হবার কথা সেহেতু তাদের মালিকানা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। দরিদ্র মানুষের মালিকানায় খাস জমি-জলা দারিদ্র্য উচ্ছেদেও অন্যতম প্রধান কৌশল হতে পারে। এমনকি জাতিসংঘে গৃহীত ও আমাদের সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অর্জনে অর্থনীতিতে বার্ষিক যে ৭%-৮% প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে কৃষি- ভূমি-জলা সংস্কার করলে শুধু যে তা অর্জন হবে তাই নয়, বরঞ্চ সেই সাথে ধনী-দরিদ্রের সম্পদ বৈষম্যও যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পাবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বেগবান হবে। শক্তিশালী হবে প্রকৃত 'টেকসই উন্নয়ন'-এর ভিত।

জমি-জলা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা-অধিকার অথবা আইনগতভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মালিকানা নিশ্চিত করার সাথে ধর্মের অথবা জাতিসত্তা হিসেবে সংখ্যালঘু অথবা আদিবাসী হবার অথবা দরিদ্র হবার কী সম্পর্ক? এ সম্পর্ক থাকতে পারে শুধু অসভ্য সমাজে। আমরা যতই অসভ্য সমাজে বাস করি না কেন– 'আমি (প্রত্যেকে) অসভ্য' এ দাবি তো ধোপ-দুরস্ত একজন দুর্বৃত্তও এদেশে মানবেন না। দেশকে সবার জন্য বাসযোগ্য করার আগে নিজের মানস-কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন; হতে হবে মনেপ্রাণে মানবকল্যাণকামী, অসাম্প্রদায়িক– এদেশে অধিকাংশ মানুষই তো মনেপ্রাণে তাই। মনে রাখা উচিত হবে যে যেসব দুর্বৃত্তরা খাস জমি-জলা অথবা হিন্দুদের

সম্পত্তি ও আদিবাসী মানুষের সম্পত্তি জোরদখল করে লুটেপুটে খাচ্ছে তারা কিন্তু এ দেশের গুটিকয়েক মানুষ– সংখ্যায় স্বল্প। ঐতিহাসিকভাবেই তো অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো ও প্রগতির ক্ষেত্র এদেশে যথেষ্ট উর্বর ও বিস্তৃত। তা হলে তো কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারও সম্ভব।

সমস্যাটা রাজনৈতিক। বৃহৎ রাজনৈতিক দল মাত্রই জমি-জলার বিষয়টিকে শুধু ভোটের ইস্যু হিসেবেই দেখেন। সেটাও তো ভালো কথা– অন্তত ইস্যুটি স্বীকৃত (অনেক বড় মাপের ইস্যুও তো এখনও স্বীকৃত নয় আবার নন-ইস্যুকে ইস্যু করতেও আমরা পারদর্শী)। অবশ্য তারা ক্ষমতায় আসার আগে গরিব মানুষকে জমি-জলা সম্পত্তি দেয়ার কথা বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ফেরত দেবার কথা বলেন, আদিবাসী মানুষের সব সমস্যার সমাধানে প্রতিশ্রুতি দেন, আর নারীকে দিয়ে দেন সবকিছু– কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করেন। আর অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের দল– প্রগতিশীল-অপ্রগতিশীল নির্বিশেষে একই ওয়াদা করেন– পার্থক্য হল তারা কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারেননি; সেই সাথে এ নিয়ে কার্যকরী-ফলপ্রসূ কোনো আন্দোলন-লড়াই সংগ্রাম করছেন তা-ও নয়। নাগরিক সমাজসহ বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কেউ কেউ এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কথা বলছেন। এখন যা দরকার সেটা হল কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বহুমুখী জটিল বিষয়টিকে জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যেহেতু এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের যুক্তিসঙ্গত প্রাণ-দাবি সেহেতু ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন ভূমি সংস্কারের খসড়া প্রস্তাবও প্রণয়ন করেছিল।[১৯]
বাংলাদেশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক যে বিকাশ প্রবণতা সেখানে 'উন্নয়ন' বলতে শুধুমাত্র মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা যে কোনো পথে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি বুঝলে ভুল হবে। কারণ এসব বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধির হারের সাথে প্রকৃত দারিদ্র্য হ্রাসের সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য উচ্ছেদ করে না; বৈষম্য দূর করে না; উল্টো– অনেকক্ষেত্রে ঐ বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি বৈষম্য বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধিরই সহায়ক। আসলে উন্নয়ন দর্শন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল এমন হতে হবে যা দারিদ্র্যের সব রূপ নিরসন করবে এবং সেই সাথে অর্থনীতির বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। আর তা যদি নিশ্চিত করতে হয় সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে যেখানে মানব উন্নয়নে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি, কৃষক সংগঠনসহ বিভিন্ন স্তরের নাগরিক সমাজকে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা ও ভূমি অফিসের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করতে হবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ওপর। প্রস্তাবিত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারই পারে এ দেশে দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক একীভূত উন্নয়ন সম্ভাবনার নূতন দিগন্ত উন্মোচন করতে। এ সংস্কার সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে দুটি বিষয়ের সম্মিলন প্রয়োজন: (১) উষ্ণ হৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন

মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব, এবং (২) সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ। সমগ্র বিষয়টি মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনায় সিক্ত সুদৃঢ় এক রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিষয়। বিষয়টি যেহেতু জ্ঞানভিত্তিক লড়াই-সংগ্রামের, সেহেতু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন নীতি-কৌশল বিষয়ে দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব (home grown epistemology) বিনির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা জরুরি।

টীকা

১. তথ্য উৎস: এ প্রবন্ধে উত্থাপিত বিষয়াদি বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল Barkat Abul, *et.al*, (2000), An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act; Barkat Abul (2004), Commercial Shrimp Cultivation, Eroded Environment and Livelihood of the Poor; Devasish Roy and Sadeka Halim (2002), "Valuing Village Common in Forestry", in *Indigenouns Perspectives*, Vol-5, No-2, December 2002, Tebtebba Foundation; Devasish Roy and Sadeka Halim (2004), "Protecting Forest Common through Indigenous Knowledge Systems:
Social Innovation for Economic and Ecological Needs in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh", in the *Journal of Social Studies;*
Shapan Adnan (2004), Migration, Land and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh; Barkat Abul, S Zaman and S Raihan (2001), Political Economy of Khas Land in Bangladesh; Barkat Abul (2004), Right to Development and Human Development: Concepts and Status in Bangladesh; Barkat Abul (2004), Poverty and Access to Land in South Asia–Bangladesh Country Study; Barkat Abul, PK Roy and MS Khan (2007), Char Land in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource; Barkat Abul and PK Roy (2004), Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage; Barkat Abul, (26 May, 2007), Deprivation of Affected Million Families: Living with Vested Property in Bangladesh; মোঃ আনিসুর রহমান (১০ নভেম্বর ২০০৭),
"বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থ-সমাজ সংস্কার"; আবদুল বায়েস ও মাহবুব হোসেন (২০০৭), গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি-জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা। বর্তমান নিবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ষোড়শ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রবন্ধকার কর্তৃক উপস্থাপিত (১৩ ডিসেম্বর ২০০৭) "বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি- জলা সংস্কার: উন্নয়নের বিকল্প নেই" প্রবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। প্রবন্ধটি কয়েক দফা

টাইপ করে সহযোগিতার জন্য প্রাবন্ধিক মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (এইচডিআরসি) জনাব মোজাম্মেল হক-এর কাছে দায়বদ্ধ।

২. বিগত সরকারের পাঁচ বছরে (২০০১-০৬) মূল্যসন্ত্রাসীদের সংগঠিত এ সিন্ডিকেট খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কৃত্রিম ভাবে বাড়িয়ে জনগণের কাছ থেকে মোট প্রায় ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে। এ লুটের ৬৮% ঘটেছে খাদ্য খাতে আর ৩২% ঘটেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে; মোট লুটের ৭২% ঘটেছে গ্রামে আর ২৮% শহরে; লুটের শিকার হয়েছেন ১৪ কোটির মধ্যে ১৩ কোটি মানুষ (দেখুন, আবুল বারকাত, 'মূল্য সন্ত্রাস' ও সংশ্লিষ্ট লুট: বিএনপি-জামাত সরকারের পাঁচ বছর, ২০০৬)।

৩. ২০০১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী দারিদ্র্যের মাত্রা ৫৬% আর বাংলাদেশ খানাভিত্তিক আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী- প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য ৪০%। অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশই দারিদ্র্য পরিমাপে আয় ও ব্যয়ের দারিদ্র্যকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য হল সুযোগের অভাব বা সমসুযোগের অভাব। আর বৈষম্য-বঞ্চনা থেকেই এর উৎপত্তি। এ বৈষম্য-বঞ্চনা প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও শুধু অর্থনৈতিক নয়। গ্রামীণ দারিদ্র্য-শহুরে দারিদ্র্য নির্বিশেষে দারিদ্র্যকে দেখতে হবে অনেক ধরনের দারিদ্র্যের পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে, যার মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, রাজনৈতিক দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, (নারী, ধর্ম, বর্ণ, আদিবাসী, চরের মানুষ), মানস-কাঠামোর দারিদ্র্য ইত্যাদি (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ জুলাই ২০০৬)।

৪. বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul (2006), Energy Security and its Implications for the Poor, CSD-14, UN HQs, NY. Ges Barkat Abul (2006), Rural Electricity Cooperatives in Bangladesh: Impact on Employment Creation and Poverty Reduction, Shanghai–China.

৫. বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul, AKM Munir, and S Akhter (2001), Arsenic Contamination of Drinking Water in Bangladesh – Overcoming Sickness and Measures to Improve Health Situation, DLB, Germany.

৬. বিস্তারিত দেখুন, Devasish Roy and Sadeka Halim (2002), "Valuing Village Common in Forestry"; Devasish Roy and Sadeka Halim (2004), "Protecting Forest Common through Indigenous Knowledge Systems: Social Innovation for Economic and Ecological Needs in the

Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", Shapan Adnan (2004), Migration, Land and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

৭.বিস্তারিত দেখুন, Abul Barkat *et.al* (2000), An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution, PRIP Trust: Dhaka.

সর্বশেষ গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৬৫-২০০৬ সময়কালে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২ লাখ হিন্দু খানা এবং মোট ভূমি-চ্যুতির পরিমাণ ২৬ লাখ একর (দেখুন, Abul Barkat *et.al.*, 2008 forthcoming)।

৮. EBSATA = East Bengal State Acquisition and Tenancy Act-1951

৯. বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul and S Akhter (2001), "A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladeh," *Harvard Asia Pacific Review*, Vol-5, Issue 1, Winter 2001, Harvard, Cambridge, MA, USA.

১০. চিহ্নিত খাস জমি-জলার বিস্তারিত বিভাজন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত নয়। সম্ভবত সরকারও পুরো তথ্য জানে না। এক্ষেত্রে এক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কৃষি: অকৃষি: জলা-র আনুপাতিক হিসেব পাওয়া যায় মোট খাস জমি-জলার যথাক্রমে ২৪.২%, ৫১.৬% ও ২৪.২%। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, শফিক-উজ-জামান ও সেলিম রায়হান (২০০৬), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি, পাঠক সমাবেশ।

১১. বারকাত আবুল, শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (২০০৬), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার, পাঠক সমাবেশ:ঢাকা।

১২. চরের জমির রাজনৈতিক-অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul, PK Roy, MS Khan (2007), Char Land in Bangladesh: Political Economy of Ignored
Resource, *Pathak Samabesh:* Dhaka.

১৩. বিস্তারিত দেখুন: বারকাত আবুল, ওবায়দুর রহমান ও সেলিম রেজা কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ (২০০৬), "বাংলাদেশে ভূমি-মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা", পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

১৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত (১৯৮৪), "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান", *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র জার্নাল*, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

১৫. শস্য ভাগাভাগির অনুপাতটা (মালিক ও ভাগচাষির মধ্যে) কেমন হবে সেটা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন- জমির উর্বরতা; দুপক্ষের আপেক্ষিক আর্থিক

ক্ষমতা; উৎপাদন ব্যয় বহনের ভাগাভাগি সম্পর্ক শর্ত; মূল শস্যের সাথে সহজাত অন্যান্য দ্রব্যের (যেমন খড়) বিভাজন জনিত শর্ত; উৎপাদিত শস্যের ধরন ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগাভাগির অনুপাতটা ১ঃ১ অথবা ২ঃ১ কেন এবং

কেনই-বা আবহমানকাল ধরে অনুরূপ অনুপাত বজায় থাকছে- বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এখনও বিতর্কের পর্যায়ে অবস্থান করছে।

১৬. চার ধরনের বর্গে বিভাজিত কৃষকদের সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ (১) খাঁটি বর্গাচাষি– যাদের নিজেদের কোনো জমি নেই, যে জমি তারা চাষ করে তা অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেয়া, (২) বর্গাচাষি-
মালিক– যাদের চাষকৃত মোট জমির অর্ধেকের বেশি অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেয়া, আর
অবশিষ্টাংশ নিজের জমি, (৩) মালিক-বর্গাচাষি– যাদের চাষকৃত মোট জমির অর্ধেকের বেশি
নিজের জমি, আর অবশিষ্টাংশ বর্গা নেয়া, (৪) মালিক চাষি– যাদের চাষকৃত সবটুকুই নিজ
মালিকানাধীন জমি (বিস্তারিত দেখুন, আবদুল বায়েস ও মাহবুব হোসেন ২০০৭)।

১৭. এমনটি মনে না করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এ দেশে 'দুখী' মানুষের জীবন 'সমাজ
প্রধান'দের কাছে বাঁধা। বিষয়টির স্পষ্ট বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান বলেছেন *"এদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ অনুন্নত, এবং বিশেষ করে এদেশের গ্রামীণ আর্থ-সমাজ ব্যবস্থায় আজো সামন্ততন্ত্রের মূল চরিত্র"* অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের *সঙ্গে দুখী মানুষদের পেট্রনক্লায়েন্ট সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সার্বিকভাবে 'মালিক'রাই প্রভুত্ব করছেন, হয় জমি নয়তো প্রযুক্তি নয়তো বাজার নয়তো মহাজনী অর্থের ওপর বা এই সমস্তের একাধিক বিষয়ে মালিকানা বা প্রভুত্ব কিংবা একক অথবা গোষ্ঠীগত আধিপত্যের জোরে। এবং এই ক্ষমতার জোরে গ্রামাঞ্চলের বিত্তহীন দুখী মানুষদের সিংহভাগ তাদের জীবিকা ও জীবনের জন্য, এমনকি এই সমাজের নারীকুল তাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও, এই 'মালিক'দের কৃপার ওপরে নির্ভরশীল"* (বিস্তারিত দেখুন, মো. আনিসুর রহমান ২০০৭, পৃঃ ৩)।

১৮. সরকারি হিসেবে দেশের ৬১ জেলা (পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলা বাদে) থেকে প্রাপ্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির সমন্বিত তালিকা অনুযায়ী দেশে অর্পিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৬,৪৩,১৩৬ একর যার মধ্যে ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের দখলীয় সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯৭,৪২০ একর, আর বেহাত বা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে আছে ৪,৪৫,৪২০ একর। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী ঐ সম্পত্তির তালিকা গেজেটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তালিকা প্রকাশে আইনি

জটিলতা দেখা দিয়েছে যে কারণে ভূমি মন্ত্রণালয় দিক-নির্দেশনা চেয়ে উপদেষ্টা পরিষদে সারসংক্ষেপ পাঠিয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০০৭)।

১৯. এ খসড়া প্রস্তাবের সারাংশ নিম্নরূপঃ *"১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে এদেশের ভূখণ্ডে জমি মালিকানায় মেরুকরণ শুরু হয় বড়ো ও ছোট মালিক-চাষি দুই শ্রেণীই বাড়তে থাকে এবং মাঝারি চাষি কমতে থাকে, যার ফলে জমির মালিকানায় বৈষম্য বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে ছোট মালিক-চাষি ও বর্গাচাষি দু'য়েরই আপেক্ষিক সংখ্যা বাড়তে থাকে। ছোট চাষিদের জমিতে নিবিড় চাষ ও আধুনিক চাষ-পদ্ধতির প্রয়োগের কারণে ফলনও বড়ো চাষিদের জমির তুলনায় বেশি হারে বাড়তে থাকে। তাই একই সঙ্গে দু'টো কারণে রাষ্ট্রীয় দর্শন অনুযায়ী সমতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের*

পথে যাবার জন্য, এবং দেশের কৃষিতে সার্বিকভাবে উৎপাদনের হার বাড়াবার জন্য ভূমি সংস্কার জরুরি হয়ে পড়ে। জমির বণ্টনে পূর্ণ ইকুইটি এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা কেবল সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক (যৌথ) মালিকানা ও যৌথ চাষের মাধ্যমেই হতে পারে যাতে ইকনমি অব্ স্কেল আদায় করা যায় এবং ফসলের বণ্টন শ্রম অনুযায়ী হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি মালিক-চাষিদের নিজের নিজের জমির ওপর গভীর টান থাকে যার ফলে হঠাৎ করে মালিকানা হারিয়ে ফেললে তারা উৎপাদন-কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারে এই কারণে এই পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বড়ো ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে যারা

জমিতে বড়ো স্কেলে শ্রমিক নিয়োগ করে ও পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রম শোষণ করে অনর্জিত আয় ভোগ করে তাদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। এসব বিবেচনায় পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করে যে, ভূমি সংস্কারের প্রথম পর্যায়ে যে আয়তনে জমি ঐতিহাসিকভাবে বেশি ফলনশীল হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় রেখে একটা সীমার ওপরে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে সেখানে দৃষ্টান্ত মূলক সমবায়ভিত্তিক চাষ হবে। বর্তমানে যেসব বর্গাচাষি এ-সমস্ত জমিতে চাষ করছে তাদের এই সমবায়গুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া হবে। যে সমস্ত বর্গাচাষি ভূমি-সংস্কারসীমার চাইতে ছোট জমিতে কাজ করছে তাদের যতদিন সমবায়ের পরিধি বাড়িয়ে সদস্য করা না হয়; ততদিন তাদের আইনগত ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য, এবং যাতে সমবায়ভিত্তিক চাষের

বাস্তব পরীক্ষার জন্য অর্থপূর্ণ আয়তনে জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, এই বিবেচনায় জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা প্রস্তাব করা হয় ১০ 'স্ট্যান্ডার্ড' একর, যে সীমা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে জমির ফলনশীলতার তারতম্য অনুযায়ী কমবেশি হবে (যথা, কুমিল্লার জন্য ৭.৫ একর এবং যশোরের জন্য ১৩.৮ একর)। এভাবে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে তাদের সমবায়ভিত্তিক চাষের জন্য ভূমিহীন পরিবার থেকে কর্মী নেওয়া হবে এবং তাদের সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই কর্মীদের ন্যূনতম

শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে অষ্টম শ্রেণী, এবং তাদের পরিবারিক জমির পরিমাণ তিন একরের অনুর্ধ্ব হতে হবে। এদের মধ্যে এই
কাজে মুক্তিযোদ্ধা এবং/অথবা সেচ-গ্রুপের দায়িত্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চাষিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে" (মো. আনিসুর রহমান, "পথে যা পেয়েছি", ২০০৪: ৫১-৫২)।

গ ল্প

তিন জন গল্পকারের তিনটি গল্প

তু হি ন স ম দ্দা র

....

অসম্পৃক্ত

পুঁটকী ফাটা গরম পইড়েচে এবার। আর এই গরমে সুস্থির হইয়ে বইস্‌তে চালি কোতায় যাতি হবে ঢাহা শহরের মদ্দি কও দিনি? পার্কগুলোনরে তো তোমরা হাপিশ কইরে ফেইলেচো। আর আর যে সকল বিনোদনের ব্যবস্থা বানায়ে রাখিছো, তাতে তো আমার মতন ঢ্যামনারা মোততেও বসে না। তালি বাকি থাইকলো কী কতি পারো? বাকী থাইকলোতো শুদু সংসদ ভবন। বিশ্ববিখ্যাত একটা বিল্ডিং, নাকি যে বিল্ডিংটার নকশা কইরেচিলো সে বিশ্ববিখ্যাত? আর কত কী বিশ্ববিখ্যাত আছে আমাদের কলজের ভিতরে? লিস্টি দিতি গেলি তো রোদ ম্যালা পইরে যাবেনে বাপ। তবু যাই কও বাপু, এমন দরজা ছাড়া বিল্ডিং নজরুল ইসলাম আর দেখেনি। অবশ্য দরজা একদম যে নেই তাই-ই বা বলে কী করে। বাইরে থেকে দেকা যায় না ঠিকই। প্লাজা ঘুরে নিচের সুরঙ-

রাস্তায় সেঁদিয়ে গেলি হোলের তলায় এন্ট্রেস আছে। তবে ঐসব রাস্তা তার মতো ক্লাশছাড়া লোকজনদের জন্য তো নয়ই এমনকি তার নাম নিয়ে জাতীয় কবি নিজে এসেও যদি স্ট্যান্ড আপ হয়ে থাকেন তাহলেও খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। বলো বীর- বললি এখন আর বীরের অবাব হবিনানে। কাটা রাইপেল নে হাজির হবেনে সোনার, হীরের আর চাঁদের টুকরো সব সোনামনিরা। তখন তোমার মতো ঝাকড়া চুলের বাবরি দোলায়ে আর কাজ হবিনানে বাপ। আগে এন্তার জবাবদিহি কত্তি হবে যে সে এখানে এসেছিলো অবশ্যই নয় একটি নতুন বিদ্রোহী কবিতা লেখার জন্য।

নজরুল ইসলাম

বয়স : ৪৮

সাকিন : সাতক্ষীরা জেলার অমুক উপজেলা

পেশা : বান্দর খেলা (দেখানো)।

উচ্চতা : ৩ ফুট সাড়ে-... ইঞ্চি।

এই উচ্চতাটাই তাকে গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে। বেশি লম্বা লোক যা হোক তবুও একটু কোলকুঁজো হয়ে বা নুয়ে বাঁকিয়ে হেঁটে নিজের দু-এক ইঞ্চি কমাতে পারে। কিন্তু তার মতো বাঁটকুলুদের সামনে কোনো অপশনই রাখেননি পরওয়ারদেগার। এখন আর এই বয়সে লম্বা হবার কোনো আশা না করে বরং মাথা উঁচু করেই সে হাঁটে। কিন্তু হাঁটলে কী হবে? তার মাথা অন্যের কোমর পর্যন্ত যায়। ফলে খুবই হাস্যকর লাগে দেখতে। তাকে মিলিটারি মেজাজে গম্ভীর মুখে হাঁটতে দেখলে প্রথমত বাচ্চা পোলাপান আর পুলিশেরা শুরু করে যন্ত্রণা। টোকাইদের যন্ত্রণা তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু পুলিশগুলোর মুখ না জানি খাটা পায়খানা। নাম ধাম কিচ্ছু না, ওকে দেখলেই ডাক পারে– ওই মাদারচোদ এদিক আয় হাউয়ার নাতি! আর তাকে দেখলেই শালাদের কোনো না কোনো কাজ মনে পড়ে যাবে। একবার এক শালার রাজা কনডম পর্যন্ত কিনে এনে দিতে হয়েছিলো। কেনরে শালা? গাড় মারাবি তুই আর ন্যাকড়া নে আমারি ঠায় দাঁড়ায়ে থাকতি হবি নাকি? নজরুল ইসলামের মেজাজ যে কী পরিমাণ গরম হয় তা বোঝা যাবে শুধু তার কাঁচাপাকা জুলপি বেয়ে ঘামের স্রোতের বহর দেখে। এই গরমে কার না মেজাজ তাতে? আর ঢাকা শহরের বাড়িওলাদের তেল কী রকম বাড়ছে দিন দিন খেয়াল করিচো? দেখলে হাগা বন্ধ হয়ে যায়। উরিব্বাপ! তিনতলার ফাউন্ডেশনে আঠের তলা তুলতেও শালাদের কোনো বিকার নেই। বাপ দাদার নাম নাই ট্যেম গোপালের নাতি! খেয়াল করো, এই গরমের মদ্দে ইটা বালি সুঁরকি সিমেন্ট, সিফটিন, বাটালি, হাতুড়ি, ক্রাশার... তো এই গরমে নজরুল-ইসলাম-জাতীয় প্রাণীদের বাঁচার আর জীবন ধারণের (বাঁচে যারা সবাই তারা জীবনধারণ করে না, আর যারা জীবনধারণ করে আছে... থাক থাক বাপ তোমাকে আর এই ধূলার দুপুরে দার্শনিকতা করি নাম কামাতে হবে না) একমাত্র পথ হল জাতীয় সংসদ। আর তাই নজরুল

ইসলাম সন্দে হলেই রাইতের বেলায় বান্দর খেলা দেখায় সংসদ ভবনে। তার সাথে একটা হাড় জিরজিরে সিড়িঙ্গে গোছের বান্দর। আরেব্বাহ্ বান্দর তো মাস্ট। নাকি তোমরা চাও নজরুল ইসলাম নিজেই বান্দর হয়ে খেলা দেখিয়ে সবাইকে এন্টারটেইন করুক? তা বাবা সেইসব দিন কি আর আছে? সংস্কৃতি নাকি এখন আকাশের দখলে। কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে সব চলে যাচ্ছে চ্যানেলে চ্যানেলে। কোনোকিছু চাপায়ে রাখার জো নেই। তা কোনো মদনকে তো দেখলাম না নজরুল ইসলামের মতো একজন প্রতিভাধর স্বোপার্জিত বান্দর-খেলোয়াড়কে নিয়ে স্টোরি করতে। অন্তত কোনো না কোনো টকশোতে তো এট্‌লিস্ট বান্দরের একটা ইন্টারভিউও নেয়া যেতো। যা চলতেছে আজকাল, বান্দর অন্তত তারচেয়ে খারাপ কিছু বলতো না। তবে একটা সমস্যা হতো এক্ষেত্রে। এক চ্যানেলে এক কথা বলে ফির আর-এক চ্যানেলে অন্য কথা বলতে পারতো না এই বান্দর। যদিও দেখলেই বোঝা যায় শালা শয়তানের দাদাভাই! কিন্তু ব্যাটা চলে পাতায় পাতায়– নজরুল ইসলামকে তুষিয়ে।

এ যাবৎ সতের বার নজরুল ইসলাম এই কুজাতটাকে বাড়িছাড়া করেছে। প্রতি বছরে একবার করে। কিন্তু ব্যাটা আবার ফিরে আসে। খামশি খেয়ে পড়ে থাকে। মাঝে দু একবার অতিষ্ঠ হয়ে নজরুল ইসলাম নিজেই বান্দরকে ফাঁকি দিতে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। শয়তানের দাদাভাই ঠিক ঠিক গন্ধে গন্ধে হাজির হয়ে ধরে ফেলেছে নজরুল ইসলামকে। ধরি ফেলিচো, ও আমার নাঙ-চোদানী তোমার জন্য আমার জীবন চলি গেলো শালী তবু তোর হাত দে নিস্তার নেই। ওরে আমার কুলাঙার। এই জন্যিই তোরে আমি পেটে ধরিনি। তোর মতোন বান্দর জর্ম্ম দিতি পারলি আজ কি আমার বাঁটকুলু হইয়ে থাকতি হতো? কেবল আফসোস করে নজরুল ইসলাম। এই শালীর বান্দরের জন্যি তার কিছুই করা হলো না। আর এখন একমাত্র উপার্জনের পথ এই বান্দর খেলা। শালী সেটা বোঝে কিন্তু তারপরও ওর জন্যে তাকে কম নাকাল হতে হয়নি। এবং ভবিষ্যতে আরো কতো নাকানি চোবানি কপালে আছে কে জানে ?

অপ্রচলিত হলেও কথাটা সত্যি যে নজরুল ইসলামের জীবনেও পেরেম এইসেচিল। তা তার হবু প্রেমিকা প্রথমেই শর্ত জুড়ে দিল। ওই বান্দররে বন্দরে ফেলাইয়া তারপর আহো বেপারী, দুইজন মিল্যা রোজগার করুম। তুমি খদ্দের ডাইকা আনবা আর আমি...বান্দর রাখন যাইবো না কইলাম বান্দর দেখলে আমার শইল কাঁপে ডরে...

কিন্তু বান্দরের ইতিহাস নিয়ে নজরুল ইসলামের ঝুলিতে কিছু ভালোমানুষ টাইপের নির্দোষ উত্তর আছে। যেমন কেউ যখন জিজ্ঞেস করে-

- এই বান্দর পাইছো কই?
- আল্লায় দিচে। সাত দিন আগে অগেরে আমি কিনিচি হাটেরথে।
- কত দামে ?
- বারোশো টাকা দরে।
- কয়টা খেলা পারে বান্দরে?
- সতেরটা খেলা দেখাতি পারে।
- কে শিখাইছে এই খেলাগুলান? যার কাছ থিকা কিনছো, সে?
- নাহ। সেই মুনিব শিখায়েচিলো তিনচাইরডে, বাকিগুলোন আমার হাতে পইড়ে শিখেচে বাবা, আসোলি, কদিন গেলি পর ও আরো বেশি খেলা শিকতি পারবি। (কচু ! সতের বছর থেকে এই বান্দরকে চারপাঁচটার বেশি খেলা শেখাতে পারেনি নজরুল ইসলাম। বরং তার নিজের আচরণের মধ্যে বান্দরের কিছু 'ফরমুলা' ঢুকে গেছে। কিন্তু এমুন এমুন বললি মানুষের সিমপ্যাথি বাড়ে, জানে সে।)
- নাম কী বান্দরের?
- টাইগার! নজরুল ইসলাম এমন হুড়ুম মেরে বলে যেন সে নিজেই হালুম করে এখনি কারো ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে জানে; কিন্তু নেহাত করুণাবশত পড়ছে না।
- তা দেখাও দেখি তোমার বান্দর কী খেলা দেখায়, দেখি...
নজরুল ইসলাম তখন হাতের লাঠিটা দিয়ে মাটিতে জোরে শব্দ করে আঘাত করে। মুখ দিয়ে কুঁতকুঁত আওয়াজও তোলে একই সাথে। এই শব্দে বান্দর কিছুটা বশে থাকে। শালা শয়তানের দাদাভাই ঠিক বোঝে এখন রোজগারের সময় বাতেলা করলে চলবে না। মেজাজ বুঝে যা বলে নজরুল ইসলাম- তাই করার চেষ্টা করে। কিন্তু পাবলিকের আনন্দ পাওয়ার বা গ্রহণ করার আগ্রহ সীমাহীন। কিসে যে সে আনন্দিত হবে তা একমাত্র সে-ই জানে। কখনো বান্দর পেটানো দেখে মজা পায়। আবার কখনো-বা মানুষকে বান্দরে পেটাচ্ছে- সেটা দেখেও তাদের আমোদ। আর এই সব আমোদ-প্রমোদের ক্যাটালিস্ট হিসেবে টাইগার যখন তার কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে ব্যর্থ হয়, পাবলিক তখন হই হই করে ওঠে। আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নজরুল ইসলাম তার সাড়ে তিনফুটি শরীরটা নিয়ে জাম্বুবানের মতো লাফিয়ে পড়ে বান্দরের পিঠে লাঠির ঘা বসিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে পিঠ কেটে রক্তও বের হয় তাতে। হায়, নজরুল ইসলামের যদি পাভলভের এনিমেল সাইকোলজি পড়া থাকতো...

তবে এ ধরনের ঘটনা খুব বেশি একটা ঘটে না। কেননা বান্দর খেলা দেখার লোক কৈ ? সব শালাই তো বান্দরের মতো দৌড়োচ্ছে। ঢাকা শহর কখন জিরোয় বলতি পারো? তারপরও এই সংসদ ভবনে দুপুরের পর থেকেই কিছু লোকজন হাওয়া খেতে আসে। তখন অবশ্য চড়া রোদ। সবচেয়ে ভিড় হয় আশেপাশের অঞ্চলে লোডশেডিং হলে। পয়েন্ট টু বি নোটেড, কিছু শখের ডাকে সাড়া দেবার জন্যি মেয়েমানুষদের

আনাগোনা– যদি চোখ থাকে তো দেখতে পাবে। আবার বাজার গরমে, রাজনীতির গরমে আর ঘামের আরামে অতিষ্ঠ যারা, তারাও আসে তাতানো মেজাজ ঠাণ্ডার আশায়। মানুষগুলো তখন ছায়া ছায়া। সেই ছায়া মানুষগুলো তখন কী করতো যদি না নজরুল ইসলামের মত শখ-প্রশমনকারী না থাকতো? কেউ কেউ গায়ের জামাটা আধখোলা করে শরীরটা ঠাণ্ডা করার অছিলায় ঠ্যাং ছড়িয়ে কংক্রিটের মেঝেতে বসে। কেউ-বা ঘাসে বসে ঘাসের বারোটা বাজায়। (এই ঘাস লাগানোর টেন্ডার কেমন করে হয়, তা কি তারা জানে?) কিন্তু সিঁড়িতে কেউ বসে না। বসতে গেলেই আনছার ভাইয়েরা সিটি বাজায়। সিকিউরিটি রিজন বলে এখানে সর্বসাধারণের বসা নিষেধ। তা বাবা নজরুল ইসলাম তো সর্বঅসাধারণ। তাকে বসতি দিতি চাও না। তোমরা আসোলি নজরুল ইসলামের মর্ম বুঝতি পাইরল্যে না। এই দ্যাকো আমার টাইগার কী কী দেখাতি পারে।

হা, তা দেখাও তো বাপধন সাদ্দামের সৈন্ন কী করি বুশের পেলেন ধংশো কইরলো ?

সাব্বাস, তা পুঁইশাকের ডাটা নিয়ি নাতিজামাই বাড়ি যাতি হবি সাইকেল চড়ি, দেখাও তো বাপা।

ও বাপ সাইকেলে আমাকেও নিতি হবি। ...ওমা রাগ হইয়েছে সাইকেলে সে নেবে না কাউকে, একা যাবি। বলতেই বান্দর শালা লাঠিটাকে নিজের পেটের তলে সোজা করে নিয়ে পা দিয়ে প্যাডেল মারার ভঙ্গী করে।

তারপর সাইকেলে চড়ি মাঝরাস্তায় একসিডেন হয়ি পড়ি গেলা তুমি। এম্বুলেন্সে খপর দিতি হবি নানে? বান্দর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এম্বুলেন্সে খবর দেয়।

হা, ছিরিকিরিশনো কী করি ননী চুরি কইরলো দেখাও তো বাপ। হইয়েচে।

এবার দেকপেন আট তারিখে জনগণের শোতরু এরশাদ সিকদার কী কইরে ফাঁসিতে ঝুইলচে। বলে বান্দরের গলায় বাঁধা দড়ি ধরে নজরুল ইসলাম হ্যাঁচকা টানে উপর দিকে টেনে তোলে। যেনো এমন করেই সে একদিন এই কুজাতটাকে একদম শেষ খেলা দেখিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু বান্দর চালাক আছে। বড়শির মতো আঙুলগুলো দিয়ে ঝট করে সে ঝুলন্ত দড়িটা দুহাতে ধরে ফেলে। পাবলিক হই হই করে ওঠে। ওই মিয়া, মইরা যাইবো তো বান্দরে। শালা কসাই। ওই মাদারচোদ তোর মায়েরে বাপ। এরশাদ সিকদাররে লইয়া

কী কইতাচোস। চারদিকে যে আরো কতো খুনী আছে দেহস না ? দেন ভাই, যে যা পারেন দেন– এই ব্যাটা খেলা দেখাইয়া রোজগার করে ভাই, চুরি-চামারিতো করে না। দেখছেন তো ভাই সাইজ। বান্দরের লাহান। ও এইটা না করলে কে দেখাইবো বান্দরের খেলা। জনৈক প্রশ্ন করে- তুমি কি মিয়া শুদু এই সংসদ ভবন চত্বরেই বান্দর খেলা দেখাও। হ। জায়গা একটা বাইছা লইছো ঠিকই। এইখানেই জমে ভালো। আরো একদিন দেখছি তোমারে, নাচন কোন্দন চালাইতাছো... কিন্তু তোমার চাইতে অনেক ভালো নাচন কোন্দন জানে যারা ভিতরে থাকে- বলে আলগোছে বিখ্যাত বিল্ডিংটাকেই সই করে কিনা আবছা আলোয় তা ঠাহর হয় না। কিন্তু অপ্রয়োজনীয়, অযাচিত, অপরিপক্ক কথার ভেতরেই তারা উদয় হয়। জনতিনেক সংসদ পুলিশ।

এরা চত্বরের নিরাপত্তা ও সিকিউরিটি কনসার্ন। পদাধিকার বলে সংসদের দেহরক্ষী কাম গার্জেন। এসেই তারা প্রথম সবক দেয়। ওই মাদারচোদ, কতো ইনকাম করলি আইজ হাউয়ার নাতি? নজরুল ইসলাম এই ভয়টাই করছিলো।

এদের হাতে পড়লি আর ইনকাম নে বাড়িতে যাতি হবি না নে। (অবশ্য বাড়ি থাকলি তো)। সে ফিকির চিন্তা করে। ভং ধরে তিনটাকা এগিয়ে দেয় ওদের দিকে। রিএ্যাকশন হয় মারাত্মক। তারা কোনো সুযোগ না দিয়ে নজরুল ইসলামের হাতের বান্দর-পেটানো লাঠিটা কেড়ে নিয়ে বান্দরের সাইজে ঠায়-ঠাস গোটাকয় বারি বসিয়ে দেয়। নজরুল ইসলাম ইরিব্বাপ করে এমন একটা লাফ দেয় যেন সে কোনোরকম জেটফুয়েল ছাড়াই আকাশে উড়ে যাবে। চোখের নিমেষে লম্বা কালশিটে পড়ে যায় পিঠে। যা ঢাকা থাকে ঢাকা শহরের অসংখ্য অসফলতার মতো কংক্রিট-কফিনে। নজরুল ইসলামের এখন শীত লাগছে। আরে, অসময়ে মাঘ মাস ফলে উঠল নাকি? হাই বাপ কী হইলো? কী করিচি আমি ছার ?

- বান্দর নিয়া পার্লামেন্টে ঢোকা নিষেধ। তার উপরে রাইতের বেলা, হারামজাদা, তোর আইজকা খবর আছে। বাইর কর তোর হোলডে ইনকাম। বড় ছার আইজ এমনিতেই খেইপা আছে। এমপি হোস্টেলের পিছনের জানলা দিয়া নৌকায় এক মক্ষিরানী পার হইতে গিয়া পানিতে পইড়া গেছে। আইজ তোর বারোটা বাজবো হাউয়ার নাতি।

আরে কী মুশকিল, এইসবের মধ্যে নজরুল ইসলাম কেমনে ঢুইকা গেলো। সে তো বান্দর নিয়া ঘোরেঃ মাগীর দালালিতো করে না। কিন্তু তাতে কী, জোরপূর্বক হলেও তাকে এই ঘটনার মধ্যে ঢোকানো হবে। এবং ঢোকানোর পর কাহিনীর কী দশা হয় তা আপনারা দেখতে পাবেন। আগামীকালের পত্রিকাগুলোতে একবার চোখ বুলালে কিংবা

লেটনাইটের ক্যাবল টিভিতেই দেখতে পাবেন সোম্বাদিক ভায়েরা যে নিউজ এনালাইচিচ করে কিংবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কোনো টকমিষ্টিশোর টপিক হিসেবে এক বান্দর-কাহিনী ঢুকে পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়।

কিন্তু তাই বলে আপনাদের এহেন লোডশেডিংয়ের ভেতরে অকার্যকর সংসদীয় চত্বরে বেমালুম ফেলে রেখে আমি ডুগ্গি দিতে পারি না। কাহিনীকে তো অন্তত একটা সম্পৃক্ততার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। তো গেহেরী বাত ইয়ে হ্যায় কি, নজরুল ইসলামকে ওইভাবে আগাপাশতলা মার খেতে দেখে সতের বছরের সহচর বান্দর আচমকা লাফিয়ে পড়ে সিকিউরিটি স্টাফদের কাঁধের ওপর উপর্যুপরি হিসি করতে থাকে!

বাপরে বাপ, বাঁদরের মুত বলে কথা। কতদিন এর গন্ধ বয়ে বেড়াতে হবে বলা মুশকিল।

রচনাকাল: ৬/১০/২০০৫

অ মি তা ভ   পা ল

....

বৃষ্টি

একটা মধ্যবিত্ত বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে। আর লোকটাও নিজের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে– একটা রিক্সা তার চাই। কিন্তু রিক্সা কোথাও নেই। রিক্সার জন্য খ্যাত এই শহর থেকে সব রিক্সা যেন উধাও হয়ে গেছে। অথবা যেন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তারা নেতিয়ে পড়েছে– গলে মিশে গেছে রাস্তায়– এখন আর উঠতে পারছে না। কোনোদিন যদি আর রোদ না ওঠে তাহলে হয়তো এই শহরটা রিক্সাশূন্য হয়ে যাবে। তখন সবাইকে হাঁটতে হবে কেননা এই শহরের গলির মতো রাস্তাগুলোর একটা বাসকে জায়গা দিতে কষ্ট হয়। আর নিজের গাড়িতো সবার থাকে না।

অবশ্য বারান্দায় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা এই লোকটার নিজের গাড়ি আছে। কিন্তু সেটা এখন ওয়ার্কসপে। আর সেইজন্যই এই সাদাসিধা বৃষ্টিটা তাকে আটকে রাখতে পেরেছে। এরা সব কারখানার নোংরা শ্রমিকদের দল যেন– এই বৃষ্টিগুলো– যেন তারা আজ তাদের মালিককে বাগে পেয়েছে। শুরু করেছে অবস্থান ধর্মঘট। কিন্তু এই বোকার দল জানে না একটা দলছুট রিক্সা এলেই তাদের সব অসহযোগ ম্লান হয়ে যাবে। পৃথিবীর সব আন্দোলন এভাবেই দলছুটদের সহযোগিতায় ভেস্তে গেছে।
তাহলেও– লোকটার এইসব বীরত্বমূলক মনোভাবের পরেও অনেকক্ষণ ধরে গলিটাতে কোনো রিক্সা ঢুকছে না। এর ফলে বৃষ্টিকে একটা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। এদিকে বৃষ্টিতে ভেজাও ঠিক সহ্য হয় না লোকটার। কেমন যেন চুপসে যায়। তখন শরীরের আসল আয়তন বেরিয়ে আসে। নিজের ঠিক এই ধরনের প্রকাশ তার অভিপ্রেত না। কেননা এইসব সময়ে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছু ঝলসে উঠতে পারে অথচ শরীরের ওপর ঝুলিয়ে দেয়া একটা সার্টই পারে ওপরে ওপরে পৃথিবীর সব শরীরকে সাম্যবাদী করে দিতে। বৃষ্টির যেন তার এই জামাটাকে সহ্য হয় না। এই বিশ্রী ফোঁটাগুলো যেন বিপ্লবী হয়ে বাহবা নিতে চায়।

কিন্তু একটা রিক্সাওতো ঢুকলো না গলির মধ্যে। তাহলে কি লোকটা অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে তার বারান্দায়? যেখানে সে যেতে চাইছিল– সেখানে যাবে না? অথবা ঢুকে পড়বে নিজের ঘরে?

ফিরে যাবার এইরকম ভাবনা মাথায় এলেই লোকটা ছটফট করে ওঠে। তখন যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে লোকটা অস্থির হয়ে পড়েছে। এসময় তাকে রেগে উঠতে দেখা যায়– দেখা যায় এমন একটা কিছু করে ফেলতে যা হয়তো সাধারণ অবস্থায় সে করত না। এই যেমন এখন রিক্সার দেরি দেখে সে ছাতি নিয়ে নেমে পড়তে চাইছে রাস্তায় অথচ বৃষ্টিতে ভিজতে সে ভালোবাসে না।

কেউ হয়তো বলবে ছাতিতো ভিজে যাওয়ার হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে জুতার বিষয়ে কিংবা প্যান্টের নীচের অংশ নিয়ে– তাহলে ছাতিটার একটা চালাঘরের অসংখ্য ছিদ্রওয়ালা চাল হতে কতক্ষণ?

না– লোকটার মাথায় এখন এইসব নেই। এখন সে একটা ক্ষুধার্ত সামন্তবাদীর মতো পায়চারী করছে আর বারান্দাটা যেন পিষে যাচ্ছে তার পায়ের নীচে। এইভাবে সে বৃষ্টিটাকেও পিষে ফেলতে চায়– চায় রোদ ওঠাতে। গলে নেতিয়ে পড়া কমজোর রিক্সাগুলোকে আবার উঠিয়ে আনতে চায় তাদের চাকার জগতে।

****

একটা মধ্যবিত্ত বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ+অনেকক্ষণ ধরে। আর লোকটাও নিজের বাসার বারান্দায় অপেক্ষা করছে। একটা রিক্সা তার চাই। কিন্তু কোথাও কোনো রিক্সা নেই।

এখন তার ইচ্ছা করছে রিক্সাওয়ালাদের গলা টিপে ধরতে। অথবা গ্যারেজের সেই মিস্ত্রিটাকে– এই বেইমানগুলোর জন্যই ওই তথাকথিত বিপ্লবীরা আশকারা পেয়ে মাথায় ওঠে। কী হত যদি দল ভেঙে তার দিকে চলে আসত এদের কেউ? অথবা বৃষ্টিটাকে যদি মুঠার মধ্যে ধরা যেত– তাহলে হয়তো আকাশ থেকে ছিঁড়ে এনে ঢুকিয়ে দেয়া যেত ড্রেনের মধ্যে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

তাহলে কি লোকটাকে ছাতি নিয়েই রাস্তায় নামতে হবে ওই রাস্তার লোকগুলোর মতো? ভিজতে হবে আগাপাশতলা? জামার ভিতর থেকে গুপ্ত তথ্যের মতো বের করে আনতে হবে শরীরের না দেখানো আকার? অথচ এটা কোনো মেয়েকে হয়তো দেখানো যেত কোনো গভীর মুহূর্তের অনুষঙ্গের মতো।

****

একটা মধ্যবিত্ত বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ+অনেকক্ষণ+অনেকক্ষণ ধরে। আর সেই বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে এমন একটা চুপসে-যাওয়া দাপুটে লোক– যার দিকে কেউ তাকাতেই ভুলে যায়।

হাসান অরিন্দম

পুত্রসন্তান জন্মদানের কৌশল

লোডশেডিঙ কমার কোনো লক্ষণ না দেখে আর একটা চার্জার লাইট কেনার সিদ্ধান্ত আগেই ছিল, তাই বেতনের টাকা হাতে পেয়ে অফিস শেষ করে অনিমেষ দা'র দোকানে যায় মাহের। ভারী মজার লোক এই অনিমেষ দা, তার ওখানে দু'তিন দিন গিয়েই বুঝে ফেলে মাহের– যে- কোনো গল্পই তার মুখে বিশেষ রসসিক্ত হয়ে ওঠে । দোকানটা তার ছোট তবে কয়েকটা ইলেকট্রিক জিনিসের পাইকার সে, হঠাৎ চেহারা দেখে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে হয়। সে নমশূদ্র পরিচয়টা গোপন করে গেলে মাহের তাকে ব্রাহ্মণ-ট্রাম্মনই ভাবত। কথা হচ্ছিল তার ছেলেমেয়ে সম্পর্কে, বড় সন্তান মেয়ে, খুব সামান্য প্রতিবন্ধী– বাম পা কিঞ্চিৎ টেনে হাঁটে, খেয়াল না করলে বা আগে থেকে ধরিয়ে না দিলে কেউ বুঝতে পারবে না। মেয়ের এই খুঁতের ইতিহাসটা অনিমেষ দা নিজেই জানিয়েছিল। 'আপনি কখনও কাছ থেকে মেয়েদের বাচ্চা প্রসব করা দেখেছেন?'

মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়ে তার চেয়ে ১৪-১৫ বছরের বড় একজন ব্যবসায়ীর সাথে এ প্রসঙ্গে কথা এগিয়ে নিতে রুচি সায় দেয় না মাহেরের। তবে লোকটির উদ্দেশ্য যে এর মধ্যে কোনো বাজে বিষয় না-টানা তা খানিকটা সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

'না। তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সে-সময় আমি ক্লিনিকে ছিলাম।'

'কষ্টের ভাই, খুব কষ্টের– সব স্বামীরই উচিত লেবার রুমে বউয়ের সাথে থেকে তার হাতটা ধরে অন্তত কষ্টটা শেয়ারের চেষ্টা করা,এতে সন্তানের প্রতিও ভালোবাসা বাড়ে। দেখেননি স্টার মুভি, ডিসকভারি চ্যানেলে? ওরা কি এমনিই আমদের চে উন্নত?'

আমি তখন শৈলকুপায়; ব্রিজের এপারে কবিরপুরে আপেল-কমলা এই সব ফল বেচি। একদিন বিকেলবেলা হিসেব করা সময়ের ১০-১২ দিন আগেই বউ'র ব্যথা উঠল। ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। হাতে নেই টাকাপয়সা। বড় সমস্যা হলে সামলাব কী করে? হাসপাতালে ডাক্তার নেই, কেবল এক মাঝবয়সী নার্স। সে লেবার রুমে আমাকে কেবল থাকবার অনুমতিই দেয়নি বরং আমার সাহায্যও চেয়েছে। ব্যাপারটার জন্য আমি মনে মনে মহিলাকে ধন্যবাদ দিই। আমার প্রচণ্ড আশঙ্কা হচ্ছিল এবার বোধ হয় ও আর বাঁচবে না। নার্স তাকে চাপ দিতে বললে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করে ভীষণ ঘেমে ওঠে। ঘামে-অশ্রুতে-ব্যথায়-যন্ত্রণায় সে রীতিমতো

উন্মাদ যেন, আমার মনে হচ্ছিল একজন ডাক্তার দরকার। কিন্তু সন্ধ্যে সাতটা, বর্ষাকাল; আমার আহবানে বা আবেদনে সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমবিবিএস এসে এসময় আমাকে উদ্ধার করবে তা ভাবাটাই অসম্ভব। আমিও ভাবিনি বরং নার্সের আন্তরিক চেষ্টাটুকুর জন্যই ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনিমেষ দা'র এসব বক্তব্যের সারমর্ম হল: তার মেয়েটি মূলত কোনোরকম প্রতিবন্ধী নয়, ভূমিষ্ঠ হবার সময় নার্সের অসতর্কতার কারণে ওর বাম উরুতে চাপ লেগেছিল। অনিমেষ যখন প্রথম কোলে নেয় খানিকটা কালচে রক্ত জমাট খেয়াল করে। কদিন পর থেকে হাত-পা ছোড়াছুড়ি শিখলে দেখা গেল বাম পা সে নাড়ায়ই না। অনিমেষ সেদিন থেকেই ব্যাপারটা খেয়াল করে নিজেই ফিজিও থেরাপিস্টের ভূমিকা নেয়, ফলে বড় হতে হতে পা-টা প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছে। ভগবানের ইচ্ছেয় মেয়ের চেহারা খুব ভালো, তা-ও টাকাপয়সা যেহেতু বেশি খরচ করতি পারব না, বিএ-ডা পাশ করলেই একটা চাকরিতি ঢুকয়ে দেব, তারপর পাত্রের অভাব হবে না। আর ওর জন্যি সমাজসেবারতে এট্টা প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেট তুলা আছে, চাকরি কোটায় এমনিই হবে।

ক'দিন পর আবার মাহেরকে যেতে হয় অনিমেষ দার দোকানে। চার্জারটা ১২-১৪ ঘণ্টা চার্জ দিয়েও ২৫-৩০ মিনিটের বেশি জ্বলছে না, রাতে দু'দফা লম্বা লোডশেডিঙে তা কেবল নস্যি। সুসম্পর্কের প্রতি সুবিচার করেই সে বিশেষ সৌজন্য দেখায়– পুরনোটা রেখে নতুন একটা দিয়ে দিতে সম্মত হয়। কথা প্রসঙ্গে সে জিজ্ঞেস করে, এজাজ ভাইকে দেখি না, উনি কি অফিসের কাজে ঢাকায়?
না, ক'দিন আগে কন্যার বাবা হল তো তাই ব্যস্ত আছে।

আমার কথা শুনে আজগুবি কিছু কর্ণগোচর হল এমন একটা ভঙ্গিমা ফুটে উঠল অনিমেষ দা'র চেহারায়। এই যে দেখেন স্যার! আপনারা শিক্ষিত মানুষ, প্রথমেই আপনাদের মেয়ে হয়– এটা কোনো কথা! তার ফর্সা মুখটায় পাণ্ডিল, উঁচু নাক, ভারী কণ্ঠ আর অদ্ভুত বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়। মাহেরের মনে হল এই লোকটির কোনোক্রমেই ইলেকট্রনিক্সের দোকানদার হওয়া ঠিক হয়নি, তাকে বোধ হয় জাত সাংবাদিক, অধ্যাপক, অভিনেতা বা লেখক-টেখক হলে মানাত ভালো। মাহের মনে মনে ভাবে, নামকরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আছে, গোফঅলা ধুরন্ধর তামাটে চেহারার ওই লোকটা বরং এই লোহার চেয়ারটায় বসলে দিব্যি মানিয়ে যেত। বিশ্ববিধান কত কি-ই না দেখাতে পারে। আপনাকে তো বলেইছি সেদিন– আমার প্রথম বাচ্চা মেয়ে, তখন আমার বয়স ২১-২২, জানতাম না অনেক কিছু। এর আড়াই বছর পর আমার বউয়ের পেটে আবার বাচ্চা আসল। আপনার বৌদি বলল, এবারও মেয়ে হবে, কারণ এবারও লক্ষণ আগের বারের মতোই মনে হচ্ছে। আমি হেসে কলাম, না এবার ঠিক ছেলে হবে দেখে নিও, না-হলি আমি পুরুষ মানুষির জাতই না। আপনার বৌদি আমার মুখ চেপে ধরে দাঁতে জিভ কেটে বলল, কী কও অলক্ষুণে কথা, মেয়ে-ছেলে সবই জন্ম দিতি একজন বিটা মানুষ আর একজন মেয়ে মানুষ লাগে। আর সে-সব কি আমাগের

ইচ্ছেই– তিনিই উপর থেকে ঠিক করে রাখেন। আমি কলাম, আচ্ছা ওসব ভাবের কথা থোও আসল কথা আমি এবার ছাওয়ালের বাপ হব। আমি বুঝতে পেরে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা বোধ করি যে অনিমেষ দা এবার সোৎসাহে তার গোপন রহস্যটি ব্যক্ত করা আরম্ভ করবে। অথবা এমনও হতে পারে কোনো একটি শর্ত দিয়ে তবে সে আমাকে কৌশলটা শিখিয়ে দেবে। অনিমেষ দা কথা বলতে বলতে রাস্তার ওপারে গজ বিশেক দূরত্বে চায়ের দোকানদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিছু না বলে কেবল হাত ইশারায় দু'কাপ লাল চায়ের অর্ডার দেয়। তার পাশের কাঠের চেয়ারে বসে মাহের চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দেয়ার পরেই প্যান্টের ডান পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে, স্ক্রিনে লেখা ওঠে 'তুমি', অর্থাৎ মাহেরের স্ত্রী লুবনা। 'কী ব্যাপার আমি অন্ধকারে বসে আছি, একটা ঘণ্টা কারেন্ট নাই আর তুমি দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছ, না?' লুবনার কথা বোধ হয় অনিমেষও শুনে ফেলে, অপরাধীর ভঙ্গিতে বলে, ভাবী, না? আমি কী বেকুফ, আপনাকে অহেতুক দেরি করিয়ে দিলাম। একটা রিক্সা নিয়ে যান তাড়াতাড়ি বাসায়, পরে গল্প করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। চায়ের কাপে অর্ধেক গরম চা রেখে গল্প শেষ না হওয়ার অতৃপ্তি নিয়েও মাহেরকে রিক্সায় চাপতে হয়।

মাহেরের লেট ম্যারেজ, পঁয়ত্রিশ ছুঁয়ে সে বরের পাগড়ি মাথায় দিয়েছিল আট-নয় মাস আগে। সে ঠিক করেছিল বিয়ের পর পরই বাচ্চা নিয়ে নেবে। কিন্তু বউয়ের মত বলেও তো একটা কথা আছে, বিশেষত তাকেই তো দশ-দশটা মাস বাচ্চাটা বয়ে বেড়াতে হবে। তেইশ বছরের লুবনা পাঁচ মাসের মধ্যেই মাহেরের সাথে একমত হয়। একটা শিশুর জন্য তার ভেতরটা নাকি কেমন করতে থাকে। তাই সেদিন থেকেই তারা পৃথিবীতে একটা নতুন মানুষের আগমন-পথ অবারিত করতে কন্ট্রাসেপটিভ নেয়া বাদ দিয়েছে। মাহেরের এখন নানান কথা মনে হয়, কোনো দিন রহস্যের ভঙ্গি করে লুবনা গোলাপি ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে হয়তো জানিয়ে দেবে মাহেরের পিতা হবার সম্ভাবনার খবর। আবার এর বিপরীতও মনে হয় কখনও কখনও। হয়তো এভাবে পার হয়ে গেল দু'তিন বছর, লুবনার কাছ থেকে কোনো সংবাদ আসে না। অপেক্ষা করে করে মাহেরের ভেতর সংশয় জমে ওঠে, লুবনার গালের রক্তিম আভা ক্রমে মিলিয়ে যায়, মেঘ জমে চেহারায়– একদিন হয়তো বলে ফেলে, চলো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, অনেক দিনই তো হয়ে গেল। সমস্যা-টমস্যা থাকলে জেনে আসি। আজকাল কত রকমের টেস্ট আছে, চিকিৎসা আছে, এভাবে ঘরে বসে থাকার কোনো মানে নেই। আর আমি আগেই বলে রাখছি, সমস্যা যদি আমার হয় তাহলে আমি তোমার সংসার জুড়ে বসে থাকব না। এ কথায় মাহের মোটেই খুশি হতে পারে না। তার মানে কি এই নয় যে, সমস্যা যদি মাহেরের হয় তবে লুবনাকে মুক্তি দিতে হবে। কীভাবে তখন কাটবে মাহেরের সময়, অবশিষ্ট জীবন? একটা লম্বা শ্বাস ফেলে পুরোপুরি সম্বিত আসে– কী-সব ভাবছে, আসলে মানুষের চেতনাটাই এরকম– কারণে-অকারণে ভাবতে ভাবতে সে বহুদূর চলে যেতে পারে, প্রায় অনন্ত ছুঁতে চায়। ভাগ্য নিতান্ত বৈরী না হলে

তারা আজ না হয় কাল পিতামাতা হবেই। কিন্তু ছেলে না মেয়ে? এত দিন তো জেনে ও বিশ্বাস করে এসেছে স্রষ্টার ইচ্ছেতেই এসব নির্ধারিত হয়, মানুষের কিছু করণীয় নেই। একেবারে নেই তা নয়, চার মাস পর যখন নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায়, সে-সময় কোনো দম্পতি ভ্রূণ 'নষ্ট' করে তাদের অপছন্দের শিশুর আগমন রুখে দিতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর সে সাধ্য নেই, সৃষ্টির সেরা তো এমনিতেই নয়! এতদিন ইলিশের জাটকা, ডিম রক্ষার জন্য প্রচারণা ছিল, বন্যপশুর প্রতি সদয় হবার বিজ্ঞাপন ছিল– এখন এসেছে মানুষের ডিম–ভ্রূণ রক্ষার প্রচারণা। একাধিক হিন্দি চ্যানেলে মাহের অনেকবার শুনেছে, শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে কন্যা-ভ্রূণ হত্যা রুখবার সেই উক্তি। এক সময় গিয়েছে যখন প্রায় সর্বত্রই মেয়েশিশু ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত, সে-সব ইতিহাস সবারই জানা। ধর্মগ্রন্থেই তো তার সাক্ষ্য রয়েছে– 'তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তান জন্মানোর সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মর্মযন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার লজ্জায় সে মানুষ থেকে মুখ লুকিয়ে ফেরে।' এই যখন পরিস্থিতি তখন মহাপুরুষ মানবজাতিকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দেন, 'যে-কেউ তার কন্যাদের জন্য কষ্ট সহ্য করবে, তার জন্য এই কন্যারা দোজখের ঢালস্বরূপ হবে।' এখন দশ মাস পর্যন্ত পেটে বয়ে বেড়ানো কষ্ট করে জন্ম দেয়, জন্মের পর আর মাটিতে পুঁতে ফেলার ঝামেলা নেই, তার অনেক আগেই ব্যবস্থা হয়ে যায়– বিজ্ঞান এগিয়েছে যে, মানুষ তো আর বসে থাকতে পারে না। অবশ্য তাতে কিছু পয়সা খরচের ব্যাপার আছে আর গর্ভিনীর জীবনের ওপর দিয়েও একটা ঝড় বয়ে যায়।

মাহের সত্যি-সত্যিই দ্বিধায় পড়ে যায়। কী করা উচিত তার? অনিমেষ দা কি আসলেই জানে কিভাবে ছেলেশিশু জন্ম দেয়া যায়? এর পেছনে কোনো যুক্তি বিজ্ঞান বা বাস্তবতা আছে? মাহেরের মতো শিক্ষিত লোকের কি তা বিশ্বাস করা উচিত। এ-সব প্রশ্নের আগের কথা হল সে যে প্রথমে ছেলেই চাইছে তা তো আগে ঠিক করেনি,তা হলে ওসব কৌশল-টৌশলের প্রশ্ন কেন? তবে সুযোগ যদি থাকেই তাহলে নিজেদের পছন্দমতো বাচ্চা নিতে অসুবিধে কোথায়? বিষয়টা নিয়ে কি লুবনার সাথে কথা বলা দরকার? নাকি তাতে ও মাহেরকে ছোটলোক কিংবা নারীবিদ্বেষী বা পুরুষবাদী ভেবে বসবে? আচ্ছা ওর সঙ্গে তো কথা বলাই যায়। কিন্তু মাহের যদি নিজেকে প্রশ্ন করে কিংবা তাকে যদি পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় তবে সে কী চাইবে? পুত্র নাকি কন্যা? প্রশ্নটা সত্যি সত্যি তার জন্য খুব বিব্রতকর, চরমভাবে দ্বিধান্বিত করে ফেলার মতো। মাথার ভেতর বহু রকম প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ, হিসেব-নিকেশ, যুক্তি-প্রতিযুক্তি খেলে যেতে থাকে। প্রথমেই যে বোধটি কাজ করে তা হল মেয়ে হলে বাবা-মাকে ছেড়ে একসময় শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। তাছাড়া সমাজটাও মেয়েদের জন্য যথেষ্ট অনুকূল নয়, মেয়ে বড় করা, স্কুল-কলেজে পাঠানো, বিয়ে দেয়া অনেক ঝক্কি। এসব ভাবনার পাল্টা জবাবগুলোও চেতনার দেয়ালে আছড়ে পড়তে মোটেই বিলম্ব হয় না। ছেলে হলেই যে

ঝুঁকিহীন সুনিশ্চিত ভবিষ্যত তার গ্যারান্টি কী? রাজ্যের যত অনাচার– নেশা, ত্রাস, চাঁদা, অস্ত্রবাজি, ইভ টিজিং, রেপ–সেখানে ছেলেদের ভূমিকাই সব। এসব কাজ যে-সব পুরুষরা করে বেড়াচ্ছে তাদের বহুজন ছিল তাদের পিতামাতার কাঙ্ক্ষিত সন্তান– বহু সাধনার পুত্রসন্তান। ছেলে যদি বেয়াড়া হয়, উচ্ছন্নে যায় তখন বাবা-মার এমনও মনে হয় এরকম সন্তান হওয়ার চেয়ে নিঃসন্তান থাকা ভালো। যুবক হলে পুত্রেরা পিতামাতার কাছ থেকে দূরে সরে নিজের একটা জগৎ গড়ে নেয়, সেক্ষেত্রে মেয়েরা বাবা-মার প্রতি অনেক কেয়ারিং থাকে। মেয়েরা স্বভাবে কোমল বলে নিজেদের ইচ্ছেমতো গড়ে তোলা যায়, ছেলের ক্ষেত্রে তা প্রায়ই হয় না।

মাহের তো বিষয়টা লুবনার সাথে শেয়ার করেই না, বরং নিজের ভেতরের প্রশ্ন আর সংশয়গুলো পরিষ্কার করার পথ খোঁজে। নিরপেক্ষভাবেই তার কাছে মনে হয়, প্রকৃতি যেন পুরুষের প্রতি খানিকটা পক্ষপাতিত্বই করেছে। আজ পর্যন্ত মানবসভ্যতা নারীকে তার যথাযথ মর্যাদা সম্মান ও সুবিধা দিতে শিখল না। শাস্ত্রসমূহে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বপনায় পুরুষকে অমোচনীয় উচ্চতায় এগিয়ে রাখা হয়েছে। প্রকৃতির এই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ বুঝতে উভয়ের শারীরিক কাঠামো পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট, পেশিশক্তি এবং যৌন কর্মকাণ্ডে সাড়া দেয়ার ধরনের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট। অবশ্য হয়তো বিশ্বচরাচরে শৃঙ্খলার প্রয়োজনেও এই পরিকল্পনা হয়ে থাকতে পারে। অত বুঝতে চাইলে ঘরবাড়ি ছেড়ে যোগী-সাধক হয়ে যেতে হবে, কিংবা চাকরি-সংসার ত্যাগ করে গবেষণায় নামতে হবে, সে সব মাহেরের কম্ম নয়। তবু সে কৌতূহলকে কবর দিতে পারে না। হাতের কাছে যে-সব বইপত্র পায় কিংবা সে-রকম দুই-একজনের সাথে কথা বলার সুযোগ থাকে তবে মাহের তার ভাবনাগুলোকে একটু নাচিয়ে নিতে চায়। জানা কথাগুলো তাতে নতুন করে জানা হয়, শোনাগুলো নিশ্চিত হওয়া যায় এছাড়া নতুন এবং বিস্ময়কর অনেককিছু জানা যায়। যেমন খ্রিস্টীয় ধর্মগুরু ক্রাইসোসটাম নারী সম্পর্কে জানিয়েছেন, একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত কুপ্ররোচনা, একটি আনন্দদায়ক বিপদ, একটি পারিবারিক আশঙ্কা, একটি ধবংসাত্মক প্রেমদায়িনী এবং একটি সজ্জিত দুর্ঘটনা। পুত্রসন্তান না হয়ে বার বার মেয়েসন্তান হলে একাদশ বছর পর তাকে পরিত্যাগ করার বিধান আছে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ সতীর্থ প্রকাশে। সভ্যতাপূর্ব যুগে নারীকে ঠিক পুরোপুরি মানুষ নয় মানুষ আর পশুর মাঝামাঝি কিছু ভাবা হত। সে-সময় নারীর প্রতি পুরুষের যে কত বিচিত্র আচরণ ছিল তার একটি এরকম: কিছু যুবতী নারীর আবাসস্থলের ফটকে ঝাণ্ডা টাঙিয়ে চিহ্নিত করা থাকত। তাদের সাথে যেকোনো পুরুষ যৌনকর্ম করতে পারত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সঙ্গমকারীরা এসে জমা হত। অতপর গণক এসে নির্ধারণ করে দিত এদের মধ্যে কার ঔরসে ওই শিশুর জন্ম। সেই মোতাবেক সদ্যোজাত শিশুর পিতৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করা হত। সেই মেয়েরা আজ কোথায় নেই– বাইসাইকেল থেকে শুরু করে ট্রেন উড়োজাহাজ ছুটাচ্ছে, রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিচালনা করছে; কিন্তু সব হিসেব করে

অর্থাৎ সামগ্রিক মানমর্যাদা নিরাপত্তা অধিকার ক্ষমতা বিবেচনায় তারা আজও পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে বি-ক্যাটাগরিরই রয়ে গিয়েছে। যৌতুক ধর্ষণ তালাক বহুগামিতা গর্ভধারণ গর্ভপাত এসিডসন্ত্রাস টিজিং অপহরণ পাচার অজস্র সামাজিক-ধর্মীয় বিধিনিষেধ ইত্যাদি কোনোটি হিংস্র পশুর মতো কোনোটি জোঁকের কোনোটি সাপের কোনোটি ধারাল অস্ত্রের কোনোটি বোমার মতো যেন তাদেরকে প্রতিনিয়ত রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে, তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং পৃথিবীর অধিকাংশ সন্তানপ্রত্যাশী দম্পতি পুত্রসন্তানের পক্ষেই তাদের স্বপ্ন লালন করে।

ছাত্রজীবনের শেষের দিকে কমলাপুর স্টেশন থেকে একটা কবিরাজী তাবিজ-কবজের বই কিনেছিল মাহের। বহুদিন পর পুরনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেই বইয়ের সূচিপত্রে চোখ আটকে যায়– মিলে যায় পুত্রসন্তান লাভের তদবির, এটা অবশ্য বাতেনি ব্যাপার । ওই বইয়েরই অন্যত্র একটি জাহেরি কৌশল বলা আছে এভাবে: রমণী ঋতু হইতে পবিত্র হইলে পর, প্রথম রাত্রে কিংবা দ্বিতীয় রজনীতে নারীগমন করিলে যদি বীর্য নারীর কমল মধ্যে স্থায়ী থাকে, তবে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এই পাঁচ দিনের মধ্যে স্ত্রী সহবাসে নিযুক্ত হইলে যদি বীর্য নারীর কমলে স্থায়ী হয়, তবে কন্যা জন্মাইবে। অষ্টম, কি নবম, কি দশম, কি একাদশ রজনীতে নারী-সম্মিলন করিলে ঐ ঔরসে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে রমণী তিন দিবারাত্রি রজঃস্বলা থাকিয়া স্নান করিয়া পবিত্র হইলে চতুর্থ দিনে স্ত্রী সহবাসে এ ঔরসে সন্তান জন্মিলে সেই পুত্র ধার্মিক হয়। পঞ্চম দিবসে নারীগমন করিলে তাহার ঔরসে কুলটা কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আরও একজনের কথা মনে পড়ে যায় মাহেরের। একজন প্রায়অশিক্ষিত নামাজী বৃদ্ধ নাইটগার্ডের সাথে কোনো এক কারণে মাহেরের বেশ সখ্য গড়ে উঠেছিল। লোকটা রাতে কাজ করত বলেই অনেক অদেখা সে দেখত, অনেক অজানা জানত। আহমদ আলী নামক ওই লোকটার সাথে কথা বলে মাহেরের নতুন করে মনে হয় আমরা মানুষের ডিগ্রি পেশা সামাজিক অবস্থানের নিরিখে যেভাবে তাদের জ্ঞানের পরিমাপকে সরলীকৃত করে ফেলেছি ব্যাপার মোটেই অতটা সমানুপাতিক নয়। দুদিন বাক্যালাপ করে মনে মনে মাহের মেনে নেয় আহমদ আলী জগত-জীবনের এমন অনেককিছু ভাবে বা জানে যেখানে মাহেরের চেতনা কখনও আলো ফেলতে পারেনি। আহমদ আলী কথাপ্রসঙ্গে বলছিল জীবন তো বাতাস ছাড়া আর কিছু নয়, আপনার নাকমুখ চেপে ধরে বাতাস বন্ধ করে দিলে আপনি শেষ। সেই কথার সূত্রে সে জানিয়েছিল মানুষের নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে সবসময় সমান বাতাস বের হয় না। মাসের কিছু সময় ডান কিছু সময় বাম ছিদ্রে বাতাসের চাপ বেশি থাকে। নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় নাকের সামনে হাত রেখে তা পরীক্ষা করা যায়। এই হ্রাসবৃদ্ধি চক্রাকারে নারীপুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে চলতে থাকে। আহমদ আলী একটা জটিল সমীকরণ দেয় কিভাবে কোন সময় পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীর যখন বাম নাকে অধিক চাপ

স্বামীর ডানে, সে-সময় মিলিত হলে ... স্বামীর যখন ডান নাকে, স্ত্রীরও ডানে তাতে জন্ম নেয়... ইত্যাদি। সেসময় আহমদ আলীর সাথে কথা হচ্ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে, তাছাড়া মাহের হয়তো ব্যাপারটাকে অত গুরুত্বও দেয়নি, নাহলে মাহের কথাগুলো ডায়েরিতে নোট করে রাখত। মজার ব্যাপার হল আহমদ আলীর মোট চার সন্তানের প্রথম তিনটিই পুত্র। মেজ ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, বড়টা ফরিদপুরের ভাঙায় বিয়ে করে ঘরজামাই থাকে আর ছোটটা আজন্ম বোবাকালা। তাই ৬২-৬৩ বছর বয়সেও নিজের খাবার নিজেকে জোটাতে হয় আহমদ আলীর। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হাটগোপালপুর, জামাই গ্রাম-ডাক্তার। আয় উপার্জন খুব ভালো, মাছগোশ ছাড়া ভাত খায় না। মেয়ে বলে, আব্বা তুমি ওসব বাদ দিয়ে আমার কাছে এসে থাকলিই তো পার। তা যায়নি, দুই কারণেঃওদের মা বছর আষ্টেক আগে মরে যাওয়ার পর আমি আবার বিয়ে করিচি, আর জামাইবাড়ি য্যায়ে বসে বসে খালি মানসি কবে কী! তিনচার বছর আগে আহমদ আলীর মুখে শোনা গল্প তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার সাথে মাহের তার বর্তমান ভাবনাগুলোকে মিলিয়ে নেয়। আহমদ আলী কি নিজের জ্ঞাত কৌশল অনুযায়ীই প্রথম তিনটি পুত্রসন্তান গ্রহণ করেছিল? নাকি নিতান্তই কো-ইন্সিডেন্ট? সেসব পুত্র যেভাবেই হয়ে থাক আহমদ আলীর বর্তমান অবস্থা কি তার প্রত্যাশিত ছিল ? ছেলেরা তো কেউ তার পাশে নেই বা থাকতে পারেনি। মেরির জন্মের পর তার মাতা খুশি হতে পারেননি। কারণ তিনি দীর্ঘদিন পুত্রসন্তানের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার পর তিনি ঈশ্বরকে তার অনুযোগ জানালেন। এর জবাব এল 'সে যা প্রসব করেছে, আলাহ তা সম্যক অবগত। পুত্র ওই কন্যার সমতুল্য হতে পারত না।' এই মেরিই যিশুমাতা– ট্রিনির অন্যতম।

বৃহস্পতিবার রাতটা ঘুমাতে দেরিই হয়–দুটো-তিনটে বাজে। সে-রাতে মাহের আর লুবনা আর্ট ফিল্ম ধরনের একটা হিন্দি সিনেমা দেখে রাত দুটোর দিকে বিছানায় গেল। মাহেরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে লুবনা বলল, আমাদের তো এভাবেই চলছে ৪-৫ মাস, কই কোনো খবর তো হচ্ছে না।

হবে, সময় দিতে হবে না?

সময় আবার লাগে নাকি, অনেকের তো প্রথম বারেই হয়ে যায়।

আচ্ছা এগুলো কি সব আমাদের হাতে? জবাবটা দিতে দিতে মাহেরের সেই আশঙ্কার কথাটা মনে আসে। তাদের কারো কোনো সমস্যা নেই তো। বিশেষত তার নিজের? তাহলে কি লুবনা তাকে ছেড়ে চলে যাবে? আর মাহের ভালো করেই জানে লুবনাকে সে যেভাবে ভালোবেসেছে দ্বিতীয় কোনো নারীর কথা অন্তত ইহজনমে সে ভাবতে পারবে না, তাতে তাদের সন্তান হোক বা না হোক। সে অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলে, 'তুমি কী চাও, ছেলে না মেয়ে?'

লুবনা বলে, 'তুমি আগে বল'।

মাহের তো গত কয়েকদিন ধরেই এর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখনও সমাধান পায় নি। তবু বলে ফেলে, 'মেয়ে'; লুবনার মতামত যাচাইয়ের জন্য কিছু তো একটা বলতেই হবে।

'আমি প্রথমে চাই ছেলে' লুবনার স্পষ্ট উত্তর। তুমি তো জানো আমরা পর পর চারটে বোন, শেষে যে ভাইটা হল সে স্কুল পাশ না করতেই আব্বা মারা গেলেন। আমরা জানি, সংসারে একজন পুরুষ মানুষের কত দরকার।

এক পরিবারের সাথে আরেকটা মেলানো ঠিক নয়। তাছাড়া পৃথিবীতে সবাই ছেলে চাইলে বিশ্ব তো এক সময় নারীশূন্য হয়ে যাবে, তোমার ছেলে হলে বিয়ে দিতে মেয়ে পাবে না, কিংবা পাওয়া গেলেও বহু অর্থ ব্যয় করলে তবেই মিলবে। হয়তো সব পুরুষ বিয়ের জন্য মেয়ে পাবে না। এসব কথা যুক্তির খাতিরে মাহের বলছিল বটে। কিন্তু সে নিজেই কি নিশ্চিত প্রথম সন্তান মেয়ে চায় সে, মোটেই না। জগতে সব কিছুই তো হিসেব নিকেশের ব্যাপার। বুঝে শুনে এই পৃথিবীতে কে চাইবে একজন প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা বা মাতা হতে? সে সন্তান হিসেবে সেরাটাই প্রত্যাশা করে। পৃথিবীতে যে সারভাইব করবে সহজে, যে শক্তিমান, মূল্যবান, শ্রেষ্ঠ, যে নিরাপদ–সহজে আক্রান্ত হয় না, আক্রমণ করতে জানে তাকেই তো চাইবে সকলে। গড় হিসেবে সেই প্রজাতি নারী নয়, পুরুষ। তাই পুত্র চায় এ সমাজ, হয়তো মাহেরও। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ দা'র বিষয়টা মাহের আর চেপে রাখতে পারে না। লুবনা বলে, তাহলে তুমি যাও আর একবার, শুনে এসো আসলে বিষয়টা কী। প্রথম বাচ্চা ছেলেই ভালো, মেয়ের মা আগে আগে বুড়ি হয়ে যায়। মেয়ে একটা বিয়ে হল তো সবাই তাকে ঠেলে দেবে মুরুব্বির কাতারে। ছেলেকে তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশেও বিয়ে করানো যায়।

মাহের জানে এবং বিশ্বাস করে এখনও পর্যন্ত পুত্র বা কন্যা সন্তান নির্ধারণের ক্ষমতা মানুষের হয়নি, কিংবা কখনোই হবে না। তা যদি হত তাহলে মানুষ অধিক হারে পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে বিশ্বকে ভারসাম্যহীন ও বসবাসের অযোগ্য করে ফেলত। এ কারণেই প্রকৃতি কিংবা ঈশ্বর মানুষের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেয়নি, অনেক ক্ষেত্রেই তারা অসহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মানুষ মুখ্যত স্বার্থপর বলেই নিজের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে পারে, অথচ পরিণামে সে আসলে অসুবিধা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেই পড়ে যায়। এ প্রকৃতিরই প্রতিশোধ।

সে রাতে মাহের ঘুম কিংবা চেতন-অবচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায় বছর দুয়েকের একটি শিশুর ডাক শুনল, 'বাবা–বাবা– ও বাবা!' সন্দেহ নেই শিশুটি তারই। এর মাসখানেক পরেই সত্যি সত্যি খানিকটা নাটক করে লুবনা জানিয়ে দিল মাহের বাবা হচ্ছে। তার পর থেকেই মাহের খুব করে মনে করবার চেষ্টা করতে থাকে যে শিশুটি স্বপ্নে তাকে বাবা ডেকেছিল সে কি মেয়ে নাকি ছেলে ছিল।

বদলে আনা চার্জারটি কোনোক্রমেই আগেরটির চেয়ে বেশিক্ষণ জ্বলছে না। তবু আর অনিমেষ দা'র কাছে যাওয়া হয় না। একটা জিনিস নিয়ে ক'বার যাওয়া যায়– মাহেরের সংকোচ লাগে। খুব শিঘ্রি লোডশেডিঙ কমার সম্ভাবনা নেই। বিকল্প একটি পারমানেন্ট আলোর ব্যবস্থা করার জন্য লুবনা চাপ দিতে থাকে– ঘরে নতুন অতিথি আসছে।

প্রকাশিত গল্পের আলোচনা

....

শা ন্ত নু কা য় সা র

[গল্পকারদের নাম গোপন রেখে 'অসম্পৃক্ত', 'বৃষ্টি' ও 'পুত্রসন্তান জন্মদানের কৌশল' গল্প তিনটি আলোচনার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক, সমালোচক শান্তনু কায়সারকে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে গল্প তিনটি আগাগোড়া পাঠ করে তিনি নিচের আলোচনাটি লিখে দিয়েছেন 'গোলাঘর'-এ ছাপার জন্য। শ্রমলব্ধ কাজটি করে দেয়ার জন্য আলোচককে জানাই ধন্যবাদ। আশা করা যায়, এই আলোচনা অন্তত গল্পকার-ব্যক্তির প্রভাব-নিরপেক্ষ হয়েছে। গল্প তিনটি এবং এর ওপর আলোচনাটি কেমন হয়েছে, সেই বিচারের ভার অবশ্য বর্তায় শেষপর্যন্ত পাঠকদের ওপর।]

অসম্পৃক্ত

'অসম্পৃক্ত' গল্পটি উত্তমপুরুষে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বাঁদর নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ান। তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য সে বেঁটে। অর্থাৎ সে বামন, 'বান্দরের লাহান' তার 'সাইজ'। কিন্তু তার বাতচিত বড়উ লম্বা। নাম তার নজরুল। সে কবি নজরুলই হয়ে উঠতে

চায়, কবির মত ঝাকড়া বা বাবরি চুলও সে রেখেছে। সে 'একটি নতুন বিদ্রোহী' কবিতা লিখতে ও নজরুলের মত 'অসাধারণ' হতে চায়।

কিন্তু একজন বাঁদরের খেলা দেখানো লোকের পক্ষে আর কতোদূর যাওয়া সম্ভব? তার খেলা দেখানোর জায়গা সংসদ ভবনের চত্বর ও তার আশপাশের এলাকা। 'সংসদ পুলিশ'র সূত্রে তার কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। 'এদের হাতে পড়লি আর ইনকাম নে বাড়িতে যাতি হবে না নে।' 'বড় ছার আইজ এমনিতেই খেইপা আছে। এম পি হোস্টেলের জানলা দিয়া নৌকায় এক মক্ষরাণী পাড় হইতে গিয়া পানিতে পইড়া গেছে।' 'মাগীর দালালি না করলেও জোরপূর্বক.. তাকে এই ঘটনার মধ্যে ঢোকানো হবে।' পরের দিন সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিক মাধ্যম খবরটা খাবে। 'ভাগ্য প্রসন্ন হলে কোন টকমিষ্টি টপিক হিসেবে এক বান্দর-কাহিনী ঢুকে পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়।'

এই গল্পে 'অকার্যকর সংসদ'র কথাও রয়েছে। গল্পটি শেষ হয় সিকিউরিটি স্টাফদের কাঁধের ওপর বাঁদরের 'উপর্যুপরি' হিসি করার মধ্য দিয়ে। তাতে হয়ত আমাদের নানা অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ করার একটা বার্তা পাওয়া যায়, 'কতদিন এর গন্ধ বয়ে বেড়াতে হবে বলা মুশকিল।'

গল্পটি কি তবে আমাদের চর্চিত অথবা বাস্তব অথবা অকার্যকর কিন্তু চলমান গণতন্ত্রের সমালোচনা? বিষয়ের দিক থেকে গল্পটিতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ রয়েছে নিঃসন্দেহে।

তা না হয় হলো। কিন্তু ঐরকম ব্যক্তির পক্ষে কী করে 'স্বোপার্জিত' 'অপ্রচলিত' 'পয়েন্ট টু বি নোটেড' জাতীয় শব্দ বা শব্দবন্ধ ব্যবহার করা সম্ভব? দার্শনিকতা তার থাকতেই পারে, কিন্তু তার পক্ষে 'দার্শনিকতা' উচ্চারণ কতোটা স্বাভাবিক?

সবটা মিলিয়ে গল্পটা বুঝি তাই হতে গিয়েও শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

বৃষ্টি

গল্পের শুরুটাই চমক সৃষ্টির মতো। কী? না, 'একটা মধ্যবিত্ত বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে।' গল্পের দ্বিতীয় মধ্যাংশে এবং শেষ অনুচ্ছেদে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'অনেকক্ষণ ....অনেকক্ষণ ধরে।' এতে কি আটকে থাকা বোঝায়? গল্পের শেষাংশটি এরকম 'আর সেই বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে এমন একটা চুপসে যাওয়া দাপুটে লোক– যার দিকে কেউ তাকাতেই ভুলে যায়।' হঠাৎ কোনো ঘটনায়, ধরা যাক বৃষ্টি, দাপুটে লোকের চুপসে যাওয়ার নামই কি মধ্যবিত্ত উত্তেজনা,আত্মশ্লাঘা থেকে তারা যাকে বলে বিপ্লব, তার দফারফা ঘটে? গল্পকারের ইঙ্গিত কি সেদিকে?

হয়তো, 'আগাপাশতলা ভেজা' মানে কি খোলনলচে বদলে ফেলা? গল্পটিকে শুরু থেকে অনুসরণ করা যাক। 'এই শহরের গলির মতো রাস্তাগুলির একটা বাসকে জায়গা দিতে কষ্ট হয়।' 'শ্রমিকদের দল যেন– এই বৃষ্টিগুলো– যেন তারা আজ তাদের মালিককে বাগে পেয়েছে।' 'তাহলে ছাতিটার একটা চালাঘরের অসংখ্য ছিদ্রওয়ালা চাল

হতে কতক্ষণ?' 'এখন সে একটা ক্ষুধার্ত সামন্তবাদীর মতো পায়চারী করছে...' 'এখন তার ইচ্ছা করছে , রিক্সাওয়ালাদের গলা টিপে ধরতে । অথবা গ্যারেজের সেই

মিস্ত্রিটাকে– এই বেইমানগুলোর জন্যই এই তথাকথিত বিপ্লবীরা আশকারা পেয়ে মাথায় ওঠে ।'

বলাই বাহুল্য, গল্পটি ইঙ্গিতধর্মী । কিন্তু তার আরও বিস্তার প্রয়োজন ছিল । সেটা না হওয়ায় কাঠামোটা ক্ষতিগ্রস্ত ও তার শ্রীর হানি ঘটেছে ।

পুত্রসন্তান জন্মদানের কৌশল

'পুত্রসন্তান জন্মদানের কৌশল'কে নারীবাদী গল্প বলা যায় । যে অনিমেষ দা'র মুখে গল্পমাত্র 'রসসিক্ত হয়ে ওঠে' তার কাছে সন্তান প্রসবের ঘটনাটি কিন্তু খুবই গুরুতর । লোকটি 'নমশূদ্র' কিন্তু না বললে তাকে ব্রাহ্মণই মনে হতো । মাহেরের বিবেচনায় 'তার ইলেকট্রনিক্সের দোকানদার হওয়া ঠিক হয়নি, সাংবাদিক, অধ্যাপক, অভিনেতা বা লেখক-টেখক হলে মানাত ভালো ।' তবে কি এ ধরনের মানুষেরা ছদ্মবেশী নমশূদ্র? অথবা নমশূদ্ররা ব্রাহ্মণ হওয়ার ভান করে? অথবা উল্টোটা?

মেয়ে ভ্রূণ যে অনাকাঙ্ক্ষিত তা এক বাস্তব সত্য । ধর্ম বা অন্যান্য কারণে মানুষ তা মেনেও নেয় । ওদিকে অনিমেষ দা বলে, কী করে পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে হয় । কিন্তু 'মাহেরের মতো শিক্ষিত লোকের কি তা বিশ্বাস করা উচিত ।' সে যে ছেলেই চাইছে তা আগে থেকে ঠিক না করলেও বোঝা যাচ্ছে, সে-ও ছেলে চায় । কেবলই মেয়ে হলে যে তা ঠিক হবে না সেটাও তার ভাব না থেকে বোঝা যায় ।

কিন্তু মাহের যে স্ত্রী লুবনার ভাবনা শেয়ার করে না, ভাবে 'প্রকৃতি যেন পুরুষের প্রতি খানিকটা পক্ষপাতিত্ব করেছে' তাতে তাকেও খুব শিক্ষিত বলা যায় না । অধিকন্তু পুত্রজন্মের জন্য সে যা বা যাকে বা যাদের বিশ্বাস করে সেটাও খুব শিক্ষিত মানসিকতার প্রকাশ নয় । অধিকন্তু ভ্রূণ নষ্ট করার মধ্যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়ার বিষয়টিকেও সুস্থ বলা যায় না ।

গল্পকার কি তাহলে পুরুষতান্ত্রিকতাকেই হাস্যকর করে তুলতে কিংবা আক্রমণ করতে চান? মাথার ভেতর তার যতরকম 'প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ, হিসেব-নিকেশ, যুক্তি-প্রযুক্তিই' খেলে যেতে থাকুক, প্রকৃত ভাবনা কিন্তু খুব এগোয় না । বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে নিয়ে যতই সে ঠাট্টা করুক, বুদ্ধির সুস্থতা বা স্বাভাবিকতা কিন্তু তাতে নেই ।

পুত্র চাইবার পেছনে লুবনার যুক্তিটা বরং বাস্তব 'আমি প্রথমে চাই ছেলে', 'তুমি তো জানো আমরা পরপর চারটে বোন, শেষে যে ভাইটা হল সে স্কুল পাশ না করতেই আব্বা মারা গেলেন ।' মাহেরেরও শেষ চিন্তা, 'বুঝে শুনে এই পৃথিবীতে কে চাইবে একজন প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা বা মাতা হতে । সে সন্তান হিসেবে সেরাটাই প্রত্যাশা করে । পৃথিবীতে সে সারভাইভ করবে সহজে যে শক্তিমান, মূল্যবান, শ্রেষ্ঠ– যে

নিরাপদ, সহজে আক্রান্ত হয় না, আক্রমণ করতে জানে তাকেই তো চাইবে সকলে। গড় হিসেবে সেই প্রজাতি নারী নয়, পুরুষ। তাই পুত্র চায় এ সমাজ, হয়তো মাহেরও।'

গল্প পড়ে যদি পাঠকের মনে হয় এ ব্যাধিকে শনাক্ত করতে পেরেছেন লেখক, তাহলে তা সার্থক।

কিন্তু চরিত্রের ওপর যতটা ভর করেছেন লেখক তার চেয়ে বেশি প্রত্যাহার করলেই বুঝি ভালো হত।

অ নু বা দ

সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দ্দা র

....

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল ভাষণ

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সুইডেনের স্টকহোমে ১৯২১ সালে 'The Nobel Prize Acceptance Speech' শিরোনামে যে নোবেল ভাষণ প্রদান করেন তা বিশ্ববাসীর কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যের। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই সংক্ষুব্ধ বিশ্বে যে বিভেদ ও অনৈক্য তৈরি হয়েছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝে যে দূরত্ব বেড়েছিল, মানবতার যে সংকট দেখা দিয়েছিল এরই প্রেক্ষিতে ভাষণটি আবির্ভূত হয় তৃষিত হৃদয়ে দীর্ঘ শ্রাবণধারার মতো। পূর্ব এবং পশ্চিমের সমন্বয়ে যে অখণ্ড মানবতা আবির্ভাব হতে পারে তা বোধ করি এই ভাষণের আগে ছিল অপরিজ্ঞাত। অত্যন্ত অর্থবহ এই অমূল্য ভাষণটি সংযোজিত হয়েছে বিশ্বভারতী ও UBS পাবলিশার্স-এর উদ্যোগে সংকলিত Gitanjali গ্রন্থের শেষাংশে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত গীতাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপির ফটোকপি ও ডব্লিউ বি. ইয়েট্সের অনুবাদ সম্বলিত গ্রন্থটি সম্প্রতি শান্তিনিকেতন থেকে আমার স্নেহের ছাত্র প্রতিম সত্যজিৎ মণ্ডল সংগ্রহ করে দেয়ায় এ অনুবাদ কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। – অনুবাদক]

অবশেষে আমি আপনাদের মাঝে আসতে পেরে আনন্দিত এবং আপনারা আমার কর্মের স্বীকৃতি দিয়ে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন ও নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন এজন্য আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটুকু নিতে চাই ।

আমার সেই বিকেলটার কথা মনে পড়ছে যখন ইংল্যান্ড থেকে আমার প্রকাশক তারবার্তার মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদটা আমাকে জানিয়েছিলেন । আমার ধারণা আপনারা জানেন যে, আমি তখন শান্তিনিকেতন স্কুলে অবস্থান করছিলাম । ঐ মুহূর্তে আমরা ছিলাম শান্তিনিকেতন স্কুলের পাশে একটা বনের ধারে জলাসয়ে । আমি যখন তার ও ডাক অফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একজন ব্যক্তি দৌড়ে আমাদের কাছে এসে তারবার্তাটি সামনে ধরলেন । আমাদের ঐ বহরে একজন ইংরেজ অতিথিও ছিলেন । ঐ বার্তাটির কোনো মূল্য থাকতে পারে এটা আমি ভাবতেই পারিনি । গন্তব্যে পৌঁছেই পড়ার কথা চিন্তা করে সেটা নিছক পকেটে রেখে দিলাম । কিন্তু আমার অতিথি মহোদয় সম্ভবত এর বিষয়বস্তুটা জানতেন তাই তিনি এটা পড়ার জন্য নিবেদন জানিয়ে বললেন এটাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে । এরপর আমি সেটা খুলে পড়লাম । কিছুতেই যা বিশ্বাস হচ্ছিল না । প্রথমেই আমার মনে হচ্ছিল বোধহয় এর যা ভাষাগত অর্থ সেটা পুরোপুরি ঠিক নয় কিংবা আমি হয়তো এর কোনো ভুল মানে করছি তবে বার্তার পরিশেষে পৌঁছে আমি প্রকৃত বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম । আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন আমার স্কুলের ছেলেদের ও শিক্ষকদের কাছে সেটা কতটা আনন্দের ছিল । সবকিছু থেকে আমি বেশি আপ্লুত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, এইসব ছেলেরা যারা আমাকে ভালোবাসে এবং যাদের প্রতি আমার রয়েছে সুগভীর ভালোবাসা তারা এই সম্মানে গর্বানুভব করছে তার জন্য যাকে তারা গভীর শ্রদ্ধায় সিক্ত করছে । আমি অনুভব করছিলাম আমাকে প্রদেয় এই সম্মান আমার সাথে সাথে নিশ্চয়ই আমার দেশবাসীও ভাগ করে নেবেন ।

বাকি বিকেলটুকু এভাবেই কেটে গেল । যখন রাত ঘনিয়ে এল আমি একা চত্বর (terrace) টিতে যেয়ে বসলাম । নিজের কাছে প্রশ্ন জেগে উঠল, পশ্চিমা সন্তানদের থেকে সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক একজন ভিন জাতের মানুষের কবিতার কী সে অর্থ থাকতে পারে যে এতটা গ্রহণযোগ্য, সম্মানিত হয়ে উঠল । আমি আপনাদের কাছে নিশ্চিত বলতে পারি এটা কোনো পরম উল্লাসের অনুভূতি নয় বরং মুহূর্তটিতে ছিল অবনমিত হৃদয়ের আত্মজিজ্ঞাসা ।

আমার মনে পড়ছিল খুব ছোটবেলা থেকে আমার জীবন-কর্মের উর্দ্বতনের কথাগুলো । আমার বয়স যখন প্রায় পঁচিশ বছর তখন গঙ্গানদীর নৌ ঘাটায় বাংলার এক অজানা গ্রামে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একাকিত্বে জীবন গড়িয়েছিল । শরৎকালে হিমালয়ের হ্রদ থেকে চলে আসা বুনো হাঁসগুলোই ছিল আমার একমাত্র জীবিত সংগী । সূর্যালোকে উৎগীরিত মদিরার ন্যায় আমি যেন খোলা আকাশে তন্ময়তায় নিমজ্জিত থাকতাম;

নদীর কলতান আমার সঙ্গে কথা বলত, জানিয়ে দিত প্রকৃতির গোপন রহস্য। আমি সেসব নিঃসঙ্গ জীবনগুলোতে স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নগুলোকে কবিতায় রূপ দিয়ে কলকাতায় ম্যাগাজিন ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা মারফৎ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে জীবন কাটিয়েছি। আপনারা অনুভব করতে পেরেছেন এটা পাশ্চাত্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জীবন। আমি জানি না আপনাদের পাশ্চাত্যের কোনো কবি কিংবা লেখক যৌবনের সর্বোচ্চ সময়ে এ ধরনের চরম নিঃসঙ্গতার মাঝে কাটিয়েছেন কি না? আমি প্রায় নিশ্চিত যে পশ্চিমা জগতে এটা সম্ভব নয়, এ ধরনের নিঃসঙ্গতার কোনো স্থান পশ্চিমা জগতে নেই।

আমার জীবন এভাবেই কেটেছে। আমি ছিলাম ঐ সময়ে আমার দেশবাসীর কাছে অচেনা একজন ব্যক্তি। তার মানে আমাকে আমার প্রদেশের বাইরে খুব কম মানুষই চিনত। তবে এই 'অচেনা' আমাকে পরিতৃপ্ত করত যার দরুন মানুষের কৌতূহল থেকে আমি দূরে থাকতে পেরেছিলাম। এরপর এমন এক সময় আসল যখন আমি হৃদয়ের তাগিদ অনুভব করলাম এই নিঃসঙ্গতাকে ছিঁড়ে ফেলে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য। সেটা শুধুমাত্র জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করে এবং স্বপ্ন দেখে নয় বরং একান্ত ভাবনাগুলোকে নির্দিষ্ট কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, দেশবাসীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম পালনের মাঝ দিয়ে।

একটাই বিষয়, একটাই কাজ তখন আমার মনে আসছিল সেটা হল শিশুদের জন্য শিক্ষা। এটা কেবলমাত্র এই জন্য নয় যে, আমি শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, বরং এজন্য যে আমি নিজেই এ ধরনের নিয়মিত শিক্ষার সুফল থেকে দূরে ছিলাম। আমার এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে প্রথমে কিছুটা দ্বিধা ছিল তবে যেহেতু প্রকৃতির প্রতি ছিল আমার প্রগাঢ় প্রেম তাই স্বাভাবিকভাবে শিশুদের প্রতিও ছিল আমার ভালোবাসা।

এই প্রতিষ্ঠানটি (শান্তিনিকেতন স্কুল) শুরু করার প্রধান লক্ষ্য ছিল শিশুদের বাধাহীন আনন্দ, অনাবিল জীবন ও প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। আমি তরুণ বয়েসে এই প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে পার করেছি যেটা স্কুলে পড়ুয়া অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের তীব্র মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়। আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে শিক্ষা নামক যন্ত্রদানবের পিষ্টনকে, যা গুঁড়িয়ে দিয়েছে আনন্দ ও জীবনের স্বাধীনতা, যে আনন্দ ও স্বাধীনতার প্রতি থাকে শিশুদের অতৃপ্ত বাসনা। তাই শিশুদের স্বাধীনতা ও আনন্দের জায়গা তৈরি করা ছিল আমার লক্ষ্য। তাই আমার চারদিকে ছিল বেশ কিছু শিশু। আমি তাদের শেখাতাম, তাদেরকে খুশি করার চেষ্টা করতাম। আমি ছিলাম তাদের খেলার সঙ্গী। আমি ছিলাম তাদের সহচর। তাদের জীবনকে আমি ভাগ করে নিতাম এবং আমি অনুভব করতাম আমি যেন তাদের মাঝে বড় একজন শিশু। আমরা এভাবে স্বাধীন আবহে সবাই বেড়ে উঠেছিলাম।

শিশুদের এই প্রাণাবেগ, এই উল্লাস, তাদের আড্ডা, গান বাতাসকে ভরিয়ে তুলত পরমানন্দে। প্রতিদিন আমি সেখানে উপস্থিত থেকে ওদের প্রাণ ভরিয়ে তুলতাম। সূর্যাস্তের পরে প্রদোষে আমি প্রায়ই একা বসে ছায়ামগ্ন পথের গাছগুলোকে অবলোকন করতাম এবং বিকেলের নৈঃশব্দিক পরিমনগুলে বাতাসে ভেসে আসা শিশুদের কলধ্বনি আমার কানে পৌঁছত। আমার মনে হত এইসব চিৎকার, গান, আনন্দধ্বনিগুলো ঐ বৃক্ষগুলোর মতই, যেগুলো ধরিত্রীর বুক থেকে জীবনের ঝরনাধারার মতো উৎসারিত হয়ে নিঃসীম গগনের দিকে প্রসারিত হচ্ছে। প্রতীকী অর্থে সেটা আমার চোখের সামনে যেন মানবজীবনের সব উচ্ছ্বাস আকাঙ্ক্ষাগুলো সমস্ত মানবহৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে মহাগগনব্যাপী পরিব্যপ্ত হত। আমি বুঝতে পারতাম ও জানতাম যে আমরা এইসব বড় শিশুরা ব্যাকুল বাসনাগুলোকে অসীমের দিকে পাঠিয়ে দিই। আমি তা অনুভব করতাম অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে।

এই ধরনের আবহে এবং পারিপার্শ্বিকতায় আমি আমার গীতাঞ্জলি-র কবিতাগুলো লিখেছি। চমৎকার নক্ষত্রখচিত ভারতবর্ষের আকাশের নীচে গভীর রাতে নিজে নিজে এগুলো গেয়েছি আমি। প্রত্যুষে এবং সূর্যাস্তের বিকেলে আমি এই গানগুলো লিখতাম, যতক্ষণ-না পর্যন্ত আরেকটা নতুন দিন এসে আবার আমাকে অনুপ্রাণিত করত ও নিখিল বিশ্বের সাথে হৃদয়ের যোগ ঘটাত। আমি অনুভব করতে পারতাম নিঃসঙ্গ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এইসব প্রাণোচ্ছল শিশুদের মাঝে আমার অবস্থান, স্বগোত্রীয়দের জন্য আমার কর্মধারাগুলো কেবল নিখিল বিশ্ব পরিক্রমার পবিত্র যাত্রার সূচনা মাত্র। এখান থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমা মানবতাকে উপলব্ধি করার প্রবল ইচ্ছানুভব করতাম আমি। কারণ আমি জানতাম যে অমিত শক্তিতে পরিপূর্ণ এই যুগ হল পশ্চিমাদের। তার শক্তি বিশ্বজোড়া, তার জীবন সব সীমানা পরিপ্লাবিত এবং তার বারতা বিপুল ভবিষ্যতের দিকে প্রলম্বিত। আমার মনে হত মৃত্যুর আগে পশ্চিমদেশে আমাকে পৌঁছাতেই হবে এবং সাক্ষাৎ পেতে হবে সেসব নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানুষের, যার স্বর্গীয় আশ্রয় তার মন্দির। আমি চিন্তা করতাম সমস্ত শক্তি আর জীবনের প্রণোদনাপূর্ণ মানুষগুলোর বাসস্থল পশ্চিম দেশে। তাই আমি বেরিয়ে এলাম। বাংলা ভাষায় গীতাঞ্জলি রচনার পর আমি তা ইংরেজিতে অনুবাদ করলাম তবে তা প্রকাশ করার ইচ্ছে নিয়ে নয়। যদিও এই ভাষায় দখলের ওপর আমার সংশয় ছিল তবু আমি তা করেছি। পাশ্চাত্যে আসার সময় আমি তা সঙ্গে আনি। আপনারা জানেন ব্রিটিশ জনগণের কাছে যখন কবিতাগুলো পৌঁছল এবং প্রকাশের আগে যাদের পড়ার সুযোগ হল তারা এটা সাদরে গ্রহণ করলেন। কালবিলম্ব না করে আমাকে তারা অন্তর থেকে মেনে নিলেন।

এটা আমার কাছে অলৌকিক বিষয় মনে হয়, একটা মানুষ পঞ্চাশ বছর কর্মচাঞ্চল্যের কত বাইরে, পশ্চিমা জগৎ থেকে কত দূরে, অথচ পশ্চিমদেশের মানুষ তাকে তাদের নিজেদের কবি হিসেবে গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে। আমার কাছে এটা একটি

বিস্ময়কর ব্যাপার তবে সম্ভবত এর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। আমি পশ্চিমা জীবনের মনন থেকে নিঃসঙ্গে অবস্থান করে তাদের জন্য যে সৌম্য, প্রশান্তি ও চিরন্তনের অনুভূতিগুলোকে নিয়ে এসেছি তা সত্যিকার অর্থে পশ্চিমা মানুষের কর্মচাঞ্চল্য জীবনের জন্য দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল তাদের তৃষিত হৃদয়ের জন্য শান্তি, অফুরান শান্তি। আর এ কাজে আমি পারঙ্গম হয়েছিলাম যৌবনের গঙ্গার বেলাভূমি থেকে চরম নির্জনতার দিনগুলোর মাঝ দিয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। ঐসব দিনগুলোর অনুভূতি আমার প্রকৃতির গভীরে সঞ্চিত ছিল, তাই আমি সেগুলোকে ব্যক্ত করেছি, তুলে ধরেছি পশ্চিমের মানুষের কাছে। আর আমি যা অর্পণ করেছি সেটা গৃহীত হয়েছে পরমানন্দে। আমি জানতাম একক ব্যক্তি হিসেবে এই সম্মান আমি গ্রহণ করতে পারব না। আমার হৃদয়ে আছে প্রাচ্য, যা পাশ্চাত্যকে সমর্পণ করেছি। এটাই তো প্রাচ্য যার রয়েছে আধ্যাত্ম মানবতার মাতৃবক্ষ, পশ্চিমের শিশুরা যখন খেলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আঘাত পায়, ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে যায় তখন কি তারা তার মাতৃবক্ষের ওপর আশ্রয় নেয় না, সেই মাতৃবক্ষ তথা প্রশান্ত হৃদয় কি প্রাচ্য নয়? তারা কি তাদের মায়ের নিকট থেকে খাদ্য পেতে চায় না, তারা কি কর্মক্লান্ত হয়ে রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য ছুটে যায় না? তারা কি তৃষিত হৃদয়েই থেকে যাবে?

আমার সৌভাগ্য হল আমি ঠিক এমন মুহূর্তে এসেছি যখন পাশ্চাত্য আবার প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে, স্নেহের পরশ বুলাতে প্রাচ্যকে খোঁজ করছে। কারণ আমি তো প্রাচ্যেরই প্রতিনিধিত্ব করছি, আর পাশ্চাত্যের বন্ধুরা আমাকে করেছেন পুরস্কৃত।

আমি আপনাদের কাছে দৃঢ়ভাবে বলছি আপনারা আমাকে যে পুরস্কার প্রদান করেছেন তা নিছক আমার ব্যক্তিগত কাজে নষ্ট হয়নি। ব্যক্তি হিসেবে আমার নিজের সেটা ভোগ করার কোনো অধিকারও নেই; তাই আমি অন্যের কাজে সেটা ব্যয় করেছি। আমি আমাদের প্রাচ্যের শিশু ও ছাত্রদের জন্য সেটাকে উৎসর্গ করেছি। এটা একটা বীজের মতন যাকে মাটির ভিতর গ্রথিত করা হয়েছে, আবার যারা বপন করবে তাদের কাছেই সেটা আবির্ভূত হবে; তাদের উপকারের জন্য ফল ফলবে। আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছি যেটা আমি দেরিতে হলেও শুরু করতে পেরেছি। আমার ধারণা এটা এমন একটা জায়গা হবে যেখানে পশ্চিমের ছাত্ররা এসে প্রাচ্যের বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবে। তারা হয়তো একত্রে কাজও করবে এবং প্রাচ্যে শত শত বছর ধরে লুক্কায়িত গোপন ভাণ্ডারের সন্ধান পাবে, খোঁজ পাবে প্রাচ্যের আধ্যাত্ম উৎসের, সমস্ত পৃথিবীর মানবতার জন্য যা অপরিহার্য।

আমি আপনাদের সেই যুগের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যখন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় সময়ে ছিল তার বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। যখন কোনো আলো প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তাকে ক্ষুদ্র সীমানায় আটকিয়ে রাখা যায় না। এটা তখন হয়ে পড়ে সারা

বিশ্বের। ভারতবর্ষের ছিল জাঁকজমকপূর্ণ প্রাজ্ঞ ও সম্পদে ভরা সভ্যতা। যা তার সন্তানদের জন্যই শুধু সেটা ব্যয়িত হয়নি। সব জাতির আতিথ্যের জন্য তার দুয়ার উন্মুক্ত থেকেছে। এখানে এসেছে চীন, জাপান, পার্সিয়ান সহ সকল জাতিরা। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করার তাদের সুযোগ হয়েছে, সুযোগ হয়েছে সর্বকালের সমগ্র মানবতার শ্রেষ্ঠ উপহার গ্রহণ করার। এবং সে এই আহ্বান জানিয়েছে উদাত্তভাবে। আপনাদের জানা আছে জ্ঞান বিতরণের বিপরীতে বস্তুগত অর্থ গ্রহণ করার কোনো ঐতিহ্য আমাদের নেই। কারণ আমরা ভারতবর্ষীয়রা মনে করি যিনি জ্ঞানী, অন্যের মধ্যে তা সঞ্চারিত করার দায়িত্ব তার নিজের। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ছাত্ররাই যে তার গুরুকে জিজ্ঞেস করবে তা নয়, গুরু যদি তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করতে চান তাহলে জ্ঞানেচ্ছুদের খুঁজে বের করে সর্বোচ্চ উপহারটি প্রদান করবেন। এভাবে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতে সঞ্চিত ভাণ্ডারকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবে। এভাবেই বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতে।

আমি অনুভব করি আজকের দিনে অন্য কোনো বিপর্যয় নয় বরং আমরা অন্ধত্ব, নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে মানবতার আতিথেয়তার আহ্বান নষ্ট করেছি। নষ্ট করেছি আমাদের অনেকেই গৌরবের বিষয়গুলোকে বিশ্বকে অংশীদার না করে। শতাব্দীর বেশি সময় ধরে আমরা আমাদের নিজস্ব সভ্যতার ওপর আস্থা হারিয়েছি। যখন আমরা পশ্চিমা জাতির বস্তুগত উৎকৃষ্টতার সাথে পরিচিত হয়েছি এবং প্রাচ্যের মানবতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর তা প্রভাব ফেলেছে তখন আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির জন্য কোনো পথ তৈরি হয়নি। শতবর্ষের বেশি সময় ধরে আমাদের বিদ্যার্থীদেরকে অতীতের নিজস্ব সংস্কৃতির মূল্য থেকে দূরে রেখে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মাঝে ঠেলে দিয়েছি। এভাবে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের গোপন ভাণ্ডারকে অস্পর্শিতই রাখিনি বরং আমাদের ঐতিহ্যকে পারিনি সম্মান জানাতে। অন্যের কাছে ভিক্ষা চেয়েও নয়, অন্যের কাছ থেকে ধার নিয়েও নয়; আমাদের অনেকেই বাস করেছি গোঁড়া স্কুল ছাত্রদের মতো।

কিন্তু আজ সময় এসেছে সময় নষ্ট না করার। শতাব্দী থেকে শতাব্দী হাতড়িয়ে নয়, এদেশ থেকে ওদেশে ঘুরে নয়, অন্যের কাছে নিজের দীনতা প্রকাশ করে নয়, আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের যা আছে তার থেকে। আমরা জানি আমাদের গৌরবের জায়গা, পূর্বপুরুষের নিকট থেকে উত্তরাধিকারের অংশ। আমাদের এই সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না- ঠিক হবে না শুধু মানুষের স্বার্থেই নয়, মানবতার স্বার্থেও নয়।

এ কারণে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আমাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছে যেখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিদ্যার্থীরা একত্রে মিলিত হতে পারবে, ভাগ করে নিতে পারবে আধ্যাত্ম উপচার।

তাই আমি গর্বিত এই জন্য যে, আমার হৃদয়ে লালিত এক মহান লক্ষ্য পূরণে আপনাদের পুরস্কার কিছুটা অবদান রেখেছে। এর ফলে পশ্চিম দেশ আরেকবার আমার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আমি আপনাদেরকে সেই উপচার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, পূর্ব দেশ আপনাদের ভ্রমণের অপেক্ষায় আছে। আমার আশা এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হবে না। আমি ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করেছি, সাগ্রহ অভিবাদনে তারা আমাকে সিক্ত করেছে। এই অভিবাদনের একটা নিজস্ব অর্থ আছে সেটা হল পশ্চিমের যেমন পূর্বের দরকার, পূর্বেরও তেমনি দরকার পশ্চিমের। তাই তাদের একত্রে মিলনের সময় এসেছে।

আমি খুশি যে আমি এই মহান সময়ের, মহান যুগের। আমি খুশি যে পূর্ব-পশ্চিম যখন এক হয়ে আসছে, সেই যুগকে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমি কাজ করেছি। এখন একে অন্যের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তারা একে অন্যের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে, একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য হাত মিলিয়েছে, ভবিষ্যতের মহান সংস্কৃতি বিনির্মাণে এক হয়েছে।

আমি নিশ্চিত অনুভব করি, লেখার মধ্য দিয়ে আমার ভাবনা আপনাদের কাছে পৌঁছেছে, সেটা হয়তো অস্পষ্ট অনুবাদের মধ্য দিয়ে হলেও। আমার এই ভাবনাগুলোর কিছু পূর্ব-পশ্চিম উভয়ের থেকে প্রাপ্ত আর কিছু শুধু প্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত, এর যেগুলো পশ্চিমে আসতে পেরেছে, অথবা পশ্চিমেরই ধারণা বলে কিছু শ্রুত তার সবগুলোই পশ্চিমে গৃহীত হয়েছে। যদি আমি আমার লেখনির মাঝ দিয়ে কালের দাবিকে ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলে আমাকে সে সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাব। যে স্বীকৃতি আমি সুইডেন থেকে পেয়েছি তা আমাকে ও আমার কর্মকে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যদিও আমি নিশ্চিত করে বলব আমাকে তা অসুবিধার মখোমুখি করেছে। ওটা আমার অভ্যস্ত শান্ত জীবনকে ভেঙে দিয়েছে। আমাকে বৃহৎ জনতার মাঝে টেনে এনেছে যে-জীবনের সাথে আমার ছিল না কোনো যোগ। এটাকে এখনও আমি মানিয়ে নিতে পারিনি। আমি যখন পশ্চিমা মানবতার সুবিশাল যুক্তির মুখোমুখি হই তখন আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে আসে। আপনারা যেভাবে আমাকে অভিবাদিত করে তোলেন তা গ্রহণ করার জন্য আমি এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। আপনাদের সামনে যখন দাঁড়াই তখন আমি দ্বিধায় অবনত হই এখনও– আমার এরকমই হয়। কিন্তু আমি শুধু স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই মহান সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য যার দরুন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের হৃদয়কে এক করে দেখার ক্ষেত্রে আমি সমর্থ হয়েছি। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই অভিযাত্রাকে চালিয়ে যাব। আমি যা পারি তা অবশ্যই আমাকে করতে হবে। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যে অসন্তোষ আছে তাকে অবশ্যই মোচন করতে হবে। আমাকে অবশ্যই কিছু করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে আমি শুরু করেছি এই প্রতিষ্ঠান।

আমি মনে করি না কোনো কিছু বর্জন করার মানসিকতা আছে ভারতবর্ষের- কোনো জাতিকে নয়, নয় কোনো সংস্কৃতিকে। ভারতবর্ষের মনন সর্বদা এক ঐক্যের আদর্শকে প্রচার করে। ঐক্যের আদর্শ কখনও কাউকে বর্জন করে না, জাতি অথবা সংস্কৃতি কোনো কিছুকে নয়। এটা সব কিছুকে হৃদয়ঙ্গম করে। আমাদের আধ্যাত্ম অভিযাত্রার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল এক আত্মা দিয়ে সবকিছুকে উপলব্ধি করার যা কিছু যেমন আছে তাকে বোঝার। নিখিল বিশ্বের থেকে বাইরে রেখে নয়, বরং সহানুভূতি ও প্রেমের দ্বারা সবকিছুকে উপলব্ধির মাধ্যমে। এটাই ভারতবর্ষের দর্শন। বর্তমানে যখন এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে সেই একই ভারতবর্ষের সন্তানেরা পশ্চিমাদের বর্জন করার জন্য চিৎকার তুলেছে আমি তাতে কষ্ট পাই। আমার আন্দাজ এই শিক্ষা তারা পশ্চিমাদের কাছ থেকে পেয়েছে। আমাদের ব্রত সেটা নয়। ভারতবর্ষ সমস্ত জাতিকে এক করতে চায়।

ভারতবর্ষে সব জাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়নি। আমাদের সমস্যা হল জাতিগত সমস্যা যা সব মনুষ্যপ্রকৃতির জন্যই সমস্যা। আমাদের আছে দ্রাবিড়, আছে মুসলমান, আছে হিন্দু এবং আরো অনেক জাতির মানুষ আছে ভারতবর্ষে। সুতরাং হালকা কোনো রাজনৈতিক ঐক্যের মূল্য নেই আমাদের কাছে, এটা আমাদের মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারে না; আমাদের কাছে এটা সত্য হয়ে ওঠে না। আমাদের আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আমাদেরকে সবচেয়ে গভীর ঐক্যকে খুঁজে বের করতে হবে, বের করতে হবে নানা জাতির মধ্যে আত্মিকতাকে। মানুষের মননের গভীরে আমাদের ঢুকতে হবে এবং বৃহৎ ঐক্যের বন্ধনকে পেতে হবে যা পাওয়া যাবে সমস্ত মানবজাতির মাঝে। আমরা এজন্য দারুণ প্রস্তুত। আমাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পেয়েছি অমর সৃষ্টি; ঐ সব মহান লেখকরা ধর্মের ঐক্য ও সহানুভূতি প্রচার করেছেন এবং বলেছেন : যিনি সকলকে নিজের করে ভাবেন, যিনি সবকিছুকে নিজের করে উপলব্ধি করেন, তিনি সত্যকে জানেন। এটাকে আবারো উপলব্ধি করতে হবে। শুধু প্রাচ্যের সন্তানদের বুঝলেই হবে না, বুঝতে হবে পশ্চিমের সন্তানদেরও। তাদেরও এই অমর সত্যকে স্মরণ রাখতে হবে। মানুষকে মনুষ্য জাতির সাথে যুদ্ধ করলে হবে না, অন্যান্য ব্যক্তি-মানুষের সাথে যুদ্ধ করলে হবে না তার কাজ হবে সন্ধি ও শান্তি এবং বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সুসংহতি তৈরি করা। আমরা যুদ্ধবাজ পশু নই। এটা হল সেই অহং যা আমাদের দুঃখ বাড়ায়, ঈর্ষা ও ঘৃণা তৈরি করে, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বাড়ায়। আমরা যদি এই অশান্ত হৃদয়ের একান্ত গভীরে যেতে চাই, ভালোবাসা ও জাতির মধ্যে ঐক্য চাই তাহলে এইসব মোহ দূর করতে হবে।

ভারতের এই মহান ব্রতকে সামনে রেখে আমি শুরু করেছি বিশ্ববিদ্যালয়। আমার এই সুযোগে আমি আপনাদের আসতে বলব, আমন্ত্রণ জানাব আমাদের কাছে, আপনাদের হাত সম্প্রসারিত করতে বলব। আপনারা আপনাদের ছাত্রদের ও বিদ্যোৎসাহীদের এখানে আসতে দেবেন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একটা সার্বজনীন

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবেন। তারা যেন তাদের জীবনের জন্য অবদান রাখতে পারে, আমরা যেন সবাই মিলে এটাকে বাঁচিয়ে রাখি এবং বিশ্বের অখণ্ড মানবতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।

এজন্য আমি আপনাদের কাছে এসেছি। মানবতার ঐক্যের নামে, ভালোবাসার নামে, স্রষ্টার নামে এটাই আমি আপনাদেরকে বলব। আপনারা আসবেন। আমন্ত্রণ রইল।

২৬ মে ১৯২১, স্টকহোম

নি ব ন্ধ

মু স্তা ফা জা মা ন আ ব্বা সী

....

রুমির অলৌকিক বাগান

এ বাগানে নতুন এসেছি। সব কিছুই লাগছে নতুন। গোলাপের সুরভির মাঝে যেন রুমির আত্মা কথা বলে যায়। যার উন্নত আত্মা, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষমতা তার তত বেশি। জীবনেও, মরণেও। শ্রেষ্ঠ যারা, ইসলামের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয়, 'ইনসানে-ই-কামেল'। মানুষের সামনে তারা মেলে ধরেন আখ্‌লাক, মধুর ব্যবহার। যার ব্যবহার যত ভালো, সে তত ভালো। যতক্ষণ মানুষের কাছাকাছি থাকেন তারা, তাদের সঙ্গ মধুর চেয়ে মধুরতর; মুখের হাসিটি লেগে আছে, কাউকে দুঃখ দিতে জানেন না তারা, আনন্দ দেয়ার জন্যেই তাদের আগমন। বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এলে মখ্‌লুকাত কাঁদতে থাকে তাদের জন্যে। বিদায় মুহূর্তে সবার চোখে পানি। শত সুফি সাধক শুয়ে আছেন বাংলার নানা গ্রামে বন্দরে। এঁদের ওরশে কখনও হাজার, কখনও লক্ষ মানুষের জমায়েত। মৃত মানুষের জন্যে এত সমাগম। মৃত আত্মা কিছু দিতে পারে। চৌদ্দশ বছর ধরে বাংলার গ্রামে গ্রামে দৃষ্ট এই

জমায়েত। অর্থ, জাগ্রত আত্মা মরণের পরেও জাগ্রত। রসুলের সিল্‌সিলা ধরে তাঁরা অন্য জাগরিত আত্মাদের সম্মেলনে যোগদান করেন। আত্মার সঙ্গে মিলিত হয় এই আত্মা। যারা জীবন্মৃত তাদের প্রয়োজন নেই যোগাযোগের, না জীবনে না মরণে। আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী যারা, আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন এক লহমায়। রুমির বাগানে সহস্র গোলাপ। তারই কয়েকটি তুলে এনেছি আপনাদের ফুলদানিতে।

ফকিরদের মাজারে ঘুরে বেড়ান যারা, তাদের সঙ্গে মিশে এক পাত্রে খাবার খেলে, একসঙ্গে গান গাইলে, প্রার্থনা করলে অনুভূতি হয় প্রখরতর। তাদের কথা বলব আমার লেখনিতে, আমার ঢঙে। রুমির কথা বলতে গিয়ে বলব হাসন রাজা, একলিমুর রাজা, শেখ ভানু, আরকুম শাহ, কালা শাহ, দূরবিন শাহ, শাহনূর, শীতালং শাহ ফকির, লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জুশাহের কথা। একই ফকিরের সাগ্‌রেদ এরা। গুরুর নাম : মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা), কম্‌লিওয়ালা-কম্বলধারী, সংসারেই পেতেছেন অধ্যাত্মের শয্যা। সায়াহ্নে এসে বুঝতে চেষ্টা করি ফকিরদের এই কেরামতি। আত্মাকে পরিশীলিত করে পবিত্র হতে হলে চাইতে হয় ফকিরের সোহ্‌বাত-সান্নিধ্য, তাদের সঙ্গেই মাতামাতি-যিকির-খাওয়া-দাওয়া। তাদের রচিত কাব্যের প্রতি একাগ্রতা ও একাত্মতা, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। আদিষ্ট হয়েছি মওলানা জালালউদ্দিন রুমির 'মস্‌নবী'র নির্যাস বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

দুবছর ধরে ভেবেছি কিভাবে মওলানা রুমিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা যায় বাংলার মানুষের কাছে, যেমনটি করেছিলেন জর্জিয়ার ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক কোল্‌মান বার্কস্। পৃথিবীর তাবৎ অধ্যাত্মভক্তদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন রুমির বার্তা, তার অর্ধডজনেরও বেশি ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থে, পুরোপুরি রুমি হয়নি যদিও। রুমি ও কোল্‌মান মিশ্রিত, তাতেই স্তম্ভিত পৃথিবী। এ যেন : 'এ কোন মধুর শারাব দিলে আল আরাবি সাকি'? এমন সুরা তো পান করিনি, আত্মার খাদ্য, প্রভুর সঙ্গে মিশে যাওয়ার বিগলিত করুণারাশির মধ্যে প্রবেশ। এ যে রহমান রহীম, গফুরুর রহীমকে পাওয়ার গোপন সড়ক। কোল্‌মান বললেন আমাকে, মুসলমান হইনি, খ্রিস্টান আছি এখনও। মুসলমান হতে বাকিও নেই, বোরহানউদ্দিন নামে শ্রীলঙ্কার এক পীরের সন্ধান পেয়েছি। ইসলামের মূল মন্ত্রে বয়াত করেছেন তিনি, শয়তানের অনুগামী হইনি। জালালউদ্দিন অলক্ষে দীক্ষা দিয়েছেন, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যান, আমার সঙ্গে মুসাহিবা করেন, লেখা শুদ্ধ করে দিয়ে চলে যান। তাঁর মাধ্যমে জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (সা)-এর দেখা পাই। যদি মুসলমান না হয়ে থাকি, তা হলে মুসলমান কে?

নিজের দিকে তাকাই। মুসলমান হতে পেরেছি কি, জগদ্‌গুরুকে চিনতে পেরেছি কি, তিনি কি আমাকে কখনও দেখা দেন? প্রতি উম্মত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আমি রসুলের প্রিয় কি না জানি না। রুমির সাতশ বছরের 'মস্‌নবী শরীফ' কি ভুলে গেছি, ভুলে গেছি আরবি ও ফারসি। তাই কি নতুন করে কোল্‌মান বার্কস্‌ের কাছে রুমিভক্ত সাজলাম। এটাই সত্যি। ইংরেজির মাধ্যমে রুমিকে চিনছি, ছয় খণ্ড

নিকলসনের মাধ্যমে চিনি 'মস্‌নবী'কে। ২০০৮ সনে রুমির জন্ম শতবার্ষিকীতে পৃথিবীব্যাপী কয়েক শত বই ছাপা হয়েছে, ইংরেজিতেই শতাধিক, যেখানে রুমির নতুন দিগন্ত আবিস্কৃত। পিছিয়ে আছি আমরা। আরবি ফারসিকে বিদায় জানিয়েছি বলে। রুমির অনুপ্রেরণায় তাই মস্‌নবীর নির্যাস ও তাঁর লেখা চিঠিপত্র নিয়ে আমার এই নতুন লেখা।

দুই

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। মসনবী আবৃত্তি করে রুমিকে বোঝানো কঠিন নয়। তাঁর একেকটি বয়েত দিয়ে একেকটি গ্রন্থ রচনা সম্ভব এবং একটি বয়েত দিয়েই একজনের পক্ষে রুহানী ফয়েজ হাসিল করা সম্ভব। আমার পরিচিত একজন সংগীতসাধক, সারা জীবন রেডিও টেলিভিশন ও ফাংশনের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবন থেকে কিছুই পাননি, না অর্থ, না সম্মান, না খ্যাতি। তিনি বেহালা বাজাতেন, মাঝে মাঝে রেডিওতে যেতেন, মাঝে মাঝে ছাত্রদের শেখাতেন। একদিন দেখি তিনি তার অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন। বললেন, আপনারা তো তিন পুরুষ ধরে গান বাজনা করে আসছেন, কিছু পেয়েছেন? তার চোখের দিকে তাকালাম। নতুন এক রশ্মি তার দৃষ্টিপথে, যে দৃষ্টি মুহূর্তেই বলে দেয় তার গন্তব্য। বুঝলাম, উনি মারেফতের সন্ধান পেয়েছেন। বললাম, আমি পাইনি। আমাকে কিছু বলতে চান মনে হল। মস্‌নবীর একটি বয়েত আবৃত্তি করলেন :

*চুঁকে মোৎরেব পীরেতর গাশ্‌ত ও জয়ীফ * শুদ যে বেকছবী রহীনে এক রগীফ*
*গুফ্‌ত ওমর ও মোহলতাম দাদী বছে * লোৎফহাকার্দী খোদায়া বা খছে*
*মাছিয়ৎ অর্যীদাআম হাফ্‌ তাদে ছাল * বাযে নগ্রেফতী যে মান রূযে নাওআল*
*নীস্ত কছ বেমরূযে মেহমানে তুআম * চঙ্গ বহ্‌রে তু যানাম কানে তুআম*

আমার অনুবাদে বাংলায় দাঁড়াল :

ক্লান্ত বেহালা বাজিয়ে জীবন কাটছে রুটির অন্বেষায়
বয়স সুযোগ শেষ হল তবু, ডুবে আছি আমি কোন আশায়
গোম্‌রাহীতে ডুবেছে আমার সত্তরের এই জিন্দেগী
বাজাও, এবার বাজাও আমায়, তোমার বীণার সুরগাঁথায়।

অক্ষম বেহালাবাদক জীবনের শেষে উপনীত হয়ে তখনও রুজির খ্যাতির প্রতিপত্তির অন্বেষায়। অনেক কলাবিদ সংগীতসাধক ও বেহালাবাদকের দেখা পেয়েছি, জীবনে তারা কিছুই পাননি। অবশেষে দেখা গেল এই বেহালারই একটি ছড়ে লুকিয়ে আছেন তিনি, যাকে সারাজীবন তিনি খুঁজছেন। এখানেই সৃষ্টির পুঞ্জিভূত রহস্য, 'মস্‌নবী' জুড়ে এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন। প্রতিটি বয়েত পড়ার পর মানুষের মন ঘুরে বেড়াবে সেই

রহস্যের উন্মোচনে। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে ভিয়েনায়, ইউরোপিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিকের আচ্ছাদনে হলভর্তি লোক শুনছে বিমূর্ত সংগীতের লীলা। ভারতের নানা শহরে উচ্চাঙ্গসংগীতের আয়োজনে মানুষ ছুটে চলেছে অশ্রুত সংগীতের মাঝখানে নতুন কোনো সংগীতের বার্তার অন্বেষণে। রবীন্দ্রনাথের গানে অশ্রুত বারতার প্রতিধ্বনি। যারা সক্ষম, তারাই বুঝবেন সেই সংগীতের মর্ম। পিথাগোরাসের সংগীত এই কথারই প্রতিধ্বনি। ভারতীয় রাগসংগীতের '২২ শ্রুতি' এক সপ্তক থেকে আরেক সপ্তকের মাঝখানে লুকিয়ে থাকা সংগীতের লুপ্ত স্বরগুলো। 'শ্রুতি' ও 'মোগামে'র সঙ্গে পরিচিত যারা, ইউরোপিয়ান ক্লাসিকাল সংগীতের সঙ্গে পরিচিত, তারা উচ্চতর সংগীতের মর্মার্থ উপলব্ধিতে সক্ষম। আরবীয়রা, যারা সংগীতে উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তারা এই সংগীতের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন। উপরে উঠতে পারেননি যারা, তাদের জন্যে আফসোস! সংগীতের কোলাহলকে 'হারাম' ফতোয়া দিয়ে জায়নামাজে আশ্রয় নিয়েছেন। আল্লাহ তাদের দেখা দিয়েছেন কি? জানি না। বেহালাবাদক বলেছেন, তার উপার্জনের সব চেষ্টা আজ বাতুলতা মাত্র। তার হাতে নেই সেই আগের বল, সুর খেলে না তেমন আগের মতো। চারদিকে থেকে যারা পয়সা ছুঁড়ে দিতেন তারা হাত গুটিয়ে ফেলেছেন। বেহালার আসর শেষে চাদর বাড়িয়ে দিলে, তা শূন্য। তার সময় এখন শেষ। সংগীতের শেষ সমর্পণে প্রভুকে সাড়া দিতেই হবে। প্রভুকে তাই নিবেদন : তোমার জন্যেই আজ আমার বেহালা, অথবা সন্তুর বা বাঁশি, যে যন্ত্র তোমার পছন্দ, তাই আমি বাজিয়ে শোনাব তোমার মন ভোলাতে। তুমি সবচেয়ে ভালোবাস বান্দার প্রার্থনা, আঁখিজল। শ্রদ্ধার চোখে তাকাও তার দিকে যখন বান্দা বাজায় এমন এক সুর, যে সুরের তুমি কাঙাল। তখন তুমি বান্দাকে কাছে টেনে নিয়ে আস, তাকাও তার দিকে শ্রদ্ধার চোখে।

বেহালাবাদকের জীবনে এল শুভবুদ্ধির আবর্তন। বাংলার এক সুফি সাধক শীতালং শাহ ফকির। তাঁকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পাই ঠিক এই বেহালাবাদকের অনুরূপ পরিস্থিতি। তার লেখা অসংখ্য গানে পাওয়া যায় রুমীর 'মসনবী'র ছায়া। যেখানে সংগীত পরিত্যক্ত শুধু প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্যে। যেখানে দেখা যায় সমস্ত বৃক্ষরাজি প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রস্তুত। যেন বেহালা গাছে ঝুলে রয়েছে। 'দরখ্‌তে বাজে তব নাম' শীতালং শাহ ফকিরের একটি পরিচিত গান।

মানুষের দ্বারে দ্বারে আর বেহালা বাজানোর প্রয়োজন নেই। নেই প্রয়োজন রুটি রুজি হালুয়া সন্দেশের। এগুলো আপনা আপনি প্রভু সামনে দিয়ে যাবেন। দিল্লীতে সুফি বখ্‌তিয়ার কাকির (রা) দরবারে হাজিরা দিয়েছি। কাওয়ালরা সারাদিন ধরে নবীর প্রশস্তি গাইছেন, গাইছেন হাম্‌দ ও অলিআল্লাহ্‌দের গুণগান। ভক্তহৃদয়ের আকুতি পৌঁছে যায় অলির দরবারে। কোথা থেকে তরকারি রুটি গোশ্‌ত কে দিয়ে যাচ্ছেন তার হদিস নেই। বাংলার গ্রামে গ্রামে সুফিদের মজলিশে একই ঘটনার বিন্যাস। একদিন মিঠেছড়ার পীরসাহেব তাজুল

ইসলাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন রোজ সকালে তিনি চাল মেপে দেন। ঠিক যতজন খাবার ততটুকু চাল বরাদ্দ করি, টায়ে টায়ে মিলে যায়। আল্লাহ্‌র খাস রহমত! কোথা থেকে গরু মহিষ ছাগল ভেড়া মুরগি লাউ কদু বেগুন এসে হাজির হয়, তার খবর কেউ জানে না। এই খোরাকি প্রস্তুত করেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা। তার রাজত্বে রেজেকের কমতি নেই। জীবন থেকে পাওয়া।

তিন

ভালোমন্দ বুঝি না, জানি না। লেখাটি খানিকটা 'সাইকিডেলিক'। আধো-জাগর আধো-চেতনে অতি প্রত্যুষে পবিত্রতার স্পর্শে এই বইটি লেখার সুযোগ গ্রহণ করেছি। ত্রুটির সম্ভাবনা থাকবেই, তেমনি সম্ভাবনা চকিত স্পর্শ পাবার। যা চেয়েছি তা এতে নেই, যা চাইনি তা এতে আছে। যা চাওয়ার মুহূর্তে কলমের আগায় এসে গেছে, তা আমার চাওয়া হতে পারে না। যিনি লিখিয়েছেন, তার কথা তাহলে এগুলো। এমন কী ব্যক্তি যার হাত দিয়ে এত কথা লিখিত হওয়ার। এর তাৎপর্য বুঝিনি, এখনও বুঝিনি।

সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি, একই কথা বার বার মস্তিষ্কের চারধারে কে বলে যাচ্ছে, তা-ও বুঝি না। মাঝে মাঝে মাথাটাকে ঝেড়ে নিচ্ছি, আবার কে যেন বলে যাচ্ছে, তোমরা সবাই এক জাতি, এক জাতি, এক জাতি। নিকটবর্তী ধ্বংসের মধ্যে বাস করে আলাদা আর কতদিন থাকবে? এবার এক হয়ে যাও। একাকী নয়, একসাথে চিন্তা কর। বিরাট কম্পনে সব যখন একাকার হয়ে যাবে তখন আর আলাদা পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর হয়ো না। এক হও, এক হও, এক হও। এক পৃথিবীর ভাবনায় নিজকে নিয়োজিত কর।

হৃদয়ের মধ্যে একসঙ্গে বেজে উঠছে একশটি যন্ত্র। সেই বেজে ওঠার মতো হৃদয় কি আমার। ভিয়েনায় যখন সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রা শুনতে হাজির হয়েছিলাম ত্রিশ বছর আগে, বিস্ময়ে দেখেছি একসঙ্গে শত বেহালা বেজে উঠছে, অন্যদিকে শতটি ফ্লুট, কখনও ধীরে, কখনও একাকী, কখনও সমস্বরে বেজে ওঠে হাজার শ্রোতার মনে কম্পনের সৃষ্টি করছে। পিনপতনের শব্দ নেই কোথাও। এই শতবাদ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই রুমির। তখন তার তবলা ও ঢোলকের অশ্রুত ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হই।

'প্রতি প্রাতে বাজাও তোমার যন্ত্র, এমনি করে
হ্যাঁ, আমার অরূপ, এমনি করে, ঠিক এমনি করে
তোমার সন্‌তুর রেখে এস ভেনাসের কাছে, ওহে চন্দ্র
প্রবেশ কর, ঠিক এমনি করে, তোমার পা দুলিয়ে আনন্দের সাথে
ঠিক এমনি করে, যখন জনতা চায় মুশ্‌কের সুগন্ধ
তোমার চুলের বেণি খুলে দিও নৃত্যের ভঙ্গিতে, ঠিক এমনি করে
যদি ইচ্ছারাজি দুলতে না চায় একবারও তোমার সাথে

ঘোরানোর চাক্‌তিতে জ্বালিয়ে দিও আগুন, এমনি করে
আজ যে মহা সম্মিলনের দিন, হে ভালোবাসা, আমার হাতটি ধর
এবং আমাকে নিয়ে যাও রাজকীয় উৎসবে, ঠিক এমনি করে'।
('দিওয়ান' নম্বর, ১৯৫৩ : ১, ৩-৬)

রুমির কবিতা বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় পাঠককে। ফারসিতে এটি কেমন হবে কল্পনা করুন, ইংরেজিতেই যখন এত সুন্দর। বাংলায়ও মন্দ নয়, যদিও গদ্য ছন্দে অনুবাদ করেছি। কবির অন্তরে কী খেলা করছে? এটা কি ভিতরের সংগীত না বাইরের? একজন আলোচক দেখিয়েছেন যে তাঁর ছন্দের প্রতি দুর্বলতা আছে সত্যি, কিন্তু হৃদয় ও ঢোলকের মিলটি কাকতালীয় নয় মোটেও। চোখ, কান ও হৃদয় মিলিত হয়ে সংগীতের মাধুর্য এনেছে 'দিওয়ানে'। ভিতর ও বাহির একাকার। প্রতিটি দিওয়ানই সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে হবে? হ্যাঁ, তাই। পরেরটি পড়ি :

'হে আল্লাহ্! সংগীতজ্ঞদের জন্যে এনে দিও মিষ্টি মধু
যেন তারা বাজিয়ে চলে তবলা ও ঢোল অবিশ্রান্ত,
হাত দিয়ে যা বাজায়, তা তো তাদের দেহশক্তি
সত্য সুন্দর আলো ঢেলে দাও, বাজনার জোড়ে
তোমারই সংগীতে যেন তারা ভরে দেয় আমার কানযুগল
শত দৃষ্টি দান কর তাদের অন্তরে, খালি চোখে মহারাজকে দেখার।
পায়রার মতো মিষ্টি প্রেমের বোলতান
তোমার দয়া দিয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত কর তাদের
সিফাত গাইতে গাইতে তোমার তাদের বোধ যেন হয় শানিত
প্রতিদানে, দিও কিছু 'মারহাবা', তোমার তরফ থেকে'।

কে বলে জীবন পরিকল্পিত? 'মস্‌নবী' জুড়ে পরিকল্পনার অভাব সনাক্ত করলে বলতে হয়, যখন যা মন চায়, যখন যা মনে এসেছে, তাই লিখেছেন কবি। পরিচ্ছদ ভাগ করে তার কাব্য বিষয়ভিত্তিক হয়ে একটার পর একটা আসতে পারত। ছয় খণ্ডে নানা জায়গায় নানা বিষয়, একই কথা বার বার নানা প্রসঙ্গে এসে গেছে। মসনবীকে যদি বলা হয় 'পারস্য ভাষার কোরান', তা হলে কোরানেও আল্লাহ্ যা বর্ণনা করেছেন তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে। যখন আল্লাহ্‌র যা মনে হয়েছে তাই তিনি বয়ান করেছেন নবীকে, কখনও একবার, কখনও দুবার, কখনও বারবার। একই কথা বারবার, কেন? বান্দাদের বোঝাতে, যাতে তারা ভুল না করে। বান্দাদের বোঝানোর জন্যে কাব্যের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন বান্দাদের অনুসরণের। প্রভু বলছেন, আমরা শুনছি। এটাই আমাদের অনুশাসনের পুস্তক। আল্লাহ্‌র চেয়ে সুন্দর পরিকল্পনা আর কার হতে পারত?

গ্রন্থটিকে একবারই পরিবেশন করলেই-বা আপত্তি কী ছিল? কেনই-বা দীর্ঘ তের বছর ধরে একটি গ্রন্থের প্রকাশ, তাঁর প্রিয় রসুলের জবানী দিয়ে জিব্রাইলের মাধ্যমে?

১২০৭ খ্রিস্টাব্দে ২৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বল্‌খ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আল্লামা রুমি। তাঁর পিতার নাম বাহাউদ্দিন ওলিদ। পাঁচ বছর বয়স থেকেই অলৌকিক বিষয়াদির মধ্যে নিমজ্জিত। তিনি অন্য ছেলেমেয়েদের মতো খেলাধূলায় ও আমোদপ্রমোদের মধ্যে লিপ্ত থাকতেন না। ছোটবেলায় তাকে পাওয়া যেত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আলোচনার গণ্ডিতে। ছ'বছর বয়স থেকে রোজা রাখতে শুরু করেন এবং সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কোরান শরীফ তেলাওয়াত করতে পারতেন। পবিত্র কোরান শরীফ তাঁর কণ্ঠ থেকে সুর হয়ে বেরুত, আর দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ত তাঁর। এই বয়সেই তিনি পবিত্র কোরানের মর্মবাণী উদ্ধার করতে পারতেন। জ্ঞানের সাধনায় চল্লিশ বৎসর দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করেন। এই অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন *ইল্‌মে মারফত* ও *ইল্‌মে লাদনির* মাধ্যমে। সুফি মত অনুসারে দেহ মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের অন্তরায়। দেহের মধ্যে বাস করে যে কামনা ও বাসনা সত্যপথ থেকে মানুষকে আলাদা করে দেয়। অহংকারী ও তথাকথিত 'ব্যক্তিত্ব' (Personality) নিয়ে মানুষ পরিণত হয় নফ্‌সের দাসে। নফ্‌সকে পরাস্ত করলে দেহের কর্তৃত্বের অবসান ও আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। মস্‌নবী পাঠ এই স্বাধীনতা অর্জনের সোপান। কোরান পড়বেন যারা, তাদের তফসির মস্‌নবী। আর মস্‌নবী পড়বেন যারা, তাদের জন্যে সোপান হিসেবে, 'রুমির অলৌকিক বাগান'। তাদের জন্যেই অর্থবহ, যারা কোরান ও মস্‌নবী স্পর্শে শিথিল।

মুহাম্মদ তাঁর নাম, উপাধি জালালউদ্দিন, মওলানা রুমি নামেই সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ। মাতৃভাষা ফারসি ও মৌলবি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতার নামও মুহাম্মদ, উপাধি বাহাউদ্দিন সুলতানুল উলামা ওয়ালাদ [জন্ম-৫৪৩ হি]। পিতামহ হুমায়ুন ইবন আহমাদ খাতিবী আল-বালখিও প্রসিদ্ধ সুফি ছিলেন। পিতার দিক থেকে রুমীর বংশ-পরম্পরা নবম পুরুষে গিয়ে হযরত আবু বকর-এর সঙ্গে এবং মায়ের দিক থেকে হযরত আলীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি ৬ রবিউল আউয়াল ৬০৪/ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১২০৭ সালে বল্‌খে জন্মগ্রহণ করেন। বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ-এর প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। সমসাময়িক কয়েকজন আলিম তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। এই বিরোধের পরিণতিতে তিনি ৬০৯/ ১২১২-১৩ সালে সপরিবারে বাল্‌খ থেকে কুনিয়া চলে যেতে বাধ্য হন। রুমির বয়স তখন পাঁচ। রুমির বয়স যখন ছয় তখন বিখ্যাত সুফি সাধক খাজা ফরিদউদ্দিন আত্তার [১১৯৯-১২২৯] বাহাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে এলে রুমি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন : আপনার এই শিশু সন্তানের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দেবেন। সে কালে একজন কামিলপুরুষ হবে। জালালউদ্দিন পিতার সঙ্গে থেকে ইল্‌মে শারীয়া ও ইল্‌মে মারিফা লাভ করেন। পিতার ইন্‌তেকালের পর রুমি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। জ্ঞান আহরণের জন্যে রুমি সিরিয়া ও আলেপ্পো সফরে এলে সেখানে শায়খ

মুহিয়ুদ্দীন ইবনুল আরবী, হানাবী, উসমান রুমী আওহাদুদ দীন কিরসাবীর সাহায্য পান। ৬৩৪-৩৫ হিজরিতে তিনি কুনিয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

পর্যটক দরবেশ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ তাব্‌রিযি কুনিয়া এলে রুমির জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধিত হয়। একদিন রুমি ঘোড়ার গাড়িতে সভাসদবেষ্টিত হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে তাবরিয্। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে অনুশীলন ও জ্ঞানচর্চা, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য তা হলে কী?

রুমি জবাব দিলেন ঃ শিষ্টাচার ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। শামস্ বললেন : তা নয়। এর উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান। আফলাকি বলছেন এই সময়ে শামস্ খুঁজছিলেন একজন উপযুক্ত শিষ্য, রুমির মধ্যে এই বিস্ময়কর ক্ষমতার স্ফুরণ তিনি প্রত্যক্ষ করে তাকেই শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। কুনিয়াতেই তিনি রয়ে গেলেন।

কথিত আছে, একদিন রুমি তাঁর ভক্তবৃন্দের সামনে বক্তৃতায় রত। তাঁর টেবিলের সামনে কয়েকটি বৃহদাকার পুস্তক। এইগুলির দিকে ইঙ্গিত করে শামস্ প্রশ্ন করলেন : এইগুলো কী? কিছুটা বিরক্তি নিয়ে রুমি : তা তুমি বুঝবে না। শামস্ বইগুলোর উপর ফুঁ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আর বইগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

রুমি বললেন : এটা কী হল? বইগুলোতে আগুন ধরে গেল কেমন করে?

শামস্ : তুমি তা বুঝবে না।

জালালউদ্দিনের চোখেমুখে নতুন এক জগতের দ্বার খুলে গেল। শামস্‌কে বাসায় নিয়ে এলেন, ৪০ দিন পর্যন্ত তারা একসঙ্গে নীরবে কাটালেন। শামসে্র প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়তে থাকে, তার মধ্যে কবিত্বের উন্মেষ হয়। এই আচরণ তাঁর আত্মীয়স্বজন ও শিষ্যদের কাছে অসহনীয় বোধ হয়। নানা ঘটনার আবর্তে শামস্ অন্তর্ধান করেন। রুমি দুঃখ-বেদনায় মুষড়ে পড়েন, নৃত্যসংগীত ও গজল রচনায় তাঁর দিন কেটে যায়।

তাঁর মৃত্যুর আগে কুনিয়ায় একাধারে ৪০ দিন ভূমিকম্প হয়। আফলাকির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সাতদিন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই সময়টিতে অবিরত ভূমিকম্প হতে থাকে। রুমি বলেন : জমিনের ক্ষুধা লেগেছে, সে এখন খাদ্য চায়। শীঘ্রই তা পেয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও বন্ধ হয়ে যাবে। মওলানা রুমি ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর ৩ মাস। কুনিয়ায় তাঁর মাজার জিয়ারত করতে আসেন অসংখ্য মানুষ। তাঁর জানাজায় ইহুদি ও খ্রিস্টানরা অংশ নিয়েছিল।

পাঁচ

'মস্‌নবী'র দর্শন কী? পৃথিবী নিয়ে দিনরাত মেতে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোগের উপকরণে পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্থাপনায় ভোগী মানুষ আর কিছুই খুঁজে পায় না। ভোগে মত্ত থেকে যখন এক সময় জড়বাদ কিছুই দিতে সক্ষম হয় না, খোঁজ হয় তখন অতীন্দ্রিয়ের। 'চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে'? বিধাতাও সবাইকে সমান সুখে রাখবেন তেমন অঙ্গীকার নেই। একই ব্যক্তি সুখের পরে দুখের দিনে প্রত্যাবর্তিত হয়, এমনটি সংসারের চক্র। স্বাস্থ্যবান নিমিষে হারিয়ে ফেলেন স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্যবান হারিয়ে ফেলেন তার সহায়সম্পদ। নদীর ধারের সুন্দর বাড়ি গ্রাস করে নদীর প্রবল স্রোত, ভূমিকম্পে সুনামিতে বিধ্বস্ত হয় নগর মানুষ শস্যক্ষেত। কেন তা হলে বিচ্ছিন্ন হয় মানুষের পরিকল্পনা? সুখের সাগরে আসে দুঃখের বন্যা? খোঁজ তখন হয় অন্য পৃথিবীর, পরমাত্মার, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের সংকট। তখন জায়নামাজে দুহাত পেতে মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে নিজের সুখ, নিজের প্রাপ্তি। যারা এই প্রাপ্তির মধ্যেও পান না চরম স্বাদ, তারা চান সেই চরম পাওয়াকেই কাছে পেতে, যার আত্মার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে চরম যাচ্ঞা। সুফিরা তাই চেয়েছে। পৃথিবীতে তারা পায় সামান্যই, এই সামান্যকেও তারা অসামান্য ভেবেছে। পবিত্রতার স্পর্শে এই পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষণ তাদের কাছে বেহেশতি ক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছে প্রতিভাত, পৃথিবী ও বেহেশত তাদের কাছে হয়ে এসেছে একাকার। সুখদুঃখ পাওয়া না পাওয়া একাকার। সুফির জীবন দুঃখের সাগরে আনন্দে নিমজ্জন। যারা সুফিদের কাছে আসে, তারা এমন কিছু পায়, যা পৃথিবীর ধনভাণ্ডারে নেই। এই ভাণ্ডার তাদের জন্যেই উন্মুক্ত যারা তাদের বেহালার ছড়ে পরমাত্মার স্পর্শ পেয়েছেন। দুফোঁটা পানির মধ্যেই অবস্থান করেছে সমগ্র নীল নদী। দুফোঁটা চোখের জল জাহ্নবী যমুনা পদ্মা মেঘনা যমুনা ধলেশ্বরীর মিলিত প্রবাহ। এই দুফোঁটা পানি অনেক সাধনার ফল। যারা সাধনায় সফল, অশ্রুজলেই শায়িত দিনরাত্রি। মসনবী দর্শন ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে প্রহার করা ও সত্যের মধ্যে অবগাহন।

চশ্‌মে হাসন ও রাহ্‌সাত মাযহাব আ'তাযাল
দিদা আকাল আসত সানি দারওসাল

(প্রকৃত মুসলমান যিনি, তিনি সুষ্ঠু জ্ঞানের দর্শনের সাহায্যে সত্যকে বুঝতে পারেন)।

সারা জীবন চলতে থাকে এই তালাশ। 'তালাশ করগা আগে তারে, তালাশ করগা আগে' কেন্দুয়ার কবি জালালউদ্দিন খানের একটি পরিচিত গান। যা আমি প্রায়ই গেয়ে থাকি। রুমি গুরুত্ব দিয়েছেন পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়াও অপর শক্তিশালী ইন্দ্রিয় যা বান্দার আধ্যাত্মিকতা। তিনি বলছেন, প্রকাশ্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। তুলনায় বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো পিতলের মতো আর অপরগুলো খাঁটি স্বর্ণ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ মাটি পানি বায়ু তাপ এসব জড়পদার্থের, যারা পচনশীল উদ্ভিদ খাদ্য থেকে গৃহীত উপাদানে পরিপুষ্টি পায়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় শক্তি

পায় আল্লাহর নূর ও আলোর শক্তি থেকে। নূর ও আলো আলাদা। পচনশীল উদ্ভিদের রস থেকে আহরিত খাদ্য শরীরের পরিপুষ্টি যোগায়। আত্মার খাদ্য সৃষ্টিকর্তার নূর ও আলো। এই খাদ্য লুকোনো। খাদ্যের মধ্যে যে গুণ, যেমন একশ রকমের ভিটামিন, খালি চোখে দেখা যায় না। নানা ঔষধের যে গুণ খালি চোখে নিরূপণ করা অসম্ভব। গুণ দিয়ে ঔষধের বিচার, যখন কোনো ঔষধ কাজে দেয় না, তখন তা পরিত্যাগ করি বৈকি।

নূরের প্রক্ষেপ সবার জন্যে নয়। নূরের তালাশী যারা, তারা জানতে সক্ষম হবেন এর লুক্কায়িত বস্তুগুণ। মানুষের জ্ঞান সীমিত, অসম্পূর্ণ ও সামান্য। স্থূলজ্ঞান দিয়ে একটির সঙ্গে আরেকটির তুলনা করে আমাদের জ্ঞান অগ্রসর হয়। স্থূলজ্ঞান এক পাত্রের সঙ্গে অন্য পাত্রের সাযুজ্য নির্ণয়ে অসমর্থ। সুপেয়, মিঠা, লবণাক্ত পানি সবই তো দেখতে এক রকম। যারা মিঠা পানির স্বাদ পেয়েছে, তারা জানে এটি কতখানি স্বাদযুক্ত। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকার নিয়ে যখন কেউ পরকালকে অস্বীকার করে, তখন তাদের একটি যুক্তি, তা হল পরকালকে চোখে দেখা যায় না। পরমাত্মাকে চোখে দেখা যায় না। তাই তাদের মতে যাদেরকে দেখা যায় না, তারা দৃষ্টির বাইরে। স্থূলজ্ঞানসম্পন্ন এ মানুষদের রুমি বর্ণনা করেছেন 'সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত' হিসাবে। 'সংশয়ে' পতিত এরা, অন্ধকার মাটির জীবনই তাদের প্রথম ও শেষ আশ্রয়। তাদের তুলনা করেছেন রুমি এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে যাদের রয়েছে কাঠের বানানো পা। দুর্বল এই পা, বেশি দূর পথ চলা বা দৌড়ান এই পায়ের কর্ম নয়। অসম্পূর্ণ দেহ অলিম্পিক দৌড়ে স্থান নেয় না, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারীরা পান না আত্মার সন্ধান। এত কিছুর খোঁজ তাদের নখদর্পণে, অথচ মস্তিষ্ক-কোটর ও হৃদয়ের কন্দরের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নন তারা।

ছয়

মওলানা জালালউদ্দিন রুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে একজন। পশ্চিমের স্কলাররা তাঁকে বলেছেন, 'মানবতার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি'। তাঁর কবিতার নান্দনিক অনুবাদ তাঁকে আমেরিকা ও ইউরোপে ভক্তদের কাছে নিয়ে এসেছে কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে সাতশ বছর পর তাঁর চর্চা এখনও সমানভাবে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশে। কেন এই লোকপ্রিয়তা? হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বাস করে মানুষের প্রেম, যা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদে প্রবাহিত অন্য পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণ। যদিও নান্দনিকতা খুঁজতে গিয়ে অনেকাংশে শব্দের অর্থ গিয়েছে বদলে, যা মুসলমানদের দৈনন্দিন বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে হারিয়ে গেছে নবী করিমের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রটি। 'পপুলার কালচারে'র এখানেই বিপত্তি। নতুন পাঠক ভাবছেন রুমি মুসলমান হিসেবেই যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং পরে পরিণত হন বৈশ্বিক 'মিস্টিক'-এ,

যা তাঁর ধর্ম থেকে আলাদা। এমনকি তাঁর সম্বন্ধে যে কটি বয়েত পাশ্চাত্যে বহুবার প্রচারিত এবং আমরাও অতীতে অনুবাদকর্মে অংশ নিয়েছি সেগুলোর কয়েকটি তাঁর কাব্যমালঞ্চে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এগুলো হয়তো পারস্যের অন্য কোনো কবি রচনা করেছেন, কিন্তু রুমি নন। যেমন ধরুন এই কবিতাটি : ওহে মুসলিম বন্ধুরা,
তোমাদের কাছে আছে কি উপদেশ, কারণ আমি নিজেকেই নিজে চিনি না
আমি খ্রিস্টানও নই, ইহুদিও নই, নই আমি জরথুস্ট্রিয়ান অথবা মুসলিম
আমি ক্রুশদের দেশ ও খ্রিস্টানদের দেশ পেরিয়ে গেছি, তাঁকে পাইনি
তারপর খুঁজেছি বিভিন্ন মন্দিরে মূর্তির মাঝে, তারপর সেখানে থেকে কাবা ....
আমার নিজের হৃদয়ে খুঁজে দেখি সেখানেই তিনি অধিষ্ঠান করেছেন।

অবশ্যই তাঁর লেখায় এমন কিছু আছে যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। তার মানে এই নয় যে, তিনি সব ধর্মের আবরণীতে আসল ধর্মটির অর্থাৎ ইসলামের মর্মবাণী প্রচারে পিছ-পা হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে গত তাঁর আটশত বছর বার্ষিকীতে যে গবেষণা হয়, তা নিয়ে আলাদা একটি পরিচ্ছেদে আলোচনা চলবে।

মুসল্লিরা মসজিদে যান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পেতে, এতে ভুল নেই। শয়তান তাকে মসজিদে যেতে সহায়তা করে। ভোর বেলা অজু করে মসজিদে, দুপুরে কাজের ফাঁকে মসজিদে, আসরে ভিড় ঠেলে মসজিদে, মাগরিবে, এশায়। আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ দানের তালাশে মানুষের এই অভিযাত্রা। শয়তান পাশাপাশি তাকে ঘুষ খেতেও উপদেশ দেয়। অন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ বজায় রাখার জন্যে তাকে প্রতিনিয়ত অনুশাসনে রাখে, যাতে তার অর্থনৈতিক জীবনে প্রবৃদ্ধি ঘটে। কাজেই সে একদিকে আল্লাহ্‌র কথা শুনে, আবার শয়তানের কথাও শুনে। এখানেই রুমি এসে মানুষকে হেদায়েতের আসল রহস্যটি বুঝিয়ে দেন। কোরানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'এভাবেই আল্লাহ্ গোমরাহ্ করেন তাকে যাকে ইচ্ছা, এবং হেদায়েত দান করেন যাকে চান'। রহস্য ঘনীভূত। সবই যদি আল্লাহ্‌র হাতে তা হলে মানুষ যাবে কোন পথে, কিভাবে হেদায়েত পাবে? রুমি বলছেন :

হযরতে পুর রাহমতাস্ত্ ও পুর করাম্
আমেকে উঁ হাম অজুদ হাম আদম
কুফ্‌র উঁ ইমা আশেকে আঁকব্রিয়া
মিরস নোক্‌রা বান্দায়ে আঁকিমিয়া।

আল্লাহ্‌র দরবার তো রহমতে ভরপুর, সেখানে শুধু দয়া ও দান। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা তার আদেশের অন্তর্গত। এখানে বান্দার আছে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা। সে বিশ্বাস করতে পারে, না-ও করতে পারে। সে ধাবিত হতে পারে ঈমানের দিকে অথবা কুফরের দিকে। মানুষের ইচ্ছার গতি যে দিকে যাবে সে দিকেই প্রবাহিত হবে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য অথবা নাফরমানি। মসজিদে গিয়েও কেউ নাফরমানির দিকেই ধাবিত হতে পারে, আবার না গিয়েও কেউ আল্লাহ্‌র দিকে সূক্ষ্মপথ পেয়ে যেতে

পারবেন। অন্তর্যামী যিনি তাঁর কাছে আছে গায়েবের খবর। তাই শুধু মসজিদে গেলেই চলবে না, মন মসজিদে আছে কিনা, আল্লাহ্র অসীম রহমতের সঙ্গে তার মনের দরিয়া মিলেছে কিনা, এখানেই ফয়সালাটি হয়ে যাবে। আমাদের জাগতিক পরীক্ষায় ফলাফল সবই চক্ষু-কর্ণের সহচর। ভালো লিখলে পরীক্ষায় সাফল্য, পরীক্ষায় ভুল লিখলে নম্বর কম, এটাই জাগতিক পরীক্ষা। কিন্তু বান্দার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়মটি আলাদা। তা হল বান্দার ইচ্ছাশক্তির মধ্যে মসজিদে আসা পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত। তার ইবাদত গৃহীত হবে কিনা তা নির্ভর করছে যাকে ইবাদত করা হচ্ছে তার মর্জির উপর। সারা দিনরাত ইবাদত করলেও লাভ হবে না, যদি আল্লাহ্ রাজি না হন। অথচ আল্লাহ্ রাজি হন কত সহজে। শুধু হৃদয়টিকে তাঁর কাছে মেলে ধরা, বক্রতা নয়, পরিপূর্ণ সমর্পণ। প্রভু তার নেকনজর দিয়ে দেন সেই প্রেমিকের প্রতি। নাফরমানি গোমরাহি মুহূর্তে অন্তর্হিত। কত সহজ এই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দরিয়া। বিন্দুমাত্র সংশয়, সন্দেহ ও জড়বস্তুর প্রতি আগ্রহ বিনষ্ট করে বান্দার ইবাদত।

এখানে এসেছে হযরত মুসা (আ) ও ফেরাউনের কুফরির প্রসঙ্গ। এত সুন্দর উপমা আর কোথাও নেই। কবিতাটি নিম্নরূপ:

মুসা ও ফেরাউন মা নারাহি
যাহেরাঁ রাহ্ দরদ ও ঈঁবেরাহি

মুসা ও ফেরাউন দুজনে একই পথের। যদিও সুস্পষ্টভাবে মুসা পথপ্রাপ্ত ও ফেরাউন পথভ্রষ্ট। মুসা সারা দিন আল্লাহ্র কাছে নিবেদিত হয়ে নিজেকে সমর্পণ করেন। আর ফেরাউন সেই একই কাজ করছে এই কথা বলে, যে : হে খোদা আমি যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করলাম এই ফাঁস কেমন করে আমার গলায় এসে বিঁধল। (আমার মনে হচ্ছে আমার গলার এ ফাঁদ তোমার হুকুমেই তৈরি হয়েছে। আমি নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছি, এটাও তোমারই হুকুমে।)

*যাঁকে মুসা রা মোনাওয়ার কার্দায়ী * মরমোরা যাঁহাম মোকাদ্দার কার্দায়ী*
*খাজা তাশানেম আম্মা তেশাআৎ * মী শেগাফাদ শাখ্‌রা দার বেশাআৎ*
*বায শাখে রা মোয়াচ্ছাল মীকুনাদ * শাখেদীগার রা মোয়াত্তাল মীকুনাদ*
*শাখরা বর তেশাদস্তে হাস্ত ন্যে * হীচে শাকারব দস্তে তেশা রস্তে ন্যে*
*হক্কে আঁ কুদ্‌রতকে আঁ তেশা তোরাস্ত * আয করম কুন্ ঈঁ কজীহা রা তুরাস্ত্।*

মুসাকে আলোকিত করেছ যে হুকুম দিয়ে, সেই হুকুমে হেদায়েতের আলো থেকে মাহরূম করেছ আমাকে। আমাদের উভয়ের মালিক যদিও তুমি, তোমার করাত একটি গাছের ডালের কিছু অংশ কাটে শুধু। অন্য ডালকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। (যেমনভাবে কলম দিয়ে আরেকটি গাছের সৃষ্টি হয় ও অপর ডালটি কেটে দেওয়া হয়) করাতের ওপর নেই ডালের কোনো ক্ষমতা। করাতের কর্তন থেকে ডালের মুক্তি নেই, কখনও নয়। তাই করাতের উসিলা নিয়ে তোমার প্রতি আবদার, আমার বক্রতাকে কর সরল। যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে ফেরাউন বলছে : আমি ঈমান আনলাম,

বিশ্বাস করলাম, কোনো মা'বুদ নেই ঐ মা'বুদ ছাড়া। যার প্রতি বনি ইসরাইলগণ, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম। (১১.১৪)

যারা আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতগামী, আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে অনেক সময় খারাপের দিকে অগ্রসর হন, বলতে থাকেন যে আল্লাহ্র ইচ্ছে হলে আবার ভালো হয়ে যাব। এখানেই বিরাট ভুল সংগঠিত হয়ে থাকে। যখন সময় নিঃশেষিত, বিপথগামীকে সাহায্য করার অবকাশ নেই, যেমনটি ফেরাউনের ক্ষেত্রে। তাকে দেখান হয়েছিল নয়টি বিশেষ মোজেজা, যার সর্বশেষ হযরত মুসার লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ার মোজেজা। জাদু নয়, বরং আল্লাহ্র প্রদত্ত প্রমাণ। এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যারা, তারা উচ্চমানের মুমিন হয়ে গেলেন। ফেরাউন গোমরাহ্। প্রতি রাতে ফেরাউন আল্লাহ্র সকাশে প্রার্থনারত, যখন সে মাটির মতো বিনম্র। মুসার সামনে এলেই তা হয় বিপরীতগামী। যে স্বর্ণ নকল আগুনের কাছে এলে তা কালো হয়ে যায়, তেমনি ছিল ফেরাউনের অবস্থা। হৃদয়ই নয়, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহ্পাকের হুকুমের তাঁবেদার। রসলুল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মানুষের হৃদয়ে একটি মাত্র হৃদয়ের মতো আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মধ্যে আটক, যেভাবে খুশি আল্লাহ্ মানুষের মনকে ঘুরাতে ফিরাতে পারার ক্ষমতা রাখেন'। হুজুর (সা) তখন দোয়া করলেন : হে আল্লাহ্, হৃদয় ঘূর্ণনের মালিক, এই হৃদয়কে তোমার ফর্মাবরদারি ও আনুগত্যের মধ্যে রেখ। হুজুর আরও বলেছেন : 'মানুষের মনের অবস্থা একটি ক্ষুদ্র পালকের মতো। এই পালকটি রয়েছে একটি বিশাল ময়দানে, যেখানে ঘূর্ণি হাওয়ারা তাকে উলটপালট করে দেয়'। মানুষের ইচ্ছার গতি তাকে করে হুকুমবরদার অথবা অপরাধী। মুনাফেকরা শুনছে একই কোরান, অথচ তাদের অবস্থা দেখুন। 'যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তোমাদের কেউ লক্ষ্য করেছ কি? তারপর ফিরে চলে যায়; আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহকে তা হতে ফিরিয়ে দেন, কারণ তারা নিজ কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা এমন সম্প্রদায়, যে সৎপথ গ্রহণ করবে না'। (১১.৫) এ হৃদয় কখনও চাঁদের মতো উজ্জ্বল, কখনও রাতের মতো অন্ধকার, কখনও সবুজ শ্যামল, কখনও শুষ্ক বিশুষ্ক। যখন মন সত্যপথে তখন আল্লাহ্ শুধু বলেন 'কুন', হও। সত্যপথের যাত্রী সে তখন।

প্র ব ন্ধ

ক রু ণা ম য়   গো স্বা মী

বাঙালির গান: চর্যাগীতি থেকে শাক্তগীতি

বাঙালি নিজের গান তো গায়ই, পরের গানও গায়। পরের গান বলতে বোঝাচ্ছি দরবারি গান, হিন্দুস্তানি রাগসঙ্গীত বলে যে গানকে এখন আমরা বোঝাই। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি হচ্ছে রাগসঙ্গীতের প্রধান চারটি রীতি। বাঙালি দুই কারণে হিন্দুস্তানি গান গায়। প্রথম কারণটি হচ্ছে যে, রাগসঙ্গীতের প্রভাবেই বাঙালির নিজস্ব সঙ্গীতের প্রধান যে ধারা, নাগরিক সঙ্গীত যার নাম, সেটি গঠিত এবং দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যে, রাগসঙ্গীতই ভারতবর্ষের সঙ্গীত প্রয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন, বাঙালির চিন্তন, মনন ও রসগ্রহণ এ থেকে আলাদা নয়। রাগসঙ্গীতের নানা ক্ষেত্রে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছেন যাঁরা এ যুগে, তাঁদের অনেকেই বাঙালি।

বাংলা ভাষায় রচিত যে গান, সে গানই বাঙালির একান্ত নিজস্ব গান। এখানে ভাষার প্রশ্নটি মুখ্য, কেননা সঙ্গীত অনেক সময় বাইরে থেকে এসেছে; কিন্তু ভাষাটি ফুটেছে নিজের মুখ থেকে। ভাষায় রচিত গান দুই প্রকার: লোকসঙ্গীত ও নাগরিক সঙ্গীত। লোকসঙ্গীত একান্তই বাংলার আঞ্চলিক গান, নাগরিক সঙ্গীত বাংলা ভাষায় রচিত হলেও হিন্দুস্তানি সঙ্গীত প্রভাবিত। তবে হিন্দুস্তানি সঙ্গীত রীতির প্রভাবে যে বাংলা গান রচিত হয়েছে, তাতে হিন্দুস্তানি গানের মেজাজ গেছে পাল্টে, যাওয়ারই কথা, প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব প্রকাশরীতি আছে, প্রতিটি সমাজের একটি নিজস্ব মেজাজ আছে। বাইরের সঙ্গে তার যোগ যত গভীরই থাকুক, উপস্থাপন রীতিতে সেই মেজাজটি প্রকাশ পায়। বাংলা গানের ভেতর দিয়ে বাঙালির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। একই রাগসঙ্গীত অঞ্চলের আধিবাসী হলেও, বাঙালির প্রাণাবেগ পাঞ্জাবির প্রাণাবেগ থেকে পৃথক। সেটিই প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির নাগরিক গানে।

নাগরিক গানই বাঙালির প্রধান গান। এটিকেই বলব মূলধারা। লোকসঙ্গীত আবহমান গান, বাংলার প্রাণের গান, সরল-সহজ অভিব্যক্তিতে ভরা সঙ্গীতরীতি। বাউলের মতো, একাধিক কীর্তন রীতির মতো গান লোকসঙ্গীতের ধারায় আমরা পেয়েছি। সেসব রীতি বাংলা নাগরিক গানকেও প্রভাবিত করেছে। করবেই, কেননা, বাংলার গ্রাম ও নগর এমন বিচ্ছিন্ন জনপদ নয় যে, একের গানের সঙ্গে অন্যের গানের

যোগাযোগ থাকবে না। গ্রামের গান নগরের গানকে প্রভাবিত করবে, নগরের গান গ্রামের গানকে প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক, এমনি হয়েছে কালে কালে। কিন্তু নানা কারণে গ্রামের গান থিতিয়ে গেছে। গ্রামীণ জীবন এখন চেয়ে আছে নগরের দিকে, গ্রামের মানুষ ধেয়ে আসছে নগরের দিকে রোজগারের সন্ধানে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চলে গেছে, টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের নানা চ্যানেল। এসব লাবণ্যে ও কৌশলে ভরা আয়োজনের তুলনায় গ্রামের সরল-সহজ আয়োজনকে মনে হচ্ছে জলো। আকাশ-সংস্কৃতি সবকিছু গ্রাস করছে, বেশি করে গিলে ফেলছে গ্রামের গানকে, টিকে যা আছে সে হচ্ছে বাংলা নাগরিক সঙ্গীত, সেটিই বাঙালির গানের মূলধারা। বাঙালির সংস্কৃতির সজীব ও বৈশিষ্ট্যময় ধারাও বটে। কেননা, সাহিত্যে বা চিত্রকলায় বাঙালির ওপর পৃথিবীর প্রভাব রয়েছে। সেসব মাধ্যমে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে বিশ্বনাগরিক হিসেবে। সাফল্য কার ক্ষেত্রে কতটুকু এসেছে সে বিচারের বিষয়। কিন্তু গানে বাঙালি একেবারেই বাঙালি। বিদেশি প্রভাব কেউ কেউ কাজে লাগাতে চেয়েছেন, তাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সম্ভব হয়নি। ভেতো বাঙালি বলে একটা প্রবাদ আছে, ভাত খাওয়াতেই বাঙালির প্রধান পরিচয় নয়। জগতে আরো কত ভেতো সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু বাঙালির প্রাণ তার গানে, গানেই বাঙালির প্রধান পরিচয়।

চর্যাগীতি

বাংলা ভাষা ও বাংলা গানের বিকাশ একই সঙ্গে। যাকে আমি নাগরিক গান বা বাংলা গানের মূলধারা বলছি, তারও সূচনা একই সঙ্গে। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম রচনা এক শ্রেণীর গান। এর নাম চর্যাগীতি। বাংলা গানের মূলধারার সূচনা চর্যাগীতি দিয়েই। সে থেকে বাংলা নাগরিক গানের বিকাশের রূপরেখাটির উল্লেখ করা যেতে পারে: চর্যাগীতি-গীতগোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বৈষ্ণবপদাবলী-শাক্তপদসঙ্গীত-টপ্পা-ধ্রুপদ-খেয়াল-ব্রহ্মসঙ্গীত-দেশাত্মবোধক গান-প্রীতিনীতি-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-রজনীকান্ত সেন-অতুলপ্রসাদ সেন-কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল সাময়িক ও আধুনিক গান-গণসঙ্গীত-পশ্চিম বাংলার গান ও বাংলাদেশের গান।

বাংলা গানের মূলধারাকে আমরা দূর অতীতে নিয়ে যাচ্ছি। তখন কিন্তু এখনকার অর্থে নগর গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে, সে গানকে নাগরিক গানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় কীভাবে। এই ভাবটি হচ্ছে ফর্মের রীতির। নাগরিক গান যে রাগসঙ্গীত রীতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করেছে, তার সূচনা দূর অতীতে চর্যাগীতি দিয়েই। নগর না থাকলেও নগরের গানের পটভূমিটি গড়ে উঠেছে।

চর্যা একটি সর্বভারতীয় রাগসঙ্গীত। সে সময় এমন গানকে বলা হত প্রবন্ধ সঙ্গীত। অর্থাৎ বিশেষ নিয়ম-কানুন মেনে রচিত গান। বাংলা ভাষায় চর্যাগান রচিত হয় ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অনেকের ধারণা, নবম শতাব্দী থেকেই বাংলা

ভাষায় চর্যা রচিত হয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে, নবম শতক থেকেই বাংলা নাগরিক গানের সূচনা, সে কথাটি জানা গেছে প্রায় একশ' বছর আগে। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার থেকে তিনটি পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেই তিনটি পুঁথি একত্রে সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। নাম দেন 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'। বৌদ্ধ গান এজন্য যে, গানের বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্মোক্ত যোগাচার। যোগ সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ লাভ। গীত রচয়িতারা বৌদ্ধ সন্ত। এঁদের বলা হয় সিদ্ধাচার্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সূচনায় বাংলা গান বা বৃহদর্থে বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধ বিষয়কেন্দ্রিক ছিল। বাংলা ভাষারও বিকাশ ঘটে বৌদ্ধ বিষয়কে অবলম্বন করে। প্রাচীন সঙ্গীতালোচনা গ্রন্থে, চর্যাগান সম্পর্কে আলোচনা আছে। সে থেকে এই গান কীভাবে গাওয়া হত সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। তবে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে–এই গান রাগসঙ্গীত, চর্যাপ্রবন্ধ সঙ্গীত হিসেবে এর উল্লেখ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যা সঙ্কলনে তালের উল্লেখ নেই, মূল পাণ্ডুলিপিতে ভুলবশত তালের নাম দেয়া হয় নি বলে। একটি গানের পাদটীকায় তালনাম লেখা আছে। তাতে মনে হয় যে, উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপি আদি লেখক ভুলবশত তালনাম বাদ দিয়েছেন। কেননা সঙ্গীতালোচনা গ্রন্থে চর্যাগান গাইবার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে গান যে তালে গাওয়া হত তাতে কোনো সংশয় থাকে না। তাল সাধারণত সমছন্দ হত। অর্থাৎ ২/২, ৩/৩ এমন হত তালের চলন। চর্যা এককভাবেও গাওয়া হত, মিলিতভাবেও গাওয়া হত। গানের পদ হত ছোট, অনেকটা সনেটের মতো। গানের শেষে থাকত ভণিতা, অর্থাৎ বাইরের অর্থ হত এক রকম, কিন্তু মূল বিষয় হিসেবে বোঝানো হত অন্য কিছু। এটি গান বা কবিতা রচনার একটি ধারা। যা বলার তা সোজা বলা হচ্ছে না, আপাতের আড়ালে মূল অর্থকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। সেটিকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। প্রায় তিনশ বছর ধরে বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে বৌদ্ধ গানের যুগ অতিবাহিত হল।

গীতগোবিন্দ

সেই বৌদ্ধ গীতযুগের অবসান ঘোষণা করলেন বৈষ্ণব কবি জয়দেব। বাংলা গানের মূলধারায় এবার শুরু হল আরেক অধ্যায়, রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী নিয়ে গান রচনার পালা। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের জন্ম। তিনি দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। তাঁর গীতসঙ্কলন গ্রন্থের নাম 'গীতগোবিন্দ'। অর্থাৎ গোবিন্দ বা কৃষ্ণ বিষয়ক গান। মোট চব্বিশটি গানের সঙ্কলন গীতগোবিন্দ। সংখ্যায় কম হলেও প্রভাবে এই চব্বিশটি গান হয়ে দাঁড়ায় অসামান্য। বাংলা গানের ধারা থেকে এই গান বৌদ্ধ গানকে তো উচ্ছিন্ন করল, বরং পরবর্তী বহু শত বছরের জন্য রচনা করল এক নতুন পটভূমি। এই পটভূমিতে সূচনা

থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্তই থাকল রাধা-কৃষ্ণ কথা, মাঝখানে এসে যুক্ত হল চৈতন্যের জীবনকাহিনী।

গীতগোবিন্দের গানকে বলা হয় ধ্রুবপদ সঙ্গীত। এ কিন্তু ধ্রুপদ নয়। ধ্রুবপদ চর্যার মতোই এক প্রকার প্রবন্ধ গান। গাইবার বিশেষ নিয়ম ছিল, তবে নিয়মগুলো কী সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু জানা যায় না। প্রতিটি গানের ওপরে জয়দেব রাগ ও তালের নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন। সে সময়কার অনেক রাগ ও তাল এখনো প্রচলিত। সঙ্গীত গ্রন্থে ধ্রুবপদ সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়া আছে তাতে মনে হয়, গানের প্রারম্ভে আলাপ থাকত, ঢিলে-লয়ে গান শুরু হত এবং পরে লয় পরিবর্তন করে দ্রুত করা হত। এখানে উল্লেখ করা ভালো যে, পদ্মাবতীই বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃত্যশিল্পী। জয়দেব নিজে উচ্চাঙ্গের সুরকার, গায়ক ও নৃত্য প্রশিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন পদ্মাবতীর নৃত্য প্রশিক্ষক, গীতগোবিন্দের গানের সুরকার, গায়ক ও প্রচারক। গীতগোবিন্দের গান বাংলায় রচিত নয়, অতি সরল সংস্কৃতে জয়দেব এই গান রচনা করেন। ভাষাসারল্যে ও লালিত্যে এবং সুরমাধুর্যে এই গান বিপুল সমাদর পায়। প্রথমদিকে জয়দেবের সুর ও তাল অনুসরণে গীতগোবিন্দের গান গাওয়া হলেও পরবর্তীকালে এতে কীর্তনের সুরোরোপ করা হয় এবং কীর্তনীয়াগণ জয়দেবের পদকে আরো জনপ্রিয় করে তোলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

জয়দেবের পরই বাংলা গানের মূলধারায় আবির্ভূত হন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁর রচিত অসামান্য গীত গ্রন্থটির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকবে বলে ধারণা। বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁরই সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ওপর গীতগোবিন্দের প্রভাব বিপুল। জয়দেব বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীকেই বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর বর্ণনার বিষয় করেছেন। জয়দেবের মতোই বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি খণ্ডের নামও দিয়েছেন তেমনিভাবে। গীতগোবিন্দে প্রধান চরিত্র তিনটি: রাধা, কৃষ্ণ ও সুখী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুখ্য চরিত্র তিনটি: রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। গীতগোবিন্দে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। জয়দেবের সঙ্গীত-আদর্শও রক্ষা করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। কয়েকটি গান মিলিয়ে তিনি এক-একটি খণ্ড গঠন করেছেন, প্রতিটি গানকেই রাগে ও তালে নিবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি খণ্ড একটি পালার মতো। কয়েকটি গান নিয়ে একটি পালা। এতে তিন চরিত্রের কথাবার্তা আছে, কবির বর্ণনা আছে। নাটকের মতো গেয়ে-নেচে অভিনয় করে উপস্থাপিত করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাস করতেনও তাই। তিনি ছিলেন

এক মন্দিরের সেবাইত। কাজের ফাঁকেই তিনি তাঁর দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পালা উপস্থাপনের জন্য। জয়দেব ছিলেন রাজসভার কবি ও সঙ্গীতরচয়িতা। বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন সাধারণ মানুষের পালাকার। ফলে তাঁকে গীতরচনা, সঙ্গীত রচনা, উপস্থাপন রীতি সবকিছুই নির্ধারণ করতে হত সাধারণ মানুষের রুচি ও বুদ্ধির নিরিখে। জয়দেবের প্রভাব ছিল তাঁর ওপর, কিন্তু সে প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠে জনকবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, তিনিই প্রথম বাংলার আঞ্চলিক গীত - ঢঙকে মার্জিত আকারে তাঁর রচনায় স্থান দেন। এসব নানা বিবেচনায় বাংলা গান ও সাহিত্যের ইতিহাসে বড়ু চণ্ডীদাসের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দ থেকে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করলেও, তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালির পরবর্তীকালের বহু অর্জনের উৎসস্বরূপ।

পদাবলী কীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরই শুরু হয় বাংলা গানের এক সোনালি যুগ। সে যুগ পদাবলী কীর্তনের। বলা হয়ে থাকে যে, ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ইতিহাসে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ দান পদাবলী কীর্তন। এই গানের পদ্ধতি রচনায়, সুর গঠনে, তাল নির্মাণে বাঙালি রচয়িতারা অভাবনীয় সৃজনক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বহু পদাবলী কীর্তনের যে কাব্যগুণ সে প্রায় তুলনারহিত। পদ বলতে বোঝায় গান। এখানে রাধা-কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক গানকে বিশেষ অর্থে বলা হচ্ছে পদ। অনেক পদ, এই অর্থে পদাবলী। বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা রচিত পদ, এই অর্থে বৈষ্ণব পদাবলী। পদ রচয়িতাদের পদকর্তা, মহাজন প্রভৃতি বিশেষণেও আখ্যায়িত করা হত। এই পদকর্তাদের অধিকাংশই হিন্দু, তবে অনেক মুসলমান কবিও বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলীকে মহাজন পদাবলীও বলা হয়। জয়দেবই আদি পদকর্তা। তাঁর গীতগোবিন্দ আদি পদগ্রন্থ। সে হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। পরবর্তীকালে উভয়ের অনুসরণে বাংলায় বৈষ্ণব পদরচনার বিপুল উচ্ছ্বাস। তবে বৈষ্ণব পদ রচনায় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগের কবি বিদ্যাপতিকেও পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হবে। তিনি ব্রজবুলি নামে এক প্রকার লালিত্যময় ভাষায় পদ রচনা করেন। তাঁর এই ভাষাকেও বহুল ব্যবহার করা হয়।

শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) পূর্বেই কীর্তনের সূচনা। কিন্তু তাঁকেই বলা হয় পদাবলীর জনক। তিনি যে বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন শুরু করেন তার প্রধান বাহন ছিল পদগান। তিনি নিজে গাইতেন ও অপরকে গাইতে শেখাতেন। ধর্মভাবনা ও আপন কর্ম দ্বারা চৈতন্য যে এ বিষয়ে যে ব্যাপক প্রেরণা সৃষ্টি করেন, তাই তাঁর সমকালে ও পরবর্তীকালে শত সহস্র গান রচনায় বাস্তব রূপ লাভ করে।

তবে চৈতন্যের সমকালেও কীর্তন গাইবার কোনো বিশিষ্ট ঢঙ গড়ে ওঠেনি। গীতগোবিন্দের গান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান ও বিদ্যাপতির গানের প্রভাবে এক ধরনের

গীতঢঙ চালু হয়েছিল। সেভাবেই চলছিল। কিন্তু রাজশাহীর পদকর্তা নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩১-১৫৮৭) ভাবলেন যে এই সঙ্গীত রচনার নিজস্ব একটি রীতি থাকা দরকার। পূর্ববর্তী সঙ্গীতরচয়িতাদের প্রভাব থাকলেও, পদাবলীর ঢঙ নতুন হবে, নব গান সঙ্গীতে গীত হবে। নরোত্তম স্বয়ং ধ্রুপদে প্রশিক্ষিত ছিলেন। তিনি চলতি কীর্তনের চালকে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ঢঙের সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন রীতি রচনা করলেন। তাঁর এই উদ্ভাবনাটি কেমন, বৈষ্ণব সমাজ এ নিয়ে কী ভাবলেন তার মীমাংসা করার জন্য ১৫৮৪ সালে নিজ গ্রাম খেতরিতে তিনি এক বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। সমাগত বিজ্ঞ বৈষ্ণবজন নরোত্তমের সঙ্গীত পদ্ধতি অনুমোদন করেন। নরোত্তম পালা বাঁধবার ও উপস্থাপনা করার রীতিটিও সবাইকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেন। তখন থেকে, বলা চলে, কীর্তনের একটি যথার্থ সাঙ্গীতিক পটভূমি রচিত হল। তা আর প্রাচীন প্রবন্ধ গানের সীমায় আবদ্ধ থাকলো না। নরোত্তমের দৃষ্টান্তে পদাবলী কীর্তন গাইবার আরো কয়েকটি রীতি গড়ে উঠল কালক্রমে। রীতিগুলো নাম হচ্ছে : গড়ানহাটি, মনোহরশাহি, রেনেটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী।

নরোত্তমের কীর্তনরীতির নাম গড়ানহাটি। তিনি গড়েরহাটি পরগনার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর উদ্ভাবিত কীর্তনরীতির নাম হয় গড়ানহাটি। খেতরি উৎসব থেকে ফিরে বীরভূমের মনোহরশাহি পরগনার কান্দারা গ্রামের কীর্তনীয়া জ্ঞানদাস গড়ানহাটি কীর্তন থেকে একটু সহজ এক গায়নরীতি উদ্ভাবন করেন। এর নাম হয় মনোহরশাহি কীর্তন। বর্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রামের বিপ্রদাস মনোহরশাহি কীর্তনের চেয়ে আরো একটু সহজ গায়নরীতি উদ্ভাবন করলে তার নাম হয় রেনেটি। দেবীপুর রানীহাটি পরগনায় অন্তর্গত ছিল। রানীহাটি থেকে রেনেটি । এই তিনটি কীর্তনরীতির আদর্শ ছিল রাগসঙ্গীত। রাঢ় অঞ্চলে সরকার মন্দারণ নামক স্থানের কীর্তনীয়াগণ পূর্ববর্তী রীতিগুলোর সঙ্গে পাঁচালী শ্রেণীর সুর মিশিয়ে নতুন এক ধারার সৃষ্টি করেন। এর নাম হয় মন্দারিণী। আরো পরে ঝাড়খণ্ড পরগনায় রচিত হয় ঝাড়খণ্ডী কীর্তনকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করেন। দেখা যাচ্ছে সুরে ও তালে কীর্তন ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে। সে তো হতেই হবে। কীর্তন আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সবাই গান করুক। এ গান জনসঙ্গীতের রূপ নিক। নরোত্তম যে গুরুগম্ভীর জটিল সঙ্গীতরীতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনসাধারণের স্তরে তাকে নিয়ে আসার জন্য ধারাবাহিকভাবে এই সহজীকরণের চেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাতে ফলও হয়েছিল চমৎকার। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালির উদ্ভাবনী ক্ষমতা কীর্তনকে কেন্দ্র করেই সর্বাধিক বিকাশ লাভ করে। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা গানের মূল ধারা কীর্তনসঙ্গীত দ্বারাই প্রভাবিত থাকে। পদাবলী কীর্তনের বিকাশকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয় : প্রাক্ চৈতন্য যুগ, চৈতন্য সমসাময়িক যুগ, চৈতন্য অব্যবহিত-পরবর্তী যুগ ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগ। প্রথম যুগের পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রমুখ । দ্বিতীয় যুগের পদকর্তাদের মধ্যে

রয়েছেন রায় রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, শ্রীরূপ গোস্বামী, রামানন্দ দাস প্রমুখ। তৃতীয় যুগের পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রায় শেখর, জ্ঞানদাস, লোচন দাস, বৃন্দাবন দাস, নরোত্তম দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, নরহরি চক্রবর্তী, মনোহর দাস, ঘনরাম প্রমুখ। সপ্তদশ শতক থেকেই পদাবলীসঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। রাম গোপাল দাস কৃত সঙ্কলন 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' প্রথম পদাবলী সঙ্কলনরূপে কথিত হয়। সর্বশেষ বিখ্যাত পদাবলী-সঙ্কলন 'বৈষ্ণব পদাবলী'। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ১৯৮০ সালে প্রকাশিত এই সঙ্কলনে মোট ৩৭৫৬টি পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মুদ্রিত আকারে এ যাবৎ প্রায় ৬০০০ বৈষ্ণবপদ পাওয়া গেছে। প্রায় ৬০০০ পদ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। কতো পদ যে সংরক্ষণের অভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

মঙ্গল গান

বাংলা গানের মূল ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না থাকলেও মঙ্গল গান নামক এক প্রকার কাহিনী গানের উল্লেখ প্রয়োজন। চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিপুলসংখ্যক আলেখ্য গীতি বা কাহিনী গান রচিত হয়। এই গান প্রধানত শাক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক। এদের নাম

মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গল গান। মঙ্গল নাম কেন হল, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। দেবদেবীর মাহাত্ম্য পঠনে, শ্রবণে ও কীর্তনে মঙ্গল হয়। এই বোধ থেকে মঙ্গল নাম হতে পারে। প্রাচীনকালে মঙ্গল বা মঙ্গলাচার নামে এক প্রকার প্রবন্ধ গান ছিল। এই গানের অনুসরণে রচিত হয়ে থাকবে বলেও এ গানের নাম মঙ্গল গান হতে পারে। মঙ্গল গানের উল্লেখযোগ্য শাখা তিনটি : মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে মঙ্গল গানের যুগ শেষ হয়ে আসলে এই গানের মূল বক্তব্য অবলম্বনেই রচিত বাংলা শাক্ত পদসঙ্গীতের ধারা। বাংলা গানের প্রধান প্রবাহে শাক্তগীতির ধারাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মঙ্গল গানের প্রবাহ ভারতচন্দ্র রায়ে (১৭১২-১৭৬০) এসে কার্যত স্তিমিত হয়ে পড়ে। সারা উনিশ শতকে এবং পরবর্তীকালেও শাক্তগীতির বিপুল বিকাশ ঘটে। ব্যাপার হচ্ছে যে, দীর্ঘ প্রচলনের ফলে পদাবলী কীর্তন শ্রোতাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকছিল। মানুষ চাইছিল নতুন গান, বিষয়ে ও সঙ্গীতে।

শাক্তগীতি

সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়েই এগিয়ে আসলেন রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) শাক্তগীতির নতুন পর্ব রচনায়। বাংলা নাগরিক গানের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটল। শাক্তগীতি বলতে বুঝি দেবী কালী ও দুর্গা বিষয়ক গান। এর মধ্যে কালী বিষয়ক গানই বেশি। কালীর অপর নাম শ্যামা। কালী বিষয়ক গান আগমনী বা উমা সঙ্গীত নামে খ্যাত। রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী উভয় ধারারই সূচনাকারী। পদাবলী কীর্তনের মূল বিষয় ছিল প্রকৃতি ও পুরুষ বা নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে গান রচনা করা। শাক্তসঙ্গীতে বিষয় হয়ে দাঁড়াল মা ও সন্তানের সম্পর্ক। শ্যামাসঙ্গীতে কালী দেখা দিলেন মাতৃরূপে। রামপ্রসাদ বা পরবর্তী রচয়িতারা সন্তানের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। গানের ভেতর দিয়ে মায়ের কাছে সন্তানের কত যে আবেদন-নিবেদন, তার ইয়ত্তা নেই। মৃত্যুর পর তিনিই যেন কোলে করে পরপারে নিয়ে যান এ কামনাও ব্যক্ত করা হয়েছে অনেক। তবে বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯১-১৯৭৬) বেশ কয়েকটি বীররসাত্মক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন।

রামপ্রসাদ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর অনেক গানের ওপরে রাগ ও তালের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে আজকাল যেভাবে সেসব গান গাওয়া হয় তাতে সংশয় জাগে আদৌ এভাবে সুরারোপ করা হয়েছিল কিনা। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত প্রসাদী সুর আজো অবিকল প্রচলিত রয়েছে। রাগসুরের সঙ্গে বাউল মিশিয়ে রামপ্রসাদ একটি আকর্ষণীয় সুর-ঢং নির্মাণ করেছিলেন। একেই প্রসাদী সুর বলা হয়েছে। একক সুর ঢং হিসেবে এটিই বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনা। পরবর্তীকালে এই সুরে শত শত শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীত অন্য ধরনেরও অনেক গান রচিত হয়েছে। দেশাত্মবোধক গানেও প্রসাদী সুর ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ শতকের প্রথমদিকে এসে রাগ-সুরের সঙ্গে বাউল-কীর্তন মেশানোর একটি রীতি গড়ে ওঠে। এর সূচনা করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শারদীয় দুর্গাপূজাকে পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার কন্যা উমার মা-বাবার বাড়ি আসার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বলা হয় দেবীর আগমন। এই আগমন বিষয়ক গান আগমনী। রামপ্রসাদ এই গীতিধারারও প্রবর্তক। মেয়ে বছরের শেষে মায়ের কাছে আসছে, এই ভাবটুকু নিয়েই আগমনী গান রচিত।

মাতা-কন্যা সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তীকালে শ্যামাসঙ্গীতের চেয়ে কম হলেও বহু আগমনী গান রচিত হয়েছে। আগমনী গানে বীররসের ব্যঞ্জনা যুক্ত করেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

রামপ্রসাদ সেনের পর শাক্তগীতির ধারাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান ব্যক্তিটি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১)। গীতরচয়িতা, সুরকার ও গায়ক হিসেবে তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শাক্তগীতির যে পটভূমিটি তৈরি করেন, তা পরবর্তী সঙ্গীতরচয়িতাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়। এই পটভূমিতেই কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত অসংখ্য বাঙালি গীতিকবি নানা সঙ্গীতরীতিতে শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী গান রচনা করেন।

রে হ নু মা আ হ মে দ

....

তথ্যযুদ্ধ: হিথরো বিমানবন্দর ও ‘প্রাচ্য অধ্যয়ন’

‘প্রাচ্য অধ্যয়ন’ নামক বুকশেল্ফের একাংশের ক্লোজ-আপ, হিথরো বিমানবন্দর, নভেম্বর ২০০৪

ভ্রন ওয়ের ব্রিটিশ নারীবাদী। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত *বিয়ন্ড দ্য পেইল : হোয়াইট উইমেন রেসিজম অ্যান্ড হিস্ট্রি* বইয়ের কারণে খ্যাতি লাভ করেন। কাজটি পথপ্রদর্শক। বর্ণবাদের ইতিহাসে শ্বেতাঙ্গ নারীর চিন্তার তাৎপর্য কী ছিল, তিনি তা নিরীক্ষণ করেন। বইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে দুটো বিষয় : (ক) শ্বেতাঙ্গ নারীত্ব। ওয়েরের দৃষ্টিতে হোয়াইটনেস (whiteness) আপসে-ঘটে-যাওয়া কোনো কিছু নয়। তার আর্গুমেন্ট হচ্ছে, এটি ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত একটি ক্যাটেগরি। বইয়ের শুরুতে তিনি জেইন ফ্ল্যাক্স-এর কিছু কথা উদ্ধৃত করেন। ফ্ল্যাক্স বলেন, (পশ্চিমা) সমাজ বর্ণবাদী। এ সমাজে বসবাসের অভিজ্ঞতা লিঙ্গীয় সম্পর্ক, নিজ সত্তা, এমনকি তত্ত্বকেও বর্ণবাদী আঙ্গিকে গঠন করে। কিন্তু খুব সামান্য হাতে-গোনা সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ নারীবাদী এটি বোঝা জরুরি মনে করেন। ওয়েরের কথা হচ্ছে, বর্ণবাদ এবং পুরুষ-প্রাবল্য দুটোই

সামাজিক বৈষম্যের ব্যবস্থা, আর এ কারণে *শ্বেতাঙ্গ* হওয়া ও *নারী* হওয়ার অর্থ হচ্ছে সামাজিক বর্গে বসবাস করা। 'সামাজিক' হওয়ার কারণে এর থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। ওয়ের তার কাজে শ্বেতাঙ্গ নারী হওয়ার (being a white woman) অর্থ কী, তা অনুসন্ধান করেননি, বরং তিনি *শ্বেতাঙ্গ নারী হিসেবে ভাবা হয়* (নবরহম thought of as a white woman)-এর অর্থ কী, তা অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ, তার নিরীক্ষণের বিষয় হচ্ছে শ্বেতাঙ্গতা বা হোয়াইটনেস সংক্রান্ত চিন্তা ও মতাদর্শ এবং এর বিকাশ। ওয়েরের দৃষ্টিতে শ্বেতাঙ্গতা (বা, বর্ণবাদ) জৈবিক কোনো বিষয় নয়। এটি সামাজিক। এর উৎপত্তি ঘটে বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্যের কারণে। ওয়ের বলেন, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ একটি মতাদর্শিক ফ্রেমওয়ার্ক, এই ফ্রেমওয়ার্ক মতে কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ ভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ফ্রেমওয়ার্ক মতে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ পার্থক্য প্রাকৃতিক, জৈবিক, এবং এই কারণে, অপরিবর্তনীয়। (খ) বর্ণবাদী সমাজে নারীবাদ কীভাবে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এটি ওয়েরের নিরীক্ষণের অপর বিষয়। এই জিজ্ঞাসার আলোকে তিনি বইয়ের ঐতিহাসিক অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতকের রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করেন। এই অঞ্চলের নারী হিসেবে এই অধ্যায়ের গুরুত্ব আমাদের জন্য ভিন্ন। তার কারণ, এক'শ বছর আগের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন ইংরেজ নারী (এ্যানেট্ এ্যাকরয়ড, জোসেফিন বাটলার) ভারতীয় নারীর মুখোমুখি হন, তা অনুসন্ধান করেন তিনি। ভারতীয় নারীর সাথে সাংস্কৃতিক পার্থক্য কীভাবে ইংরেজ নারীরা সামাল দিয়েছিলেন, তা বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। মনে হতে পারে এক'শ বছর আগের জিজ্ঞাসাগুলো এখন বহুদূরের ফেলে আসা অতীত। কিন্তু ওয়ের বলেন, বাস্তবে সেগুলো এখনো বর্তমান।

সাম্প্রতিককালে তিনি লিখেছেন "ইনফো-ওয়ার অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অফ ফেমিনিস্ট কিউরিওসিটি" নামক প্রবন্ধ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই প্রবন্ধে ওয়েরের একটি বক্তব্য হচ্ছে, প্রাচ্য নারীর অধীনতা শুধু পশ্চিমা সরকারের প্রচারযন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত হয় না, বরং এটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনকও। ওয়ের বলেন, সমকালীন খ্রিস্টান জগতে ইসলাম ধর্মের উল্লেখ ভয় জাগিয়ে তোলে। মিডিয়ার বৈরীভাব, ছকে-বাঁধা প্রতিবেদন ছাড়া অধিকাংশ পাঠক ইসলাম সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানেন না। তিনি বলেন, ২০০১ সালের আগেই রাজনৈতিক ইসলাম[১] পশ্চিমা দেশে বিদ্যমান বর্ণবাদকে উসকে দেয়। এ পরিস্থিতিতে মুসলমান অভিবাসীদের প্রতি সহনশীলতার অভাব এবং সহিংসতা নতুন মাত্রায় দেখা দেয়। মধ্যপ্রাচ্য সন্ত্রাসের কারখানা ছাড়া কিছু নয়, জনমনে এটি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সর্বোপরি, ওয়ের বলেন, মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে শত ভিন্নতা সত্ত্বেও পশ্চিমে প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা হচ্ছে, সব মুসলমান দেশ সনাতনী, তারা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তারা আধুনিকতার বিপরীত ও বিরুদ্ধ শক্তি। সাধারণ বাতচিতে নারী অধিকার, নারীর

যৌনতা বারেবারে উল্লিখিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে শ্বেতাঙ্গ শাসনকে বৈধ করে তোলার যে যুক্তি 'নারীর অবস্থা শোচনীয়', 'পিছিয়ে-পড়া নারীকে উদ্ধার করতে হবে', 'ঈশ্বর এ কারণেই আমাদের মর্ত্যে পাঠিয়েছেন' তা বর্তমান জমানার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পক্ষে অনায়াস যুক্তি হিসেবে হাজির হয়। মন্দ লোকেরা মন্দ, কারণ তারা তাদের নারীদের নিপীড়ন করে, আধুনিক এই যুগে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ছাড়া সভ্য দেশ আর কী-ই বা করতে পারে? যুক্তিগুলো এভাবে উপস্থাপিত হয় এবং সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

ওয়ের বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি নারীবাদীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে : পশ্চিমা নারীবাদীদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বাইরে প্রাচ্যের নারীর সাথে সংহতির বন্ধন গড়ে তোলার পথ আবিষ্কার করা। আর অপরদিকে, প্রাচ্যের নারী আন্দোলনকারীদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তারা পশ্চিমা চক্রান্তের শিকার নন কিংবা তাদের দালাল নন, নিজ দেশে এই ডিসকোর্সের ফাঁদে যাতে না পড়ে, তার পথ আবিষ্কার করা।

যুদ্ধের তথ্যগত ও জ্ঞানগত দিকও রয়েছে, আর এই ছোট্ট লেখায় আমি ওয়েরের আলোচনার এই অংশের দু'টো দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। ওয়ের বলেন, যুদ্ধের এই ডাইমেনশান তাঁর চোখে ধরা পড়ে যখন তিনি হিথরো বিমানবন্দরের কোনো-এক দোকানে একটি বইয়ের সন্ধান করেন। তিনি দেখেন যে বুক শেল্ফের একাংশের নামকরণ করা হয়েছে, 'প্রাচ্য অধ্যয়ন' (ইস্টার্ন স্টাডিজ)। অধিকাংশ বই তুরস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত দেশের নারীদের লেখা। বেশির ভাগ বই আত্মজীবনী ঢং-এ লেখা, সারভাইভার-এর জবানবন্দি স্টাইলে বা পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে পালিয়ে আসা কথনের ঢং-এ। বইগুলোর প্রচ্ছদে রয়েছে নারীর ছবি। এই নারী নিঃসন্দেহে এক্সোটিক, অন্য, ভিন্ন, অপর। প্রায়-সব প্রচ্ছদে, নারীর মুখমণ্ডল অল্প কিংবা অনেক বেশি পর্দা-আবৃত। ওয়ের বলেন, একটি ব্যতিক্রমী প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে গহনা-আবৃত বুকের ভাঁজের ছবি।

বই ১ : আস্‌নে সেইয়েরস্টাড, *দ্য বুকসেলার অফ কাবুল* (২০০৩)

বইটি লিখেছেন নরওয়ের সবচাইতে পরিচিত যুদ্ধ-সাংবাদিক আস্‌নে সেইয়েরস্টাড। তালেবানদের সাথে নর্দান অ্যালায়েন্সের যুদ্ধ চলাকালে সেইয়েরস্টাড ছিলেন অ্যালায়েন্সের পদাতিক সৈনিকদের সাথে। ৬ সপ্তাহ জীর্ণ পথ চলার পর তিনি কাবুল পৌঁছান। তালেবানরা তখন কাবুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন কেমন, সেইয়েরস্টাড-এর সংকল্প ছিল তা পর্যবেক্ষণ করা, তা নিয়ে বই লেখা। এসময় তাঁর পরিচয় ঘটে একজন আফগান বই-বিক্রেতার

সাথে। বই-বিক্রেতা ভদ্রলোক চমৎকারভাবে গল্প বলেন। খুব অতিথিপরায়ণ। তার গৃহস্থালি সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন দুজন স্ত্রী, পাঁচ সন্তান, বেশ ক'জন আত্মীয়স্বজন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে সেইয়েরস্টাড তাদের সাথে থাকা শুরু করেন। তাদের "ভিতরের" জীবন কেমন তা নিয়ে বই লেখা শুরু করেন। ওয়ের বলেন, সেইয়েরস্টাডের লেখার এই প্রচেষ্টায় সম্প্রসারিত হয় তার মারাত্মক প্রাচ্যবাদী দৃষ্টি[২]। এই দৃষ্টি কুখ্যাত বোরখা ভেদ করে। এটি অনায়াসে আফগান নিমন্ত্রণকর্তার মাথার "ভিতর" প্রবেশ করে। সেইয়েরস্টাড লিখেছেন : "আমি অতিথি ছিলাম, কিন্তু খুব শিগগিরই মনে হলো আমি তাদের বাড়ির একজন। আমার সাথে সাংঘাতিক ভালো ব্যবহার করেছে তারা, তাদের মনটা খুব বড়ো, উদার। খুব ভালো সময়ও কেটেছে, কিন্ত খান পরিবারের সাথে থাকাকালে আমার যতবার রাগ হয়েছে, আমি যতবার ঝগড়া করেছি, তা আমার জীবনে আর কখনো ঘটে নি। আর কখনো এত প্রবলভাবে রেগে কাউকে মারতে ইচ্ছে করেনি। একই জিনিস বারেবারে আমাকে উত্তেজিত করে তুলে : নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ। সে সমাজে পুরুষের মহিমা এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো জায়গা নেই।"
নন-ফিকশন এই বইটি নরওয়েতে সবচাইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য বেস্টসেলার বইয়ের তালিকায় ছিল। পরে ৩০টি ভাষায় অনূদিত হয়। বইয়ের খ্যাতি আরো বাড়ে যখন খান পরিবারের কর্তাব্যক্তি মোহাম্মদ শাহ রইস বইয়ে সুলতান খান যার নাম নরওয়ে চলে আসেন সেইয়েরস্টাডের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার জন্য। *অবজারভার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে সেইয়েরস্টাড বলেন, "সভ্যতার সংঘাত ছাড়া আর কোনো কিচ্ছু না। আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি। আমি জানতাম, আমি আগেই তাদের বলেছিলাম, বইটা তোমাদের ভালো না-ও লাগতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় আফগানিস্তানের আসল জীবন কেমন, তা নিয়ে লেখা উচিত। আমি বলছি না শুধু এই পরিবারই তাদের মেয়েমানুষদের নিপীড়ন করে, আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে এই সমাজে মানুষ হিসেবে মেয়েদের প্রায় কোনো অধিকারই নেই।"

ওয়ের বলেন, সেইয়েরস্টাড নিঃসন্দেহে সাহসী। নিশ্চয়ই তাঁর কোনো বদ উদ্দেশ্য নেই। তিনি আরো বলেন, আমরা ধরে নিতে পারি, অন্যান্য লেখকের মতোই, বইয়ের পিছনের প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপনরূপী যেসব কথা বলা হয়েছে তার ওপর সেইয়েরস্টাডের কোনো হাত ছিল না। বলা হয়েছে, নারী সাংবাদিক বলেই সেইয়েরস্টাডের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বোরখার "ভিতর" থেকে সত্য বের করে নিয়ে আসা। লেখা হয়েছে, "খান পরিবারের সদস্যরা নিজভাষায় তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন, হিংসা, ভালোবাসা, স্বপ্ন, প্রলোভনের কথা বলেছেন। ঘন সম্পর্কে আবদ্ধ এই পরিবারের মাধ্যমে আমরা নিবিড়ভাবে জানতে পারি যা এর আগে কেউ হয়তো জানতে পারেনি। ইসলামি দেশে বসবাস করার অর্থ কী, এমন দেশে বাস করা যার আধুনিকতা ও ঐতিহ্য, এ দুটো

পথের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে বাছাই করতে হবে।"

ওয়ের বলেন, দু-চারটে বাক্যের সাহায্যে একটি সংসার প্রতিনিধিত্ব করছে একটি দেশকে। ধর্ম এই দেশকে আকৃতি দান করে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই দেশের কোনো ইতিহাস নেই। তিনি বলেন, পাঠককে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে একটি সুবিধাভোগী স্থানে বসে এই দেশের "ভিতর"টা দেখার, কারণ *লেখক* এই বাড়ির অধিবাসীদের *অনুমতি* দিয়েছে।
তাদের মনে করতে হবে, তারা নিজেদের কথাই বলছে। কিন্ত, **ওয়ের প্রশ্ন করেন,** লেখকের কী সেই অধিকার আছে ? কে তাঁকে সেই অধিকার দিয়েছে?

বই ২: জানা মুহসেন, সোল্ড : ওয়ান উমান্স ট্রু অ্যাকাউন্ট অফ মডার্ন স্লেভারি (১৯৯৪)

হিথরোর বুকশেল্ফের আরেকটি বইয়ের নাম খুব আবেগাপ্লুত। "সোল্ড", লাল অক্ষরগুলো একজন তরুণী মেয়ের কালো বোরখার উপর জ্বলজ্বল করছে। শুধু এক জোড়া চোখ, তরুণীর চোখের চাহনি করুণ। ওয়ের বলেন, নাদিয়া মুহসেনের এই ছবিটি বিখ্যাত। ১৯৮০র দশকে বার্মিংহামের (ইংল্যান্ড) স্কুলছাত্রী নাদিয়ার এই ছবিটি বিশ্বের বহু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঘটনা সম্বন্ধে লোকে জানে। বড়ো বোন জানাসহ নাদিয়াকে ইয়েমেনে নিয়ে যান তাদের বাবা। পারিবারিক বন্ধুর ছেলের সাথে বাবা তার বিয়ে দেন, বিয়ের ব্যাপারে নাদিয়াকে আগে থেকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। জানা'র বয়স তখন ১৫, তার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। বিয়ের সময় তাদের মা মিরিয়াম আলি ইংল্যান্ডে ছিলেন, স্বামীর পরিকল্পনার ব্যাপারে তার কোনো পূর্বধারণা ছিল না । ৮ বছর পর মিডিয়ার সাহায্যে, কূটনৈতিক তৎপরতার সাহায্যে, আর প্রধানত মা মিরিয়ামের কল্যাণে জানা'র পক্ষে বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়। "সোল্ড" ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইউরোপের বেস্টসেলার বইয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ওয়ের বলেন, বুকশেল্ফে "সোল্ড"-এর পাশে দেখি, নাদিয়া ও জানা'র মা মিরিয়াম আলির জবানবন্দি, *উইদআউট মার্সি : এ মাদার্স স্ট্রাগেল এগেইনস্ট মডার্ন স্লেভারি* (১৯৯৫)। এই বইয়ের প্রচ্ছদেও একই ছবি, ছবিটি পিছনের প্রচ্ছদেও ছাপা হয়েছে। তবে সামনের প্রচ্ছদে কিছু টেক্সট রয়েছে, আর ছোট্ট ফ্রেমে দেখতে পাই পশ্চিমা পোশাক-পরা নাদিয়ার ছবি। মিরিয়াম তার মেয়েকে যখন ইয়েমেনে খুঁজে পান, তখন তোলা হয়েছিল ছবিটি।

ওয়ের বলেন, নাদিয়ার জীবন কাহিনী নানানভাবে পাঠ করা যায়। কপটতা হিসেবে। যন্ত্রণা এবং পরিবারের ভালোবাসার বন্ধন হিসেবে তো বটেই। আর অবশ্যই আরেকভাবেও পাঠ করা যায় : শত বছরের প্রাচ্যবাদী কথন হিসেবে, যেখানে সকল আরব পুরুষ সমানভাবে ধাপ্পাবাজ, চালাকচতুর এবং নিষ্ঠুর।

পক্ষান্তরে, পশ্চিম (এবং নির্ভীক শ্বেতাঙ্গ নারী) সদা নারী-স্বাধীনতার পক্ষের সৈনিক। "সোল্ড"-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এটি ভয়াবহ একটি সংঘাতের কাহিনী। আধুনিক বিশ্বে একইসাথে টিকে আছে আদিম কিছু উপাদান, আর বিশ্বের সবচাইতে রুচিসম্মত মানুষ... । মনে হতে পারে এটি আরব্য রজনীর কোনো কাহিনী, এ সময়ের ঘটনা না হলে সেটা মনে করাটাই স্বাভাবিক। ভয়াবহ এই কাহিনীটি একটি দুঃস্বপ্নের মতো, কিন্তু দুঃস্বপ্ন নয়, এটাই বাস্তবতা... ।"

[**রেহনুমা আহমেদ,** নৃবিজ্ঞানী ও গবেষক। rahnuma@drik.net।]

তথ্যপঞ্জি

Ali, Miriam, Jana Wain (1995) *Without Mercy: Woman's Struggle Against Modern Slavery*, London: Little, Brown.

Finn, Melanie "Nadia's choice", *Guardian*, Monday April 1, 2002. http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4385270,00.html

Hirschkind, Charles "What is Political Islam?" Middle East Report, October-December 1997,
http://www.merip.org/mer/mer205/hirschk.htm

Muhsen, Zana with Crofts, Andrew (1994) *Sold: One Women's True Account of Modern*
Slavery, London: Little, Brown.

Said, Edward W. (1978) *Orientalism*, New York: Pantheon.

Seierstad, Asne (2003) *The Bookseller of Kabul*, Boston, New York and London: Little, Brown.

Ware, Vron (2006) "Info-War and the Politics of Feminist Curiosity. Exploring New Frameworks for Feminist Intercultural Studies", *Cultural Studies*, Vol 20, No 6, November, pp. 526-551.

Ware, Vron (1992) *Beyond the Pale. White Women, Racism and History*, London: Verso.

আহমেদ, রেহনুমা (২০০৬) সংকলন ও অনুবাদ, *ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন। সমকালীন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম*, ঢাকা : একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

১. ওয়ের বলেন, "Well before the geopolitical climate shifted in 2001, factors such as the rise of Political Islam impacted on home-grown variants of racism to produce new levels of intolerance towards Muslim settler communities, and a readiness to see the entire Middle East as a

hotbed of terrorism.” দেখুন পৃষ্ঠা ৫২৮। ওয়ের “রাজনৈতিক ইসলাম”-এর অভ্যুত্থানের কথা বলেন। তার এই শব্দ-বাছাই, এবং অন্তর্নিহিত কনসেপ্টের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। **চার্লস হার্শকাইন্ডের তত্ত্বায়নের সাহায্যে** এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি *ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন*-এ। সেখান থেকেই তুলে ধরছি : [হার্শকাইন্ড] বলেন, অনেকে “রাজনৈতিক ইসলাম” শব্দ ব্যবহার করেন কারণ তারা বোঝাতে চান যে পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে, এটি ঐতিহাসিকভাবে-নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিসরের বাইরে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটায়। এটি অন-ইসলামী। কিন্তু, তিনি বলেন, বর্তমানকালে রাষ্ট্রক্ষমতার যে সম্প্রসারণ ঘটেছে, সমাজজীবনের সুবিশাল পরিসর রাষ্ট্রের মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে খোদ ধর্ম সহ (তা না হলে সেক্যুলার ফ্রান্সে মুসলমান স্কুলছাত্রীদের মাথায়-কাপড় পরাকে বে-আইনি বলে নিষিদ্ধ করা কীভাবে বুঝব ? তার কী হবে ? তিনি বলেন, বর্তমানে সমাজজীবনে ‘এটা’ রাজনৈতিক, ‘ওটা’ রাজনৈতিক না, এই ভেদরেখা বজায় রাখা কঠিন (মনে রাখতে হবে, রাজনীতির ধারণা এখানে ব্যপক ; রাজনীতি বলতে রাজনৈতিক দল বা তার কর্মকাণ্ড বোঝানো হচ্ছে না, রাজনৈতিক দল একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র)। আধুনিক জাতি-গঠন/নেশন-বিল্ডিং

প্রক্রিয়ায় শিক্ষা, ধর্মপালন, সামাজিক কল্যাণ, পরিবার, ব্যবসা-করা, চুক্তি-স্বাক্ষর, সন্তানকে শাস্তি-দেয়া, নিজ বাড়িতে আরেকটি ঘর তোলা, ফুটপাথে পণ্যসামগ্রী বেচাকেনা প্রতিটি পর্যায়ে রাষ্ট্রের উপস্থিতি আবশ্যিক। ফলে, আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড পালন করতে হলেও (আধুনিক) রাজনীতি আর তা দ্বারা প্রযুক্ত ক্ষমতার মুখোমুখি-হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মিসরের সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে ধর্মশিক্ষায় কী পড়ানো হবে, তা সরকার-দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এ কারণে, হার্শকাইন্ড বলেন, ‘আধুনিক’ (মানে রাজনৈতিক) আর ‘ঐতিহ্যবাহী’ (মানে ধর্মীয়) এ ধরনের সহজ-সরল বৈপরীত্য দিয়ে জটিল বিষয় বোঝা যাবে না। তিনি বলেন, “রাজনৈতিক ইসলাম”-এর মতো পদ অপর্যাপ্ত ; এই পদ ব্যবহার করলে আধুনিকতাগামী রাষ্ট্র কীভাবে সমাজে হস্তক্ষেপ করছে, কীভাবে ধ্বংসসাধন করছে, আর ধর্মীয় শক্তি কীভাবে এর মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, এসব-আর আলোচনায় স্থান পায় না। আর এ কারণেই ইসলামপন্থী/ধর্মীয় রাজনীতির উপযুক্ত সমালোচনা দাঁড়-করানো সম্ভব হয় না। পৃষ্ঠা ১৯-২০।

২. দেখুন এডওয়ার্ড সাঈদ, ১৯৭৮।

মজিদ মাহমুদ

....

সমাজ ও সাহিত্য

সমাজ, উন্নয়ন ও সাহিত্য– শব্দ তিনটি পরস্পর জটিল, অন্বয়যুক্ত, ভিন্নার্থক ও পরস্পর বিরোধাভাসপূর্ণ। শব্দগুলো কখনো কখনো রীতিমতো সাংঘর্ষিক। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সাহিত্য মানতে চাননি। তাদের ধারণা সমাজ উন্নয়নে সাহিত্যের ভূমিকা তো দূরের কথা, সমাজ অবক্ষয়ে তাদের ভূমিকা অনেক বেশি।

আমাদের জানা মতে যিনি সাহিত্যকে প্রথম যুগপৎ স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি দান করেছিলেন সেই মহান প্লেটো একজন সমাজবিজ্ঞানী। তিনি মনে করতেন সমাজ উন্নয়নে অর্থাৎ আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে কবিরা বাধাস্বরূপ। তিনি তার রচনায় কবিদের রীতিমতো অবজ্ঞা করেছিলেন। তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখতেন সেখানে অন্তত কবির ঠাঁই নেই বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমনও বলেছিলেন, কোনো কবি যদি তাদের দেশে আসে তাহলে তাকে চমৎকার লোক হিসাবে বর্ণনা করে, সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে বলবেন, 'হে মহাত্মন, আপনি অনেক বড়, আপনি এত বড় যে, আপনাকে রাখার ব্যাপারে আমাদের দেশে আইনের নিষেধ আছে। চলুন আপনাকে অন্য রাষ্ট্রের দ্বারপ্রান্তে রেখে আসি; আমাদের কোনো কবির প্রয়োজন নেই।' আড়াই হাজার বছর আগে, আমাদের জানা ইতিহাসের মধ্যে কবিতা তথা সাহিত্যের এই প্রধান শাখাটি নিয়ে বোধ করি এমন মারাত্মক কৌতুক কেউ করেননি। অপরদিকে প্লেটোর কবি-বিদ্বেষ অন্যভাবেও বিচার করা যায়, অর্থাৎ প্লেটোই প্রথম কবিকে সাংঘাতিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কবি তথা কবিতা যে সমাজের প্রতিরূপ হিসাবে গড়ে উঠছে, এটা তাঁর কথার অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে লুকায়িত। তাছাড়া সমালোচনামূলক সাহিত্যের ধারাটিও তাঁর হাতে সূচিত হয়েছিল। প্লেটোর বিরোধের মূলসূত্র কবি বিশ্বের প্রতিবিম্ব তৈরি করেন। বাস্তব জগত থেকে কিছুটা দূরে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হিসাবে স্রষ্টার অনুকারক হিসাবে কাজ করেন; যা সর্বদা ন্যায় ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের প্রতিপক্ষ। প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন কবিকে তার প্রধান বাধা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। প্লেটোর ইউটোপিয়ার স্বপ্ন একটি গাণিতিক সমাজ গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ দুইয়ে দুইয়ে চার-এর ব্যতিক্রম সমাজবিজ্ঞানী সহ্য করেন না। প্লেটোর একাডেমির প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ ছিল, যারা অংক বোঝে না একাডেমিতে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। প্লেটো অংক ভালো বুঝতেন। কিন্তু তাঁর আগে হোমার যে ইলিয়াড ও ওডিসির সমাজ নির্মাণ করেছিলেন তা এক ভয়ঙ্কর সত্য

হয়ে প্লেটোকে আংকিক সমাজ গঠনে শঙ্কিত করে তুলেছিল যার অস্তিত্ব কোথাও নেই। কিন্তু এই না থাকা সমাজ-বাস্তবতাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে– সমাজবিজ্ঞানীও একটি ধারণার ওপর নির্ভর করে প্রকল্প গ্রহণ করেন। কখনই অঙ্কের নিয়মে যা প্রমাণ করা যায় না। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে পৃথিবীতে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু তার ধারণাটি এবং সমাজের মধ্যে নিহিত বাস্তবতা কখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কেউ কেউ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্লেটোর ধারণার কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পান। মূলত প্লেটোর সঙ্গে কবির দ্বন্দ্ব সৃষ্টিশীলতার। এমনকি আধুনিককালে বঙ্কিমের মতো বিদগ্ধজন মনে করতেন মহাভারতে সর্বকালের সব মানুষের জন্য বৈশল্যকরণী ধন্বন্তরি লুকিয়ে আছে। মানুষের বিমান আবিষ্কার কিংবা চাঁদে যাওয়ার সূত্রও সেখানে পাওয়া যেতে পারে। যদিও মানুষ তখনও চাঁদে যায়নি। আবার চাঁদে যাওয়ার প্রমাণিত সত্য এখনও প্রমাণ দিয়ে অনেক বিজ্ঞানী মিথ্যা প্রমাণ করতে তৎপর। তাঁরা বলতে চান এটি হল ইয়াঙ্কিদের আধিপত্যবাদের কাহিনী। গল্প হিসেবে গল্পের শ্রোতা হিসেবে এ সবই আমাদের আনন্দ দেয়। সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রধান পার্থক্য– বিজ্ঞান প্রমাণ থেকে অপ্রমাণের দিকে আর সাহিত্য অপ্রমাণ থেকে প্রমাণের দিকে ধাবিত। সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ সমাজের একটি রূপ আমরা বর্ণনা করতে পারি আর-একটি রূপ আমাদের বর্ণনার অতীত; তা কেবল সাহিত্য বর্ণনা করতে পারে। আর সেই বর্ণনা সত্যের চেয়েও অধিক। রবীন্দ্রনাথ "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় বলেছিলেন, 'তাই সত্য যা রচিবে তুমি/কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' কবির এই বাণীর অসম্ভব সত্যতা আজও কী অদ্ভুত সত্য! এই সত্য প্রমাণের জন্য অযোধ্যায় ইতিহাসের সত্য বাবরী মসজিদের পাথর খসে পড়ে। গুজরাটে হাজার হাজার মানুষকে মুহূর্তে ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। তাহলে প্রকৃত সত্য কোনটা? সাহিত্যের সত্য হল তাই যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্তির অতীত নাড়া দিতে থাকে। ইতিহাসের সমাজের বাস্তবতা পরিবর্তনশীল; কবির বাস্তবতা অপরিবর্তনীয়। আমরা যে প্রমিথিউসের কথা জানি, আমরা যে লৌকিক দেবতাদের কথা জানি, আমরা যে কল্যাণকামী ত্রাতাদের কথা জানি, আমরা বিপদে যার শরণাপন্ন হই, যে অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকতে চাই, জীবন চলার পথে নানা বাধার সম্মুখীন হই, তখন আমাদের জাতির জীবনের স্মরণপথে সেই সব মহান ঘটনা উদিত হয়, যা আমাদের সামনে চলতে সহায়তা করে। এই উলাবিবি, চণ্ডী আর মনসার কাহিনী তো কবিই সৃষ্টি করেছেন।

প্লেটোর মতো রুশোও কবিতাকে এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে এ কথা ভাবলে ভুল হবে, সব সমাজবিজ্ঞানী আমাদের উল্লিখিত নমস্যদের সঙ্গে একমত নন। এমনকি প্লেটোর শিষ্য ও সিকান্দার বাদশাহর গুরু আরিস্তুল কবিতা ও সাহিত্যের একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সমাজবিজ্ঞানীর স্বীকৃতি কিংবা

উপেক্ষা নিয়ে কোনো লেখক লিখতে শুরু করেন না। আমাদের জানাকালে কিংবা অজানা ইতিহাসের অন্ধকার গুহাচিত্র মানুষ কেন নির্মাণ করেছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমরা জানি না। আদিম মানুষ কখন গান গেয়ে উঠেছিল তা-ও আমরা জানি না। মানুষ যদি স্রষ্টার প্রতিভূ হয়, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টিশীলতা মানুষের মধ্যে কম-বেশি ক্রিয়াশীল। মানুষ উড়োজাহাজ ও ডুবোজাহাজ তৈরি করেছে– জলস্থলে অন্তরীক্ষে আজ তার অবাধ বিচরণ। কিন্তু যখন এসব আবিষ্কার হয়নি তখন মানুষ এ সবের স্বপ্ন নির্মাণ করেছিল। কবি এসব স্বপ্নের নির্মাতা। তবু এ কথা সত্য হোমার কিংবা প্লেটো উভয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য কলম ধারণ করেছিলেন। কিন্তু প্লেটোর চিন্তাচেতনা আজকের দিনে কতখানি উপযোগী সেই বিচার করলেও আমরা কিন্তু কখনই বলি না হোমার কী সব আজেবাজে অসম্ভব চিন্তা করেছেন। বরং মানুষ বিজ্ঞানের সত্যের দিকে আজ যতই এগিয়ে যাচ্ছে হেলেনিক ঘোড়ার গল্প ততই সত্য হয়ে উঠছে। কবির যুক্তি সঠিক কিনা এ নিয়ে পাঠকের কোনো প্রশ্ন থাকে না, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী কতখানি তথ্য ও সত্যনির্ভর তার প্রমাণ রাখতে হয় সর্বত্র। তবে মনে হয় প্লেটো যত-না সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন তারচেয়ে বেশি আটলান্টাসের কাহিনীর নির্মাতা।

বিজ্ঞান মানুষকে বাঁচার ও মরার অনেক সহজ উপকরণ দান করেছে। কিন্তু মানুষের হৃদয়কে ভয় ও সম্ভাবনা থেকে নিসংশয় করতে পারেনি। বরং আধুনিক বিজ্ঞানসভ্যতায় মানুষ আরও বেশি অসহায়। তার মনের রোগ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্যের স্রষ্টা হল মানবজাতির মনোবিজ্ঞানী। যে পঙ্কিলতার মধ্যে মানুষ আবর্তিত, মানুষ যে জরা ও মৃত্যুভয়ের অধীন; মানুষ প্রতিনিয়তই বাঁচার জন্য ডুবন্ত মানুষের মতো মুঠোর মধ্যে আটকে ধরে ইট-পাথর আর কাগজের নোট। নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য চারপাশে গড়ে তোলে ইট-পাথরের দালান। সাহিত্য মানুষের সেই অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। নানা কায়দায় সেই ধ্বংস থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। এভাবেই মনে হয় সমাজের মানুষগুলোর জন্য উন্নয়ন ও উপকরণের পরিবেশ গড়ে তোলার কাজটি সাহিত্য প্রতিনিয়ত করে চলে। বাইরের পরিবেশকে একজন লেখক নিজের মধ্যে এনে চেতনার জারকরসে সিক্ত করে একটি নতুন সমাজের জন্ম দেয়। হয়তো কাল যাকে বিস্তারিত পটভূমিকায় গড়ে তুলেছে সাহিত্য তাকে ধারণ করেছে কয়েকটি আঁচড়ে।

তবে সমাজের উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে হয়তো কোনো সাহিত্যিক তার রচনা শুরু করেন না। এমনকি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তাদের অনেকের মাথায়ও সে চিন্তা থাকে না। এসব সৃষ্টির পশ্চাতে আনন্দ আর পুঁজি পুঞ্জীভূত করার ইচ্ছা কাজ করে থাকতে পারে। প্রকৃত সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্যবাদিতা নেই। মধ্যযুগের শেষের দিকে আমাদের এক কবি বলেছিলেন, 'প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে/যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' সাহিত্যে তাই দীর্ঘকাল চলেছে 'Art for art sake'-এর বিতর্ক। কিন্তু কার জন্য শিল্প? কে করছেন এই শিল্প? শিল্পের নির্মাতা তো সমাজের

বাইরের কেউ নন। নানাভাবে নানা সূত্রে সমাজের সঙ্গে তার রয়েছে নানাবিধ বন্ধন। সুতরাং তিনি যা-ই লিখুন তা একটি জাতির ভাষার মধ্যে লালিত। আর ভাষা ও তার শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে জাতির জীবনের স্বপ্ন। উন্মাদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও যে কোনো ইঙ্গিত নেই তা কিন্তু বলা যায় না। সমাজের এবং পথের বিশৃঙ্খলা হয়তো তাকেও ক্ষুব্ধ করেছে।

যদি বলা হয় সাহিত্য সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রেখে থাকে তাহলে প্রশ্ন কীভাবে? সমাজ মানে তো মানুষ; মানুষকে ঘিরে রয়েছে সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজি, অপরাপর প্রাণিকুল, স্রোতস্বিনীর প্রাণপ্রবাহ, মাথার ওপর অনন্ত আকাশ- নক্ষত্রবীচী, পায়ের নিচে প্রাণধারণের মাটি। এই সপ্রাণ সংস্থার সুখ ও দুঃখ নিয়েই তো মানুষের সমাজ। এসব নিয়েই মানুষের স্বপ্ন আবর্তিত। এর একটির স্বাস্থ্য খারাপ হলে মানুষের মন খারাপ হয়। মানুষ তার অস্তিত্বের সংকট অনুভব করে। সাহিত্য তো সমাজের মধ্য থেকে উত্থিত চেতনার অধিক্ষেপ। সমাজের সকল শুভাশুভ চেতনা সাহিত্য ধারণ করতে চায়। আমাদের জানাকালের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, কল্যাণের দিকে আহ্বান করা সাহিত্যের একটি প্রধান ভূমিকা, বোধ করি একমাত্র ভূমিকা। ধর্মের প্রাচীন সংগঠনের মতো সাহিত্যও ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রথম আবর্তিত হয়েছিল। আমাদের সাহিত্য ছাড়াও বিশ্বের প্রায় সব ভাষার সাহিত্য একই নিয়মে বেড়ে উঠেছিল। মহাকাব্যের আদলে, ট্র্যাজেডি ও কমেডির মধ্য দিয়ে বিপুল বিশাল জীবনের সারাৎসার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা জেনেছিলাম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবন ও জগতের গূঢ় রহস্য, অদৃশ্য ঈশ্বরের লীলা, ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অজানা ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক কষ্ট-চেতনা। গিলগামেশের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ইলিয়াড ও ওডিসির বিশ্বভ্রমণবীক্ষা, কর্মময় জীবনের মধ্যে যুধিষ্ঠির ও রামের নিস্পৃহ জীবনদীক্ষা,– সাহিত্যের এ সব জীবনকাহিনীই পৃথিবীর পথে মানুষকে যোগ্যতর করে তোলার পথ বাতলে দিয়েছিল। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আমরা ইউনুস নবীর কাব্যময় শোক উচ্চারণ করি, নুহ্‌ ও আইয়ুব নবীর কাহিনী স্মরণ করে আমাদের চলমান বিপদের তীব্রতা থেকে মুক্তি পেতে চাই। সংকট ও বিহ্বলতায় নিজেকে নির্ভয় করার মন্ত্রও কবি রচনা করেছেন।

সাহিত্য সমাজকে যেভাবে উন্নতি দান করে এসেছে, তা অপারপর উন্নয়ন উপকরণের সঙ্গে মিলবে না। আমাদের শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৃশ্যত একটি কাজ থাকলেও মস্তিষ্কের কাজ ঠিক দেখা যায় না। বিল গেটসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনাকে যদি একটি প্রশ্ন জানার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে আপনি কোন প্রশ্নটি জানতে চাইবেন? বিল গেটস বলেছিলেন, ‘মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে?’ কী অপার রহস্য! মানুষের বিজ্ঞান এখনো যেখানে যেতে পারেনি। সাহিত্য তো মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে

তৈরি হয়। মানুষের চিন্তা ও চেতনার ফেনা ও তরঙ্গ দিয়েই তো সাহিত্য নির্মিত। সমাজের একটি ধারণাগত উন্নয়ন তো সাহিত্য সব সময় করে এসেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আমরা যদি যেতে চেষ্টা করি, তাহলে সর্বাগ্রে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে চারশ' বছরের স্বল্পায়তনের নিদর্শন। এই সময়ের হয়তো রাজনৈতিক ইতিহাস ইতিহাসবেত্তারা পুনর্গঠিত করেছেন। কিন্তু সেই ইতিহাসে কি সাধারণ মানুষকে পাওয়া যাবে? প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে হাসিকান্না, 'টালত মোর ঘর নাহি পরবেসী/হাড়ীতো ভাত নাহি নিতি আবেশী'– এই সমাজের কোনো ইতিহাস আমাদের জানা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সাহিত্য মানবজীবনের সেই ইতিহাস রচনা করেছে। হাজার বছর আগের বাংলাদেশের রূপ যদি আমরা জানতে চেষ্টা করি তাহলে চর্যাপদই একমাত্র আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। সাহিত্য এ রকম অনেক বিলুপ্ত কিংবা লুপ্তপ্রায় জনপদ পুনর্গঠিত করেছে। সাহিত্যের অতি কিংবা স্বল্প কথনের মাধ্যমে টিকে আছে মানব ইতিহাসের জাতিস্মর। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' কিংবা 'আরণ্যক'; তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাকের উপকথা'; সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' অ-ইতিহাসের বাংলাদেশের সমাজজীবন সংরক্ষণ করে রেখেছে। আর যেসব মহান সাহিত্যিক তাঁদের লেখায়, সমকালের সমাজজীবন সংগঠিত করেছিলেন যেমন বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে', নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা'য় একদিন যে সমাজ আমরা চিনতাম আজকে কি আমরা তাদের চিনি? এই পৃথিবী জরা ও মৃত্যুর অধীন। অ-নশ্বর বলে কিছু নেই। আজকে যা বাস্তব আগামীকাল তা অতীত। সাহিত্যই কেবল অ-নশ্বরের ধারক। সুতরাং সাহিত্যের সমাজের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের লাভ-ক্ষতির ধারণাযুক্ত সমাজ মিলবে না। সাহিত্য সমাজে বসবাসরত মানুষের মনোজগতের উন্নয়নে সব চেয়ে বেশি কাজ করেছে। আর সেই সঙ্গে সমাজেরও। মানুষের উন্নয়নের ইতিহাস ও সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের চেয়ে সাহিত্য আরো বেশি সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। ইতিহাসের নিকটকালের বলশেভিক আন্দোলন; বোধ করি সমাজ উন্নয়নে এত বড় ও মহান বিপ্লব আর সংগঠিত হয়নি। পুরাণ বর্ণিত আকাশের স্বর্গকে মাটির মায়ের সন্তানেরা ধরিত্রীর বুকে এনে দিতে চেয়েছিলেন কিংবা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ কি সেখানে তার এক টুকরো অবশিষ্ট আছে? কিন্তু এই সমাজবিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত গোর্কির কালজয়ী উপন্যাস 'মা'কে পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ত ধ্বংস করতে পারেনি। শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্য ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলেও মানুষের শুভবোধ ও চেতনা, শ্রম ও বিপ্লব, বাৎসল্য ও মাতৃপ্রেমের বিরাম নেই।

সমাজ পরিবর্তনশীল; সুতরাং, সমাজবিজ্ঞানীর চেতনাও সমাজের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে পরিবর্তনশীল। প্লেটোর রিপাবলিক কিংবা ডায়লোগকে আজ আর কে রাষ্ট্রচেতনার গ্রন্থ হিসাবে দেখবে? সক্রেটিস আর সফোক্লিস; প্লেটো আর হোমার

সবই আজ আমাদের কাছে মিথ। প্রতিনিয়ত যা আমাদের জীবনের চলার পথ চিনিয়ে দেয় তা ইতিহাস, মিথ কিংবা সাহিত্য, যে নামেই ডাকা হোক বর্তমানের পাঠকের কাছে তার মূল্য সমান– এসবই আজ মেটাফর, ভাষার অ্যালিগরি, বিশ্বমানবের ভাষা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। যা বাদ দিয়ে আমরা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারি না। আমরা যখন প্লেটোর 'সংলাপ' পাঠ করি তখন তার মর্যাদা প্রায় সফোক্লিসের মতো হয়ে ওঠে। সাহিত্যের অসম্ভব কল্পনার মধ্যেও বাস্তবের অদৃশ্য বীজকণা লুকিয়ে থাকে। সফোক্লিসের 'ইডিপাস রেক্স' এমন একটি কষ্টকল্পনার মহান রচনা; কিন্তু তার মধ্যেও কী সত্য ছিল না? সফোক্লিসের পুত্ররা পিতাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আদালতের কাছে রায় চেয়েছিল; সফোক্লিস এই যন্ত্রণার জবাব হিসাবে আদালতের জন্য রচনা করেছিলেন এই মহত্তম ট্র্যাজেডি। আদালতের জেরার জবাবে ইডিপাসের কাহিনী পড়ে শুনয়েছিলেন। বিজ্ঞ আদালত কি বুঝেছিলেন জানি না, কিন্তু সফোক্লিসকে খালাস দিয়েছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের অভিযাত্রা আর আভিজাত্যের কাহিনী। ঔপনিবেশিক ভারতের আদালতকে নজরুলও জানাতে চেয়েছিলেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের মতো ভিনদেশীদের আদালত অত নিরপেক্ষ ছিল না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের কুমুরডাঙ্গার অভিশপ্ত সমাজের কথা আমাদের মনে আছে। তবারক ভূঁইয়া নদীর ভয়ে ভীত মানুষগুলোকে কীভাবে রক্ষা করেছিলেন। মানুষের সমাজ যখন ধ্বংসোন্মুখ অন্ধকার গুহার মধ্যে হারিয়ে যেতে চায় সাহিত্য তখন জাগানিয়া গান রচনা করেন। আর 'চাঁদের অমাবশ্যা'য় আরেফ আলীর ঘটেছিল মানব চৈতন্যের উদ্বোধন। সমাজ-বিজ্ঞানী এই কাহিনী তৈরি করতে পারেন না। সাহিত্যই সমাজ গঠনের গুরুত্বের কথা সব চেয়ে জোর দিয়ে প্রকাশ করেছে। সাহিত্য মানে তো সম্মিলন আর সম্মিলন মানে সমাজ। প্রাণের প্রধান দাবি অস্তিত্বের লড়াই, কিন্তু সেই অস্তিত্ব সামষ্টিক। আমরা যখন এককভাবে বাঁচার চেষ্টা করি তখন পরিণামে আমরা টিকতে পারি না। সাহিত্য একক এবং সামগ্রিক অস্তিত্বসহ বাঁচার সূত্র নির্দেশ করে।

আজ জীবনের ও সাহিত্যের সবখানেই শুরু হয়েছে একক চলার পথ। আমরা আমাদের শরীরকে যত নির্ভয় করতে চাচ্ছি মন তত বন্দি হয়ে পড়ছে। কে রচনা করবে এই বন্দিত্বমুক্তির গান আর কে-ই বা শুনবে তার বাণী। সাহিত্য রচয়িতাদের হাতে এমন কোনো মারণাস্ত্র নেই যে দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক চাতুর্য, বিশ্ব-বৈশ্যকরণ আর আকাশের অবাধ শরীরীকরণ রুখে দেবে। সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু কে করছে সেই অভিযোগ? যে সাহিত্য তার বিবেচনায় মূল্যবান বলে মনে হয়, সে ধরনের একটি গ্রন্থও কি তিনি পাঠ করেছেন; যে গ্রন্থের অভিজ্ঞতা তার জীবনকে সমৃদ্ধি দান করেছে? মানুষের সব শুভবোধের মতো সাহিত্যেরও এত খারাপ সময় অতীত শতাব্দীতে কখনও আসেনি।

সাহিত্য মানে কেবল লেখকের মনোরাজ্যে অবস্থিত একটি জগৎ; যা ছিল না সমাজে বাস্তবতায়; একজন লেখক যা প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বর্গের ধারণার মতো আমরা যেখানে বসবাস করতে চাই। আমাদের একজন কবি ফজলল করিম লিখেছিলেন, 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর/মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।' নিউটন অভিকর্ষ আবিষ্কারের আগেও পৃথিবীতে অভিকর্ষ ছিল কিন্তু বিজ্ঞানী তা সূত্রায়ন করেছেন। সমাজের মধ্যে জাতির জীবনে এমন অনেক ধারণা বিচ্ছিন্নভাবে যুগযুগান্তর ধরে বসবাস করে, সাহিত্য সেই চেতনার লিপিবদ্ধ রূপ দান করে । মানুষ নিজের চলার পথে অজান্তেই সেসব নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়; এ ভাবেই সে উন্নয়ন ও অগ্রসরতার পথে এগিয়ে চলে।

পুনর্মুদ্রণ

বেলাল চৌধুরী – আবদুশ শাকুর

....

কথোপকথন: গোলাপ নিয়ে একদিন

বেলাল চৌধুরী

মামা আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ক্যাডারের উচ্চতম পদে আসীন একজন আমলা

আবদুশ শাকুর

মামাই যখন, কবির সঙ্কেতধর্মী স্বভাব ত্যাগ করে আরো খুলেই বলে ফেলুন যে আমি ইতিহাস-নন্দিত কুলগুরু আই.সি.এস-এর উত্তরসূরি বিতর্কিত সি.এস.পি ঘরানার একজন আমলা

বেলাল চৌধুরী

না মামা, বস্তুতই না। আপনি সরকারের একজন কর্মরত সচিব। এটা একটা সরকারি বাংলো, যার লনটা আবার রীতিমতো পেশাদারী গোলাপ বাগান। ব্যাপারগুলোকে মেলাতে পারি না।

আবদুশ শাকুর

মেলাতে যে মেলা সময় লাগবে মামা প্রায় একটা বেলা। অবশ্য আজ ছুটির দিন। কিন্তু অত সময় কি আপনার আছে ?

বেলাল চৌধুরী

থাকবে না মানে ? পাশের দূতাবাসটিতে চাকরি করি। রোজ ভাবি অফিস ফেরৎ গোলাপি গল্পে জমে যাই। কিন্তু উঁকি মেরেই দেখি আপনি অফিসফেরৎ শরীরটাকে আরামকেদারায় গচ্ছিত রেখে পত্রিকা সহকারে চা-কফি সেবন করছেন না। করছেন পুস্তক-হাতে গভীর অধ্যয়ন তা-ও মাঝবাগানে দাঁড়িয়ে আরেক হাতে কাঁচি নিয়ে।

আবদুশ শাকুর

ইংরেজদের সেকেটার কিংবা ইয়াংকিদের সিয়ার্স না-বলে, মজা করেও যদি বাঙালিদের কাঁচি বলেন তবু কিন্তু গোলাপের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। পুষ্পরানী ভারি সেন্সিটিভ এন্টিটি মামা।

বেলাল চৌধুরী

সেন্সিটিভ এন্টিটি ? এ-ও কি গোলাপসুন্দরীর অগুনতি শ্রুতির একটি নাকি ?

আবদুশ শাকুর

না মামা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। 'চ্যাম্পিয়ন'-নামক মাত্র পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন পাপড়ির, কিন্তু সাত-আট ইঞ্চি ডায়ার, অতি বিশাল একটা রেড অ্যান্ড পিংক ফ্লাশ্‌ড ইয়েলো-ক্রিম কালারব্লেন্ড গোলাপের বয়ান কেতাবে পড়ে ওটাকে বাগানে ফোটাতে চাইলাম। চারাটা টিকল না। আবার আনলাম। এবার চারা টিকল, গাছ হল, কিন্তু ফুল দিল না দীর্ঘদিন। পাশে দাঁড়িয়ে গুল্মটার দিকে তাকিয়ে একদিন ভীষণ বিরক্তি বোধ করলাম। মনও হয়তো বলে উঠেছিল দূর ছাই। পরদিন দেখলাম গাছটা নাই মৃত্যু বরণ করেছে। যেন কেউ মূলটিই কেটে দিয়েছে মাটির নিচে। এটা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বেলাল চৌধুরী

বিস্ময়কর ঘটনা তো বটেই ।

আবদুশ শাকুর

শোক আমার শতগুণ বেড়ে গেল পরে যখন জানতে পেলাম যে এই কাল্টিভারটি ফুল দেয় দেরিতে এবং দেয়ও কম তবে যা দেয় তা অপলক চেয়ে থাকার মতো । তারপরে অবশ্য যথা আদরে অনেক ফুটিয়েছি আমি ওই উদ্‌যাপিত পুষ্পটি ।

বেলাল চৌধুরী

তা মামা, এত বড় ফুলের বাগান করে ফেলেছেন সরকারি বাংলোয় এ বাড়িতে আপনি কবে থেকে?

আবদুশ শাকুর

বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হবার পরমুহূর্ত থেকে মাসকয়েক চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসন সামাল দিয়ে সরকারের উপসচিব হয়ে রাজধানীতে আসি বাহাত্তর সালের মাঝামাঝি । উঠি পি.ডব্লিও.ডি'র প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার বড় ভাই মরহুম আবদুল হাইয়ের বাসায় । অতঃপর ঢাকায় সরকারি বরাদ্দ পাওয়া আবাস আমার এটাই প্রথম এবং এটাই শেষ । রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত বেঁচে থাকলে চতুর্দিকে বাগানশোভিত সুপরিসর এই একতলা বাংলোটিতে আমার জীবনের সাতাশটি বছরই কেটে যাবে ।

বেলাল চৌধুরী

তার মধ্যে দুটি যুগ তো ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত ।

আবদুশ শাকুর

হাঁ মামা । আমার জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঠিকানা ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার দুই নম্বর সড়কের এই বারো নম্বর আবাসটি ।

বেলাল চৌধুরী

তা ঠিক । আপনার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কালটিরও স্থান তো এটাই । তাহলে এই গোলাপবাগানের গোড়াপত্তন সেই তিয়াত্তর সালে ?

আবদুশ শাকুর

না। দ্যে স্যে দ্য রোজ ইজ নট আ বিগিনার্'স ফ্লাওয়ার। প্রথম বাগানটি আমার স্ত্রীর। তিনি শুরু করেন হর্টিকালচার মালয়েশিয়ার নারিকেল, নোয়াখালীর সুপারি, রাজশাহীর আম, চাইনিজ লিচু, কেরালার কামরাঙা, ইতালিয়ান জলপাই, বরিশালের আমড়া, কুমিল্লার পেয়ারা, স্বরূপকাঠির আমলকি, আরো যে কতকি।

বেলাল চৌধুরী

তার মানে লনটা পড়েছিল পোড়ো ?

আবদুশ শাকুর

না, ওটার মাঝখানে লাগানো হয়েছিল গোলালু।

বেলাল চৌধুরী

আর ওটা উৎখাত করে গোলাপ। এবং আপনার গোলাপ-বিসংবাদ রচনার গোলালু-গোলাপ তর্জাটার উৎসও ওটাই।

আবদুশ শাকুর

না মামা। গোলাপপ্রীতিতে লায়লাও কম যায় না। তবে তার বিশেষ কষ্ট হয় দক্ষিণ ধারের বেশ কিছু ফলবতী আম্রবৃক্ষ উৎপাটনে। এবং যে-সে আমও নয় ক্ষীরসাপাতি-গোপালভোগ। আমি
সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে নেংড়া-ফজলি তো সবই রইল।

বেলাল চৌধুরী

এ তো পুওরম্যান'স কনসোলেশন। গোলাপের জন্য মৌসুমি গোলালু উৎখাত করা এক কথা। স্থায়ী গাছ কেটে ফেলা আরেক কথা।

আবদুশ শাকুর

উপায় তো ছিল না মামা। পুষ্পরানী ছায়া বরদাশত করেন না বিলকুল। যেমন বলেছি, গোলাপ আনাড়ি মালির হাতের মোয়া না। এর চর্চা করতে গেলে রোজ-গার্ডেনার এবং রোজ-এক্সপার্টদের কেতাবি কথাবার্তা অশেষ মনে হলেও সরজমিনে মেনে চলতে হয় সবই। ভাগ্যে প্রাসঙ্গিক প্রস্তুতি আমার যথেষ্টই ছিল যাকে বলা যায় গেলাপাকাশে উড়ান দেবার প্রস্থানভূমিগত প্রস্তুতি। ফ্লোরিকালচারের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল আমার। একনিষ্ঠ রোজারিয়ান হয়ে যাবার আগে অনেক কাল আমি মরশুমি ফুলে মশগুল ছিলাম। গোলাপের মতো অপরূপ না হলেও সে পসরাও ছিল বিচিত্র রূপেরই।

উদ্যানটিতে ছিল চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, সালভিয়া, পিওনি, সুইট-পি, দোপাটি, জিনিয়া, বিগনিয়া, টেজেটিস্‌, জিরেনিয়াম, এস্টার, ফ্লক্স, ক্যালেনডুলা, গিলার্ডিয়া, গালফিমিয়া, মালপিগিয়া, হাইড্র্যাঞ্জিয়া, কারনেশান, ক্যা টাফট, ন্যাস্টার্শিয়াম, ম্যারিগোল্ড, গ্ল্যাডিওলাস বা বৈজয়ন্ত, ডায়ান্টাস, পপি, ক্যানা বা সর্বজয়া বা কলাবতী, মর্নিং গ্লোরি কিংবা ভোরগরবী, ব্লুনিয়া বা নীলপারুল, এমনি আরো অনেক রকম ফুলের বিচিত্র সমাবেশ। প্রধানত এই সবই বলি হয়েছে প্রথম কিস্তি গোলাপের বেদীতে।

বেলাল চৌধুরী
তার মানে এত সব ফুলের বাগানটি হয়ে গেল একটিমাত্র ফুলের বাগান ?

আবদুশ শাকুর
হাঁ। তবে এক বছরে নয়। প্রথম বছরে গেল শুধু মৌসুমি আর অ্যানুয়্যাল অথবা বর্ষজীবী ফুলগুলি। প্রথম কিস্তিতে গোলাপও তো ছিল মাত্র এক শত প্রকার। প্রতিটি ভ্যারাইটির মাত্র একটি করে স্যাপলিং। তাছাড়া কিছু ফুল তো ফুটিয়েছিলাম শুধু নামের প্রেমে পড়ে। ফুলের প্রেমে পড়ার মতো ফুলই নয় ওসব।

বেলাল চৌধুরী
সে আবার কেমন কথা। যথা ?

আবদুশ শাকুর
যথা 'কিস মি কুইক' অথবা 'ইয়েস্টার্ডে, টুডে অ্যান্ড টুমরো' জনপ্রিয় এ-দুটি নামের একটি ফুল। এর আসল নাম 'ব্রান্‌ফেল্‌সিয়া লাতিফোলিয়া'। 'ব্রানফেলসিয়া ক্যালিসিনা' অথবা 'ফ্রান্সিসেয়া লাতিফোলিয়া'ও বলে একে। ফোটে ভায়োলেট, তারপরে হয় মোভ্‌ অবশেষে হয়ে যায় হোয়াইট। সেজন্যেই 'গতকাল আজ এবং আগামীকাল' নাম। গভীর বেগনি থেকে একদিনেই ফিকে লালচে বেগনিতে বদলে যায় বলেই ফুলটি বলে পছন্দ হয়ে থাকলে 'কিস মি কুইক'। কেননা এই কালকেই আমি বিধবা হয়ে সাদা থান পরলাম বলে। তাই ফুলটির জনপ্রিয়তর নাম 'চুমো খাও জলদি'।

বেলাল চৌধুরী
ইন্টারেস্টিং।

আবদুশ শাকুর

তারপর যেমন ‘অ্যাকালিফা হিসপিডা’ বা ‘অ্যামারেন্থাস’-নামক বর্ষজীবী ফুলটি। হাতখানেক লম্বা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে থাকা রক্তলাল ফুলটি ঠিক যেন গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা। তাই এর জনপ্রিয় নাম ‘লাভ লাইজ ব্লিডিং’। তারপর যেমন ‘পর্টুল্যাকা’-নামক বর্ষজীবী বহুবর্ণ ফুলটি রোদ গায়ে লাগলে ফোটে এবং রোদ পড়ে যেতেই বোজে। তাই বিদেশে এর জনপ্রিয় নাম ‘সান প্লান্ট’ আর এদেশে ‘অফিস টাইম’। মজাদার নামের এসব সাধারণ ফুলের বিয়োগব্যথা তত অনুভূত হবার কথা নয় গোলাপপ্রেমে বিভোর কোনো মালাকরের।

বেলাল চৌধুরী

তার মানে গোলাপের পরের কিস্তি এলে কোনো কোনো ফুলের বিসর্জনে মনে কষ্ট লেগেছিল। সে কিস্তি এল কবে ?

আবদুশ শাকুর

পরের বছরেই। গোলাপের নতুন চারা বের হয় নভেম্বর-ডিসেম্বরে। দ্বিতীয় বর্ষে বিলুপ্ত হল বাইয়েনিয়্যাল কিংবা দ্বিবর্ষজীবী পুষ্পগুলি যেমন বহুবর্ণ ক্রোকাস আর কিছু লিলি যেমন হাইব্রিড লিলিয়াম ‘এনচ্যান্টমেন্ট’।

বেলাল চৌধুরী

দ্বিবর্ষজীবী কথাটা ঠিক কী বোঝায় মামা ?

আবদুশ শাকুর

যেসব উদ্ভিদ প্রথম বছর অঙ্গ গঠন করে যেমন পাতা বাড়ায়। দ্বিতীয় বছর ফল ফলায় বা ফুল ফোটায় এবং মরে যায়। অধিক পরিচিত সবজির মধ্যে যেমন ক্যারট, ক্যাবেজ ইত্যাদি। লনের ভেতরে বেজায়গায় থাকা বা বেশি ছায়া বিস্তার করা কিছু পেরেনিয়্যাল বা বহুবর্ষজীবীও শহীদ হয়েছিল দ্বিতীয় বছর। যেমন রক্তকরবী, বকুল, রবীন্দ্রনাথের মহাশ্বেতা বা টগর, টেকোমা বা ছন্দপ্রভা, বার্ড অফ প্যারাডাইস বা ইন্দ্রাণী ইত্যাদি। গোলাপের জন্য অন্য ফুলের ট্রেড-অফে আসল সমস্যা দেখা দিয়েছিল তৃতীয় বছর থেকে।

বেলাল চৌধুরী

কী কারণে ?

আবদুশ শাকুর

কারণ একটাই জায়গা চাই। প্রথমত গোলাপের ভ্যারাইটির সংখ্যা বেড়ে চলেছিল সাড়ে তিনশত পেরিয়ে এবং বুশের সংখ্যা সাড়ে সাত শত ছাড়িয়ে। ছাদের কোটাও শেষ। সেখানে বিশ ইঞ্চি তিনশত টব দেখে পূর্তবিভাগের প্রধান প্রকৌশলী, বড় ভাই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে গিয়েছেন ছাদে টব আর বাড়ানো বিল্ডিঙের জন্য বিপজ্জনক হবে। টবগুলি ছিল প্যারাপেট ঘেঁষে এবং বিমগুলোর উপরে। সেরকম সেফ স্পটও শেষ। দ্বিতীয়ত গোলাপের অঙ্গদল-উপদল যেমন হাইব্রিড-টি, ফ্লোরিবান্ডা, গ্র্যান্ডিফ্লোরা, শ্রাব, পলিয়েন্থা, মিনিয়েচার, মিনিফ্লোরা, র‍্যামলার, ক্লাইম্বার সব সমবেত হয়ে গিয়ে শ্লোগান তুলছিল : লেব্‌নরাউম, মোর স্পেস, স্থান চাই আরও। তৃতীয়ত গোলাপের সখের ঘোড়াটাও গ্যালপিং শুরু করে দিল এবং গতিও বাড়িয়ে চলল।

বেলাল চৌধুরী

কী রকম ?

আবদুশ শাকুর

বাংলোটার সম্মুখভাগ আনাচকানাচসহ বিবিধ ধরনের গোলাপ দিয়ে সম্পূর্ণ ভরিয়ে ফেলার পরে লেগে গেলাম বাগানময় বিচিত্র যত গোলাপি দৃশ্য রচনায়। একের পর এক বানিয়ে চললাম স্ট্যান্ডার্ড রোজ হাফ স্ট্যান্ডার্ড, ফুল স্ট্যান্ডার্ড, উইপিং স্ট্যান্ডার্ড। তারপর গড়তে লাগলাম ক্লাইম্বিং রোজ, পিলার রোজ, স্পেসিমেন রোজ, পারগোলা রোজ। গোলাপে এসব খেয়ালের খেলার আসলে শেষ নেই।

বেলাল চৌধুরী

এসবের মানে কী, জানতে ইচ্ছে হলেও বিরত থাকতে হচ্ছে।

আবদুশ শাকুর

আমার জানাবার ইচ্ছাও হচ্ছে না মামা। কারণ এসব হল মোহাবিষ্ট রোজারিয়ানদের ভূতের বোঝা। বলছিলাম যে এই পর্যায়েই গোলাপ যেন তার প্রতি আমার প্রেমের পরীক্ষাই নিয়ে নিল। ট্রেড-অফে স্বভাবতই গোলাপ জিতে গেল এবং আমাকে আমার অতি প্রিয় অনেক বহুবর্ষজীবী ফুলের মায়াও ত্যাগ করতে হল। যেমন প্লাম্ব্যাগো বা নয়নবিলাস, গার্ডেনিয়া বা গন্ধরাজ, ইগ্‌জোরা বা রঙ্গন, পয়েনসেটিয়া বা পত্রমঞ্জরী, বিশেষত এই ইউফর্বিয়া পুলচেরিমার ইগ্‌জটিক ভ্যারাইটি প্লেনিসিমা, যাকে ডাবল পয়েনসেটিয়াও বলে, হাস্নাহেনা বা রাত কি রানী, গ্র্যান্ড ডিউক অফ টাসক্যানি কিংবা মগরা বেলা বা শতদল বেলী, মুরায়া ইগ্‌জটিকা কিংবা কামিনী ইত্যাদি।

বেলাল চৌধুরী
বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ বলতে কি শতবর্ষজীবীগুলিও বোঝাবে ?

আবদুশ শাকুর
শতাধিকবর্ষজীবীদেরকেও বোঝাবে। যদিও শতবর্ষ পরে ফুল ধরে বলে বিশেষ করে অ্যাগেভ-নামের বৃক্ষটিকে শতবর্ষী গাছ বলে। তবে পেরেনিয়্যালগুলোকে বহুবর্ষজীবীর বদলে দীর্ঘজীবী বলাই ভালো।

বেলাল চৌধুরী
প্রথম ফুল দিতে এক শ বছর লাগে ?

আবদুশ শাকুর
লাগে। এবং প্রথম ফুলটি দিয়েই তরুটি মরে। এ জাতের গাছগুলোকে বলে মনোকারপিক বৃক্ষ। অনেক বাঁশ গাছে, পাম গাছে ফুল আসতে ১২ থেকে ১২০ বৎসর সময়ও লেগে যায় এবং সেই একটিবার ফুল ফুটিয়েই বৃক্ষগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বেলাল চৌধুরী
তুলনায় মানুষের তো দেখা যায় চালিকাশক্তি অনেক বেশি বহুবার ফুল ফুটিয়েও শতোর্ধ্ব বৎসর বেঁচে থাকতে পারে। একটা প্রশ্ন অনেক ক্ষণ থেকেই করতে চাচ্ছিলাম যে এত বড় একটা বাগানে এত সব গাছ উৎখাত করার গরজ কি সত্যি ছিল ?

আবদুশ শাকুর
গরজ তো বিলকুল ছিল না। কিন্তু সখটা ছিল প্রবল।

বেলাল চৌধুরী
প্রিয় ফুল উৎখাত করার সখ ?

আবদুশ শাকুর
হাঁ। প্রিয়তম ফুলটি ফোটানোর জন্য। ততদিনে গোলাপের প্রতি আমার মনোভাবটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এমনি যে বাগানটির যেদিকেই চাই যেন কেবল গোলাপই দেখতে পাই।

বেলাল চৌধুরী

সে ব্যবস্থা কি করতে পেরেছিলেন ?

আবদুশ শাকুর

তখন পেরেছিলাম। এখন গোলাপ ছাড়া এটা সেটা দেখে বলছেন তো ? না, দক্ষিণের রোজবেডের বাইরের আধোআলো আধোছায়ার জায়গায় দেশি সুগন্ধ ফুলের গুল্মগুলো তো নয়ই, দেওয়ালের গায়ে লতানো কোনো ক্রিপারও ছিল না এই সব অপরাজিতা, ঝুমকোলতা, গোল্ডেন শাওয়ার্স, বুনিয়া।

বেলাল চৌধুরী

সমস্ত অঙ্গনের কোথাও গোলাপ ছাড়া একটা ফুলও ছিল না ? ভেবেই বলুন।

আবদুশ শাকুর

বলছি। তাই তো। আপনার সন্দেহ সমূলক। একটা ফুল বেঁচে গিয়েছিল নির্বাসন থেকে কিছুটা নিজের গুণে, কিছুটা জিনাস কিংবা গণের গুণে। সুগঠিত নিবিড় ঝোপের ওপর লালচে গোলাপি রঙের শামিয়ানা-সাজানো ফুলটা ছিল ইন্ডিকা গ্রুপের অ্যাজালিয়া। গুল্মটির প্রতি আমার প্রাথমিক দুর্বলতার কারণটি ছিল, এটি শীতল শৈলপুষ্প রডোডেনড্রন-গণের একটি উষ্ণসমতল-সহ প্রজাতি যে রোমান্টিক নামের ফুলটিকে আমার তরুণ মনে বপন করে দিয়েছিলেন প্রবীণ কবি রবীন্দ্রনাথ ওরফে নবীন কবি নিবারণ চক্রবর্তী 'শেষের কবিতায়'। সংঘাত-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই শকট-সংঘাতের পরে ঘরে ফিরে অমিতের আবাহন 'কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী ! এইবার ভর করো আমার 'পরে বাণী দাও, বাণী দাও।' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি / আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।' মনে পড়ছে না মামা ?

বেলাল চৌধুরী

'হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেন্‌ড্রন্‌গুচ্ছ।'

এ তো গেল জিনাসের গুণ। নিজের কোন্‌ গুণটিতে টিকে গেল অ্যাজালিয়া?

আবদুশ শাকুর

গোলাপের কোনো কাজেই লাগবে না তেমন কোনো বেজায়গায় ফুলটিকে রাখা যায় কিনা সে আশায় গুল্মটার ওপর পড়াশোনা করার প্রক্রিয়ায় জানতে পেলাম যে Azalea thrives best in filtered light under a large tree। ব্যস পেয়ে গেলাম জায়গা বাগানের যে-কোণে বাইরের এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া এসে পড়েছে। ওই যে দেখা যাচ্ছে যদিও পরিচর্যার অভাবে আজ বড়ই ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে উচ্ছল উদ্ভিদটিকে।

বেলাল চৌধুরী

ফুল দেখছি না যে।

আবদুশ শাকুর

ফুল ফোটে মধুমাসে, মানে চৈত্র-বৈশাখে। থাকে মধ্য গ্রীষ্ম পর্যন্ত। তবে সত্যের খাতিরে আরেকটি স্বীকারোক্তি আমাকে করতেই হচ্ছে হঠাৎ মনে পড়ল বলে।

বেলাল চৌধুরী

কনফেশন অফ আবদুশ শাকুর ? করুন।

আবদুশ শাকুর

এটা একদম ঠিক যে ফুল আর একটিও ছিল না। তবে ফুলের দুটি প্রোটেক্টার কিন্তু ছিল এক দারোয়ান আর এক দেহরক্ষী। দারোয়ানটা আজও আছে।

বেলাল চৌধুরী

ফুলের দারোয়ান কথাটা কি রসোক্তি ?

আবদুশ শাকুর

না মামা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উক্তি। এই যে বাগান মাত করা এত রঙের বাহার দেখি আমরা মুসায়েন্ডাতে সেগুলো কিন্তু ফুল নয়, ফুলের পাপড়িও নয়, ফুলের রক্ষাকর্তা সেপাল বা বৃত্যংশমাত্র। সেপাল কর্তৃক ভিতরে সংরক্ষিত মুসায়েন্ডা বা পত্রলেখা ফুলটি এত মামুলি একটি বস্তু যে ওটি দেখার মতো কিছুই নয়। তবু গোলাপফুলের খাতিরেও বাগানবাহার এই পত্রলেখা গুল্মটিকে আমি দু-তিন সিজন তাড়াতে পারিনি তার ফুলের রূপের জন্য নয়, ফুলের রক্ষকের রূপের জন্য।

বেলাল চৌধুরী
না-তাড়ালেও তো পারতেন। ওদের জন্য কী পরিমাণ জায়গা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল গোলাপ ?

আবদুশ শাকুর
কথাটা জায়গার ছিল না। ছিল গোলাপ ছাড়া আর কিছু দেখা না-যাওয়ার। তবে 'মুসায়েন্ডা এরিথ্রোফিলা'রও ছিল দারুণ যত দেখা-যাওয়া। একটা ছিল 'স্কার্লেট'-নামের কমলা-ঘেঁষা উজ্জ্বল লাল। একটা ছিল 'রোজিয়া'-নামের পাটকিলে-হলদে। একটা ছিল 'কুইন সিরিকিত্'-নামের গোলাপাভ সাদা। তিনটা ঝাঁকড়া ঝোপ জায়গাও নিয়েছিল বেশ।

বেলাল চৌধুরী
ফুলের দারোয়ানের গল্প তো ভালোই ফাঁদলেন মামা। এবার ফুলের দেহরক্ষীর কাহিনীটি শুনি।

আবদুশ শাকুর
কাহিনীটি বুগেনভিলিয়া বা বাগানবিলাসের। এই ক্লাইম্বারটির ফুল বলতে রঙিন কাগজের মতো যেগুলো আমরা দেখি সেগুলো কিন্তু ফুল নয়, ফুলের নিকটতম আবরণী কিংবা দেহরক্ষী ব্র্যাক্ট বা পুষ্পধরমঞ্জরী। এই পত্রমঞ্জরীর নিচে বুগেনভিলিয়ার নগণ্য ফুলটি সুরক্ষিত থাকে, যেটি দেখার মতো কোনো বস্তুই নয়। পেটালের নিচে থাকে সেপাল, তার নিচে থাকে মুসায়েন্ডার ফুল। সেজন্যে আমি সেপালকে মুসায়েন্ডাফুলের গৃহরক্ষী বা দারোয়ান বলি। কিন্তু ব্র্যাক্ট যেহেতু সেপালেরও নিচে থাকে এবং তার নিচে থাকে বুগেনভিলিয়ার ফুল সেহেতু ব্র্যাক্টকে আমি বুগেনভিলিয়াফুলের দেহরক্ষী বা রক্ষাকর্তা বলি।

বেলাল চৌধুরী
কিন্তু বুগেনভিলিয়াকে তাড়ানো কেন ? ক্লাইম্বার তো কিনারেই থাকে।

আবদুশ শাকুর
শক্তিশালী ওই আরোহী উদ্ভিদটির প্রসারণপ্রবণ ছায়া থেকে আমার প্রান্তিক মিনিয়েচার-পলিয়েন্থার মতো নাজুক গোলাপগুলোকে বাঁচানোর জন্য।

বেলাল চৌধুরী
কেটেছেঁটে রাখা যেত না ?

আবদুশ শাকুর

কত ছাঁটবেন ? বেশি ছাঁটলে-যে ফুলের বাহার মার খায়। তা ছাড়া ওসব ইগ্‌জটিক ভ্যারাইটির একটা শাখায়ও কি আঘাত হানতে মন চায় ! একটা ছিল ‘লেডি ম্যারি বেয়ারিং’-নামক নাইরোবির পীতবর্ণ বুগেনভিলিয়া বুটিয়ানা। একটা ছিল ‘ওডিসি’-নামক উড়িষ্যার সাদার ছোপশোভিত নীলাভ লাল বুগেনভিলিয়া পেরুভিয়ানা। একটা ছিল ‘রিফালজেন্স’-নামক ব্রিসবেনের গভীর লালচে বেগনিমিশ্রিত নীলাভ লাল বুগেনভিলিয়া স্পেক্ট্যাবিলিস। এই বিচিত্র বর্ণ কেবল বোধ করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

বেলাল চৌধুরী

তাই তো ব্যাখ্যার অতীত অনেক কিছুকেই লোকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা বলে ছেড়ে দেয়। সে যাক। আপনার জমজমাট পুষ্পজগতটির মধ্যে পুষ্পরানী এল কোন্ সালে ?

আবদুশ শাকুর

পয়লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ সালে।

বেলাল চৌধুরী

একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে ?

আবদুশ শাকুর

তেমন কিছু নয়। তবে গোলাপের উদ্দেশে উড়ান দেবার জন্যে সে-সময় আমার মন কেমন করছিল ঠিকই। ওই বিশেষ দিনটিতে কী-কারণে যেন প্রচণ্ড যানজট ছিল কিংবা কিছু রাস্তা বন্ধ ছিল। সচিবালয়ের অফিস থেকে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার দু’নম্বর রোডে আমার আবাসটিতে ফেরার সময় ঘুরপথ নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের এক নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে দু’নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে আমার গৃহপ্রবেশ ঘটেছিল সেদিন উল্টো দিক থেকে। সে পথে বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের দক্ষিণ এবং উত্তরের দুটি বিশাল গোলাপ বাগান ক্রস করার সময় রকমারি গোলাপের রঙের কোলাহল আমাকে পাগল করে থামিয়ে দিলে দেখতে পেলাম চারা বিক্রি হচ্ছে। তবে আর কথা কী। শ’খানেক গোলাপের চারা কিনে পেমেন্টের জন্যে ওদের এক মালিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে আবিষ্কার করলাম যে রকমারি মরশুমি ফুলের মেলায় গোলাপের চারাগুলো জড়ো করে রাখার জায়গাও আমার রেডি নেই।

বেলাল চৌধুরী
তার পর কি পতন ও মূর্চ্ছা ?

আবদুশ শাকুর
ওটাই হত যদি জানতাম যে কমপক্ষে ছয়টি মাস আগেই নির্মাণ শেষ করতে হয় গোলাপের তিন তলা বাড়ি।

বেলাল চৌধুরী
তিন তলা ?

আবদুশ শাকুর
হ্যাঁ, ত্রিতল অট্টালিকার ছাদে দাঁড়িয়েই মুক্ত রোদ-বায়ু সেবন করে পুষ্প-মুকুটখানি শিরে ধারণ করে থাকেন পুষ্পরানী। এবং আপনি পুষ্পরানীর রূপ দেখে কবিতা লেখেন।

বেলাল চৌধুরী
লিখলেও ফুলটি এমন যে সে আর কিছুই দেখতে দেয় না। সে যাক। আপনি নিশ্চয় গোলাপের বেডের কথা বলছেন। আমিও শুনেছি এই ফুলটির শয্যাও একেবারে ফুলশয্যার মতোই স্পেশাল। কিন্তু তিন-তলার ব্যাপারটা কী ?

আবদুশ শাকুর
পুষ্পরানীর যেমন মাথার ওপর ছায়া সয় না, তেমনি পায়ের তলায় কাদাও সয় না। আবার অনার্দ্রতাও তাঁর অপছন্দ। তাই তাঁর পা ধুয়ে দিতে হয় ক্ষণে ক্ষণে, আবার মুছেও দিতে হয় পরক্ষণে। এজন্যে আমাদের এখানে গোলাপের বেডটির মাটির মোটামুটি সাতাশ ইঞ্চি নিচে থেকে গভীরতম তৃতীয়াংশটি ভরতে হয় সিলেটি কোর্স স্যান্ড বা মোটা লাল বালি দিয়ে। তার ওপরের তৃতীয়াংশটি ভরতে হয় পোরাস্ পিক ঝামা বা ঝাঁজরা বেশি-পোড়া ঝামা দিয়ে। আর অবশিষ্ট তৃতীয়াংশটি ফিলাপ করতে হয় কোয়ালিটি ভিটিমাটি আর জৈবসার-পাতাসার ইত্যাদি দিয়ে। এতসব তওরতরিকা কেবল গোলাপের শিকড়ের আর্দ্রতা আর অনার্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাবাবদ। ব্যবস্থাটা মোটা কথায় গোলাপের শেকড়গুলোকে জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করার।

বেলাল চৌধুরী
শুরুটাই তো দেখছি বেশ ভজকট। এবং ব্যয়বহুলও।

আবদুশ শাকুর

সবটাই তাই। কাজেই জ্ঞাত ইতিহাস জুড়ে দেখা যাবে গোলাপ কেবলি ধনীর দুলালী। কিন্তু আমি মামা বিষয়গত কথার চেয়ে বিষয়ীগত আলাপেই বেশি আনন্দ পাই। তাই গোলাপের সাধারণ খোঁজখবর সংক্রান্ত আলাপে আমার বিশেষ আগ্রহ যেমন নেই, বিশেষ যোগ্যতাও তেমন নেই। তবে হ্যান্ডি কিছু বইয়ের রেফারেন্স দিতে পারি যদি সেদিকে উৎসাহ থাকে আপনার।

বেলাল চৌধুরী

দিন না, শুনে রাখি। আপনার 'গোলাপ বিসংবাদ' রচনাটি আমার মনে নানারকমের কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

আবদুশ শাকুর

ডক্টর বি.পি.পালের 'দি রোজ ইন ইন্ডিয়া' তো উপমহাদেশের গোলাপের বাইবেল। বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই বাইবেলটির নাম হবে সম্ভবত 'মডার্ন রোজেস', নিউইয়র্কের ম্যাকফার্ল্যান্ডের। অবশ্য সমগ্র গোলাপবিশ্বের সর্বাঙ্গীণ এই চেকলিস্টটির বর্তমান প্রকাশক অ্যামেরিক্যান রোজ সোসাইটি। এর পর সিন্ ম্যকক্যানের 'মিনিয়েচার রোজেস'। লন্ডনের লেনার্ড হলিসের 'রোজেস', কিউ গার্ডেনিং গাইড সিরিজে ডেভিড ওয়েলশের 'রোজেস', ট্রেভর গ্রিফিথ্সের 'দ্য বুক অফ ওল্ড রোজেস', মিলার গল্ট অ্যান্ট প্যাট্রিক সিঙের 'দ্য ডিকশনারি অফ রোজেস'?

বেলাল চৌধুরী

নাম শুনেই মনে হচ্ছে এসব রেফারেন্স-কেতাবও বেশ ওজস্বীই। একেবারে চটি বইয়ের নাম বলুন কিছু, অবশ্য যদি থাকে।

আবদুশ শাকুর

ঢাকার মুফতি নুরুন্নেছা খাতুন, এ.এস.এম.কামালুদ্দীন, কোলকাতার ভিক্ষু বুদ্ধদেব, বেলা দে এবং বন্যা-লীনা-নাম্নী বিশ্বাস ভগ্নীদ্বয়ের গোলাপবিষয়ক বইগুলো বেশ সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত। দিল্লীর ডক্টর বি.পি.পালের 'অল অ্যাবাউট রোজেস', লন্ডনের ডক্টর হেসায়নের 'দ্য রোজ এক্সপার্ট', ক্যালিফোর্নিয়ার সানসেট পাবলিশিঙের 'রোজেস', নিউইয়র্কের অ্যাভন বুক্সের 'বিউটিফুল রোজেস', ডক্টর টমি কেয়ার্নসের 'অল অ্যাবাউট রোজেস'। এগুলোও নিতান্ত বিগিনার্সের জন্যই লিখিত।

বেলাল চৌধুরী
এগুলোর মধ্যে গোলাপের মৌলিক বৈজ্ঞানিক পরিচয়টা কি পাওয়া যাবে ?

আবদুশ শাকুর
না মামা।

বেলাল চৌধুরী
তাহলে আপনি শুধু এইটুকু বলুন যাতে পুষ্পরানী আমার কাছে একেবারে অজ্ঞাতকুলশীলা না থাকে।

আবদুশ শাকুর
আমাদের প্রাণিজগতের প্রতিবেশী উদ্ভিদজগতকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের অ্যারিস্টটল-থিওফ্রেস্টাস প্রমুখ ভাগ করেছেন হার্ব-শ্রাব-ট্রি কিংবা লতা-গুল্ম-বৃক্ষে। এরা আবার অপুষ্পক যেমন ফার্ন বা পর্ণাঙ্গ আর সপুষ্পক যেমন গোলাপ। শেষেরটা আবার দুই শ্রেণীর : মনোকটিলিডনাস অথবা একবীজপত্রী যেমন ধান, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি আর ডাইকটিলিডনাস কিংবা দ্বিবীজপত্রী যেমন ডাল, শিম, গোলাপ গয়রহ। এই ক্লাস বা শ্রেণীর অধীনে আছে অর্ডার বা বর্গ। গোলাপের বর্গ বা রোজ-অর্ডার হল রোজালেস, ফ্যামিলি কিংবা গোত্র হল রোজেসি, জিনাস কিংবা গণ হল রোজা। স্পিশিস হল প্রজাতি যেটা লিখতে হয় জিনাস কিংবা গণসহ, যেমন রোজা অ্যালবা বা সাদাগোলাপ। জগতে গোলাপের স্বীকৃত এবং বর্ণিত প্রজাতি আছে অল্পাধিক দেড় শত। যথা রোজা গ্যালিকা বা লালগোলাপ। স্পিশিসের বহু ভ্যারাইটি কিংবা প্রকার থাকে। এক রকমের প্রকার হল প্রাকৃতিক সঙ্করায়ণপ্রসূত, যেমন প্রথম আধুনিক গোলাপটি 'লা ফ্রঁস'। আরেক ধরনের প্রকার হল মানবিক সঙ্করায়ণজনিত, যেমন উপমহাদেশে গোলাপপ্রজননের পথিকৃৎ ডক্টর বি.পি.পাল কর্তৃক সঙ্করায়িত 'দিবাস্বপ্ন'। মানুষের কাল্টিভেট করা গোলাপের ভ্যারাইটিগুলোকে বলে কাল্টিভার। এই কাল্টিভারই মাতিয়ে রেখেছে আজকের সমগ্র বিশ্বের আধুনিক গোলাপবাগানগুলোকে। কাল্টিভেটেড ভ্যারাইটির সংখ্যা বছর দশেক আগে ছিল বিশ হাজারের মতো। এখন হয়তো ত্রিশ হাজারে পৌঁছেছে। পুষ্পরানীর কুলপরিচয় দিতে গিয়ে বৃক্ষরানীর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর সম্পর্কে একটু বলব ?

বেলাল চৌধুরী
বৃক্ষরানীও আছে নাকি উদ্ভিদ জগতে ?

আবদুশ শাকুর
আছে। কেবল নামধামটাই বলি ?

বেলাল চৌধুরী
অবশ্য। বৃক্ষরানী-শব্দটাই তো শোনা যায় না।

আবদুশ শাকুর
শব্দটা ট্রপিক্যাল গার্ডেন-প্লান্টের চর্চা যাঁরা করেন তাঁদেরও মুখে আছে কিনা জানি না, তবে তাঁদের সকল কেতাবেই আছে। এর জন্মভূমি আমাদের বাড়ির পাশের ব্রহ্মদেশ। নাম : Amherstia nobilis (নোব্‌ল অ্যাম্যার্স্টিয়া)। বার্মার এককালীন গভর্নর অ্যাম্যার্স্ট-পত্নী Countess Amherst এবং তদীয় কন্যা লেডি সারাহ অ্যাম্যার্স্টের নামানুসারে এই নামকরণ। গাছটার বাংলা নাম 'সীমন্তক'। উদ্ভিদপ্রেমীগণ এঁকে একবাক্যে বলেন 'কুইন অফ দ্য ফ্লাওয়ারিং ট্রিজ'। অনেকে তো আরো আগে বেড়ে বলেন 'ট্রি অফ হেভেন'। ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম একে 'স্বর্গীয় বৃক্ষ' কেন বলে। বাস্তবে দেখে তো সাক্ষাত পারিজাতই মনে হয়েছে।

বেলাল চৌধুরী
আমাকে তো এবার ভূগোলের ভাষায় প্রশ্ন করতে হয়?এই গাছের সৌন্দর্য কী ও কোথায়।

আবদুশ শাকুর
এক কথায় সর্বত্র চূড়ায়, পাতায় এবং পুষ্পে। পাতা তো জন্মমাত্রই বর্ণের বিচিত্র এক রঙ-ফেরতা প্রদর্শনীর সৃষ্টি করে গোলাপি, তামাটে, বেগনি কিংবা নীলাভ লালের লীলাখেলা দেখানোর পরে চকচকে সবুজের অন্তিম রূপটি নেয়। হলুদপ্রান্তিক উজ্জ্বল লাল পাপড়ির ফুলগুলো গুচ্ছে গুচ্ছে ঝুলে থাকে সুসমন্বিত হ্রস্ব-দীর্ঘ বৃন্তের শঙ্কুসদৃশ শতসহস্র লকেট হয়ে। স্বভাবতই ফুলগুলোর নিচের বোঁটা খাটো আর উপরের ডাঁটা লম্বা যেমন উপরের পাপড়ি বৃহত্তর আর নিচের পাপড়ি ক্ষুদ্রতর। কোলকাতায় এই স্বর্গীয় বৃক্ষটির ফুল ফোটে কেবল ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত, কিন্তু পাতা ধরে বছরে বেশ কয়েকবার। তাই পাতার বাহার প্রায়ই দেখা যায় যার আকর্ষণ ফুলের থেকে একটুও কম নয়।

বেলাল চৌধুরী
পুষ্পরানীর সঙ্গে এক নিশ্বাসে উল্লেখ করার মতোই মনে হচ্ছে এই বৃক্ষরানীকে।

আবদুশ শাকুর

পৃথিবীর সুন্দরতম বৃক্ষ বলে কথিত সীমন্তক-নামক এই তরুটি কিন্তু এক ব্যাপারে এবং এক বিচারে গোলাপের উপরেও গণ্য হতে পারে। এর জিনাসে কোনো দ্বিতীয় প্রজাতি নেই বিধায় ইনি অদ্বিতীয়া যেখানে গোলাপের জিনাসে বহু প্রজাতি আছে বলে তিনি বহুরূপা। কোন্‌টা অধিক গৌরবের মনে হয় মামা ?

বেলাল চৌধুরী

ভাববার বিষয় বটে। আচ্ছা মামা, ওই যে বাগানের দূরের কোণে বিচিত্র রঙের বিরাট বিশাল একটা গোলাপ দেখা যাচ্ছে, ওটার নাম কী ? ওটাই কি সব চেয়ে বড় গোলাপ ?

আবদুশ শাকুর

গোলাপটির নাম 'অ্যারিয়ানা'। সব চেয়ে নয়, তবে অন্যতম বড় গোলাপ এটি যদিও মাত্র পঁয়ত্রিশ পাপড়ির। ওই কাল্টিভারটির সংকরায়ক ফ্রান্সের বিখ্যাত রোজ-ব্রিডার মেইয়ঁ ঘরানা। ওর বিচিত্র রঙটিকে বলে কারমাইন-রোজ। 'হাইব্রিড'-টি এই গোলাপটি চায়ের জোরালো সুগন্ধের জন্য বিশিষ্ট। এরকমই বড় লাল গোলাপ পঁয়তাল্লিশ পাপড়ির 'মিরান্ডি', একই সংখ্যক পাপড়ির হলুদ গোলাপ 'পিস', পঞ্চান্ন পাপড়ির সাদা গোলাপ 'গার্ডেন পার্টি', আটষট্টি পাপড়ির কালার-ব্লেন্ড 'কর্ডেস পারফেক্টা', সোনালি হলুদ 'ডাচ গোল্ড', লাল-মেশানো গোলাপি রঙের এক্সট্রা লার্জ 'ফার্স্ট প্রাইজ', ভারতীয় লালগোলাপ 'ভীম'ও বেশ বড়। গভীর গোলাপি রংয়ের মার্কিন গোলাপ 'তাজমহল'ও বিরাট বিশাল। তবে একই রঙের 'মারিয়া ক্যালাস'কে তো কেতাবেই লেখে জায়েন্ট-সাইজ্‌ড'

বেলাল চৌধুরী

মারিয়া ক্যালাস মানে সেই বিখ্যাত ইতালিয়ান সোপ্রানো গায়িকা ?

আবদুশ শাকুর

হাঁ।

বেলাল চৌধুরী

গোলাপের এত চটকদার নামের মাজেজাটা কী মামা ?

আবদুশ শাকুর

কিছুই না। রোজ-ব্রিডাররা সংকরায়ণের প্রক্রিয়ায় অসাধারণ গুণের কোনো গোলাপ পেয়ে গেলে নাম রেখে দেয় তাদের প্রিয় কোনো ব্যক্তি কিংবা বস্তুর নামে। যেমন আমি বিরল রূপের কোনো গোলাপ উদ্ভাবন করতে পারলে নাম দিতাম মধুবালা, আমার প্রথম যৌবনের মন-কেমন কারিণী নায়িকাটির সম্মানে। আর সেই তরল রূপের সঙ্গে বিরল সুগন্ধও থাকলে নাম দিতাম সুচিত্রা সেন আমার পরবর্তী জীবনের অদ্বিতীয়া নায়িকাটির প্রতি নীরব নৈবেদ্যস্বরূপ।

বেলাল চৌধুরী

কিন্তু সুগন্ধ কি থাকে আধুনিক গোলাপে ?

আবদুশ শাকুর

আমেরিকার বিশিষ্ট গোলাপবিদ ডক্টর ল্যামার্ট্স তাঁর গবেষণার বরাতে ১৯৫১ সালের আমেরিক্যান রোজ অ্যানুয়ালে জানাচ্ছেন যে সুগন্ধ থাকে না কথাটা ঠিক নয়। আধুনিক গোলাপে সাবেকি গোলাপের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় সুগিন্ধ গোলাপের ভ্যারাইটি পাওয়া সম্ভব। কথাটা তিনি বলছিলেন কেবল ১৯৩৫ সালে জন্মানো ক্রিমসন গ্লোরি, ১৯৪৫ সালের মিরান্ডি, ১৯৪৯ সালের এনা হার্কনেস প্রভৃতি গুটিকতকমাত্র সুগন্ধি আধুনিকার স্মৃতির ভিত্তিতে। নতুবা সত্য এই যে গোলাপের গড়ন ও রঙের সঙ্গে সুগন্ধের ওপরও সংকরকদের মন ও শ্রম সচেতনভাবে যুক্ত হয়েছে, বলতে গেলে, ষাটের দশক থেকেই। ফলে আমরা পেয়েছি এক-মিছিল সুগন্ধি গোলাপ ১৯৬৩-তে পাপা মেইয়ঁ, ১৯৬৪-তে মিস্টার লিংকন, ১৯৬৮ সালে এঞ্জেল ফেস, ১৯৭৭ সালে ডাবল ডিলাইটের মতো মাতোয়ারা-করা গন্ধরানীদের। আমেরিকার আর্মস্ট্রং নার্সারির সৃষ্টি, গন্ধে-বর্ণে একক এই ‘ডাবল ডিলাইট’ গোলাপটি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত গোলাপঘরানার হার্কনিস-ক্যাটালগে বর্ণিত হয়েছে ‘স্ট্রবেরির রসে ডোবা ভ্যানিলা বরফ’ বলে। অতিথি আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে ফুলটিকে আমি গেটের ধারেই লাগিয়েছি। যাবার সময় এটির ঘ্রাণ নিয়ে যেতে পারেন শেক্সপিয়ারের সনেট আবৃত্তি করতে করতে : The rose looks fair, but fairer we it deem, For that sweet odour which doth in it live.

বেলাল চৌধুরী

সত্যিই কি পাব সেই ঘ্রাণ, ছোট থাকতে গ্রামের বাড়িতে ভোরবেলায় গাছের ডগায় ফুটে থাকা গোলাপটি শুঁকে যেটা পেতাম ?

আবদুশ শাকুর

ছোটবেলার শোঁকার সে-নাকটাও কি আর পাবেন ? তবে এ-ও ঠিক যে রাসায়নিক সারপ্রসূত আধুনিক গোলাপের অগভীর উগ্র সুরভিতে জৈবিক সারজনিত পুরাতন বাগানগোলাপের নম্র নিবিড় সুবাসটি হুবহু লভ্য না-ও হতে পারে। আসলে ওল্ডগার্ডেন রোজে একটা নস্টালজিয়ার মাত্রাও যুক্ত হয়।

বেলাল চৌধুরী

সেই গোলাপের গন্ধে মোহিত হয়েই তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোলাপের নাম দিয়েছিলেন গোলাবলাল গন্ধ্যোপাধ্যায়।

আবদুশ শাকুর

দারুণ মনে করেছেন তো মামা। কমলাকান্তের আফিমপ্রসাদাৎ দৃষ্ট, শ্রুত এবং বর্ণিত ‘ফুলের বিবাহ’ আমার বিশেষ ফেভারিট একটা রচনা। ভুলত্রুটি নিজ গুণে মার্জনীয়। স্মৃতি থেকে বলছি :‘ভ্রমর ‘বর অতি সুপাত্র। তাঁর অনেক গুণ্-ন-ন।’ ‘কে তিনি’গোলাবলাল গন্ধ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনেক গুণ্-ন-ন্।’...গোলাব বংশ বড় কুলীন...ইহারা সাক্ষাত বাঞ্ছামালীর সন্তান, তাহার

স্বহস্তরোপিত।’...আমি বলব, সেই বাঞ্ছাকল্পতরুটি হওয়ার কারণেই বনেদি গন্ধটুকু হারালেও লঘু খোশবুর বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নতুন একটি রত্নভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক ‘গন্ধ্যোপাধ্যায়’ মহাশয়ের কুলীন বংশে। যেমন গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের ফ্লোরিবান্ডা ‘অ্যাঞ্জেল ফেসে’র, কমলা-ঘেঁষা হলদে রঙের ‘ক্যারিজমা’র, সাদা হাইব্রিড-টি ‘ভার্গো’র, সিঁদুরে রঙের হাইব্রিড-টি ‘প্রিন্সেসে’র হালকা বিশিষ্ট খোশবুগুলো যেন ফ্রান্সিস বেকনকেই স্মরণ করায় সর্বদা `it comes and goes, like the warbling of music’|

বেলাল চৌধুরী

তা সুরভির জাগলারি তো দেখাতেই পারে গোলাপ। বন্য থাকতেই বিশ্ববিজয় করেছে সে কী দিয়ে ? গন্ধ দিয়ে না করলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের একজন বলতেন না :

‘আর গোলাপই শুধু পেয়েছে সেই
গন্ধ-সুধা যা বিশ্বে নেই।’

আবদুশ শাকুর

জন কীটস ? And the Rose herself has got Perfume which on earth is not

ইয়েস মামা, আদ্য কালে শুধু গন্ধ দিয়েই বিশ্ববিজয় করেছে গোলাপ। বিষয়বস্তুবিশেষজ্ঞ হেনেস বলেছেন মানুষ প্রথম যেদিন গোলাপ দেখেছে, সেদিনই

ফুলটির সুরভি মানুষের চিন্তা ভাবনা ধারণা কল্পনা সবই দখল করে ফেলেছে। পি.বি.শেলি কিন্তু সৌরভের সঙ্গে গোলাপের একক একটি সৌন্দর্যের কথাও বলেছেন। শুধু গোলাপের কেন, সৃষ্টির সুন্দরতম সে-ক্রিয়াটির কথা পারস্যের শ্রেষ্ঠতম রোম্যান্টিক কবি হাফিজও বলেছেন। তিনি বলেছেন আমার পূর্ণ তৃপ্তি প্রভাতে প্রস্ফুটিত গোলাপটির এককালীন দর্শনে নয়, উষার আলো-আঁধারে গোলাপকলির উন্মোচন-ক্রিয়াটির অনুপুঙ্খ সন্দর্শনে।

বেলাল চৌধুরী
শেলি কী বলেছেন ?

আবদুশ শাকুর
মুখস্থ তো নেই। দেখে বলছি :And the rose like a nymph to
the bath addrest,
Which unveiled the depth of
her glowing breast,
Till, fold after fold, to the
fainting air,
The soul of her beauty
and love lay bare.

সত্যিই মামা প্রকৃতির মহত্তম হেঁয়ালি এই গোলাপকলির বঙ্কিম বন্ধন পরতে পরতে খুলে গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠার মতো উপভোগ্য রহস্য উন্মোচন আর আছে কেবল নারীতে। এইসব কমন লক্ষণের কারণেই সময় সময় রোজ আর রমণীকে আমার সিননিমাস মনে হয়।

বেলাল চৌধুরী
প্রায় সমার্থক ভাবা যায় বইকি। বর্ণিত এই মনোহরণ দৃশ্যটি বন্যগোলাপেও ছিল কী ?

আবদুশ শাকুর
না থাকলে গোলাপ নামপদবাচ্যই হত না।

বেলাল চৌধুরী
কেমন ছিল মামা মানুষের দেখা প্রথম সেই প্রাচীন গোলাপটি ?

আবদুশ শাকুর

আজকের আধুনিক গোলাপটির তুলনায় সাদামাটা বললেও বেশি বলা হবে। একরঙা এবং সিঙ্গেল।

বেলাল চৌধুরী

সিঙ্গেল মানে ?

আবদুশ শাকুর

মানে আজকের দিনের ডাবল নয়। সেমি-ডাবলও নয়। গোলাপের সিঙ্গেল মানে সাধারণত পাঁচটি পাপড়ি। দু'একটি প্রজাতিতে মাত্র চারটি পাপড়ি। তবে পাপড়ি হলেও গোলাপের তো। তারও তো রূপটি এককই। নমুনা দেখতে হলে শুধু নিউইয়র্কের অ্যাভন-বুকস প্রকাশনার 'বিউটিফুল রোজেস' পুস্তকটির পুস্তানিটি খুলে দেখুন। মলাটসংলগ্ন দুটি মোটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে কেবল গোলাপের পাপড়ি আর পাপড়ি। আমি তো পুস্তানিটি থেকে চোখ তুলে পুস্তকেই ঢুকতে পারি না। পাপড়ি যখন আমার চোখ আটকে রাখে, মন ছুটে যায় মরমী কবি রুমীর পাপড়িবন্দনায় :'গোলাপ ছিঁড়িয়া কেহ কি পেরেছে হাসি তার কেড়ে নিতে ? ধুলোয় পড়েও হাসি ফোটে তার পাপড়িতে পাপড়িতে। অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বেলাল চৌধুরী

কেড়ে নিতে পারেনি তার কান্নাও। যেজন্যে কবরের গায়ে ছড়ানো দেখি কেবল গোলাপেরই পাপড়ি।

আবদুশ শাকুর

সমাধিতে গোলাপ ট্র্যাজিক সৌন্দর্যেরই প্রতীক। সেখানে চন্দ্রমল্লিকা কিংবা ডালিয়ার কথা ভাবাও যেন পাপ। রফিক আজাদ ভালোই বলেছেন আমার চেতনায় সেই বিশুদ্ধ গোলাপ / মৃত্যুর মতন চিরস্মরণীয় হোক।

বেলাল চৌধুরী

একাধারে আনন্দ এবং বেদনার প্রতীক এই গোলাপের আদি নিবাস আপনি লিখেছেন ফ্রিজিয়া, মানে পশ্চিম এশিয়া। তো গোলাপ উপমহাদেশে এল কীভাবে ? এবং কবে ?

আবদুশ শাকুর

ভারতবর্ষে গোলাপ এনেছেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কবি-সম্রাট বাবর, আনিয়েছিলেন ইরাকের বসরা শহর থেকেই। সেই ঐতিহ্যটিই স্মরণ করায় আমাদের সুপরিচিত 'বসরাই' গোলাপ।

বেলাল চৌধুরী

সে তো প্রায় সাড়ে চার শো বছর আগের কথা। আজ এত কাল পরেও সর্বজনস্বীকৃত এক নম্বর এই পুষ্পরূপসী উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে তেমন ছড়াল না কেন মামা ?

আবদুশ শাকুর

প্রথম কথা, বিদেশি ফুল বলে হিন্দুস্তানে পুজোর ফুল হিসাবে জনাদৃতি কোনোকালেই পায়নি গোলাপ। দ্বিতীয় কথা, আপনা আপনি ফুটে থাকার ফুলও এ নয় অনেক তোয়াজে ফোটাতে হয় একে। তৃতীয় কথা, জনসাধারণের দৈনন্দিনের সঙ্গী হবার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এই আইভরি-টাওয়ারারের আভিজাত্য।

বেলাল চৌধুরী

কিন্তু বাংলার অভিজাত কাব্যে কিংবা সাহিত্যেও তো গোলাপ তুলনামূলকভাবে বিরলই। গোলাপ ফুলের প্রথম উল্লেখ নাকি দ্বিজ চণ্ডীদাসে ?

আবদুশ শাকুর

হাঁ। যেমন :

> 'কুন্দ করবী, আমলি সুন্দর,
> চম্পক কেতকী বেলি।
> কিবা মনোহর, তুলল গোলাপ,
> তাহে সুন্দর চামেলী।'

বেলাল চৌধুরী

কিন্তু তারপর আর তেমন উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা কোথায় ?

আবদুশ শাকুর

এমনকি কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলার ফুল'-নামক কবিতায় ফুলের নমশূদ্রদেরও উল্লেখ করেছেন, বাদ দিয়েছেন কেবল ফুলের শর্মণ্‌শিরোমণি গোলাপকে। আমার ধারণা বিদেশি ফুল বলেই। যদিও তাঁর আমলে গোলাপ ছিল পুরোপুরি স্বদেশি হয়ে যাওয়া সুন্দরতম ফুলটি।

বেলাল চৌধুরী
তারপর সবকিছুর শেষ কথা যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথেও তুলনায়?

আবদুশ শাকুর
গোলাপ কেমন যেন কোণ-ঠাসা, তাই না ? চণ্ডীদাস থেকে উদ্ধৃতিটিতেও বেচারি গোলাপ কেমন গৌণই যেন ।

বেলাল চৌধুরী
কারণটা কী মামা ?

আবদুশ শাকুর
কারণ ওই করবী-কেতকীরাই । রামসুন্দর বসাক-প্রণীত বাল্যশিক্ষার ফুলের নামগুলিই স্মরণ করুন না :

কামিনী মালতী যূথী কেতকী মল্লিকা ।
গোলাপ টগর চাঁপা জবা শেফালিকা ॥
গন্ধরাজ সূর্যমুখী কুন্দ কৃষ্ণচূড়া ।
বকুল পলাশ পদ্ম কদম্ব ধূতুরা ॥

অর্থাৎ এইসব করবী, পারুল, চামেলী, বেলী, শেফালী, শালুক, কেতকী, নয়নমণি, দোপাটি, গাঁদা, পদ্ম, অপরাজিতা, দোলনচাঁপা, ভুঁইচাঁপা, অতসী, নয়নতারা, অর্জুন, অশোক, সন্ধ্যামালতী, নাগকেশর, সপ্তপর্ণী, মহুয়া, মেহদী, হেনা, ঝুমকোলতা, রজনীগন্ধা, শিরিষ, কাঞ্চন, শিমুল, সোঁদাল, পিয়াল, বাঁশফুল, কাশফুল, ভাঁটফুল এমনকি জংলী ফুল ল্যানটানা, কচুরিপানাও বাংলার মাটি আর বাংলার জলে কেমন দলে দলে পালাক্রমে ফুটতে থাকে সারাটা বৎসর । ভেবে দেখুন একবার ।

বেলাল চৌধুরী
হাঁ, বাংলার কবিশ্রেষ্ঠও তো ঠাঁই না-পেয়ে বলে ওঠেন :

সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে /
তোদের মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ, /
নেই একটি বিরল ক্ষণ /

আবদুশ শাকুর
তবেই বলুন সাধারণ শিল্পী-সাহিত্যিকের সুযোগ কই এদের থেকে চোখ ফিরিয়ে ওই বিদেশি ফুলটিকে দেখার, খোঁজখবর নেবার । যাদের ফুলের ভাঁড়ে মা ভবানী তারাই ভজুক গোলাপরানীকে মাথায় তুলে নাচুক । ভাবটা এই আর কি । তবে শান্তিনিকেতনের

উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ নানান দেশ থেকে গোলাপ এনে যে-গোলাপবাগানটি রচনা করেছিলেন তার কথাও এখানে উল্লেখ না-করলে কবিকুলের শ্রেষ্ঠতম পুষ্পপ্রেমীর ওপর অ্যাসপার্শানের অভিযোগ উঠবে।

বেলাল চৌধুরী

উল্লেখযোগ্য তো আরো অনেক কিছুই আছে রবীন্দ্রনাথের গোলাপপ্রীতির। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে মৃণালিনী দেবীর কিচেনগার্ডেনে তিনি নিজের হাতে গোলাপগাছ লাগিয়েছিলেন।

আবদুশ শাকুর

তাঁর সাধারণ গোলাপমনস্কতার উদাহরণও অনেকই আছে। এক মিনিট। 'মানসী'র সূচনা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারই মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই। হারিয়ে গেল সেই ছবি।'

বেলাল চৌধুরী

গোলাপফুলের ব্যবসার কথাও নাকি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ?

আবদুশ শাকুর

হাঁ, তবে প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের জন্য। ভালো কথা মনে করিয়েছেন মামা। আমি যখন পরোক্ষে এবং অলক্ষে গোলাপব্যবসায়ী হয়ে গিয়েছিলাম, তখন প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভলিউম 'চিঠিপত্র অষ্টম খুলি। লোভে পড়ে গোপনে গোলাপ বিক্রি করে বাগানটাকে শ্মশান করে দিচ্ছিল। আমার নির্ভেজাল গোলাপপ্রেমে বেচাকেনার ব্যাপারটা একটা ভেজাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বেলাল চৌধুরী

সেই ভেজালে আমিও একবার জড়িয়ে পড়েছিলাম একটু, অবশ্য পরোক্ষে ভারতীয় দূতাবাস বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কয়েক হাজার টাকার তরতাজা গোলাপ কিনেছিল পাশের বাড়ির, মানে, আপনার বাগান থেকে।

আবদুশ শাকুর

আপনার অফিস তো কিনেছিল আমার থেকে, মালির থেকে নয়। সেটা আমার একটা সুখস্মৃতি হয়ে আছে অদ্যাবধি উপলক্ষ উপযোগী সকলের মনের মতো গোলাপ দিতে পেরেছিলাম বলে।

বেলাল চৌধুরী

আপনার ব্যবসার খেয়াল না-থাকলে বেচাকেনাটা শুরু হয়েছিল কী ভাবে ?

আবদুশ শাকুর

বিশেষত প্রেমের প্রভাবে। যুবক-যুবতীর অতি প্রিয় একটা তৎপরতা ছিল গোলাপবাগানে বেড়ানো, গুল্মসংলগ্ন গোলাপের নেমপ্লেটগুলো পড়া, নির্বাচিত গোলাপটি বাগানে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে অথবা কেটে নিয়ে পরস্পরকে উপহার দেওয়া এবং প্রিয়জনদের জন্যেও পছন্দের কিছু গোলাপ কিনে নিয়ে যাওয়া, ফ্রেশ ফ্রম দ্য গার্ডেন। দৃশ্যটি আমারও ভারি প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বেলাল চৌধুরী

আমার তো শুনেও প্রিয় বোধ হচ্ছে ব্যাপারটি। গার্ডেন-ফ্রেশ কী কী গোলাপ তারা বেশি নির্বাচন করত ?

আবদুশ শাকুর

সে এক মজার ব্যাপার। আশির দশকের প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রিয়তম গোলাপ ছিল 'ডাবল ডিলাইট' একটি বিক্রি হত এক শ টাকা (যেখানে সাধারণ একটা গোলাপের দাম ছিল : হাইব্রিড-টি দশ টাকা আর ফ্লোরিবান্ডা পাঁচ টাকা)। এটা তারা পরস্পরকেই দিত। এ ছাড়া পুরুষ নারীকে দিত 'কুইন এলিজাবেথ' 'মাই লেডি', 'লেডি-এক্স' ইত্যাদি। নারী পুরুষকে দিত 'কিং অফ হার্টস', 'মিস্টার লিংকন', 'সুপারস্টার, প্রভৃতি। কেউ বাগদত্তাকে দিত অবগুণ্ঠিতা সুন্দরী 'প্রিন্সেস' বিশ টাকা দিয়ে কিনে। তিনি আবার তাঁর দয়িতকে দিতেন একই দামের সুঠাম বিশাল 'চ্যাম্পিয়ন'। সব চেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, চপল চঞ্চল তরুণ-তরুণীর দল কেবল নামের মোহে এমন সব গোলাপ নির্বাচন করত যেসব গোলাপ রেটিঙে কেউকেটা তো নয়ই মেধা-তালিকাতেও বটমবাসী। যেমন 'ললিতা', 'প্রিয়তমা', 'অভিসারিকা', 'লাভার্স' মিটিং', 'কিস্ অফ ফায়ার', 'কেয়ারলেস লাভ', 'অনুরাগ', 'অপ্সরা', এমনি আরো কিছু। সে যাক। এক মিনিট। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিপত্রের ভলিউমটি নিয়ে গোলাপব্যবসার রাবীন্দ্রিক প্রস্তাবগুলো পড়ে শোনাচ্ছি :

'এ বৎসর কালিগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি কেবল আখের কল পূর্ব্ববৎ চলচে। তুমি যদি আখের কলে টাকা ফেলতে চাও আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু আখের কল সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তার কারণ আছে তোমাকে আমাদের কোন বিপদের মধ্যে জড়াতে ইচ্ছা করে না। কুষ্টিয়ায় আর একটা কাজ হতে পারে নদীর ধারে খানিকটা জমি নিয়ে গোলাপের ক্ষেত করে কলকাতা market-এ ফুল supply করা। তাতে হাজার দুয়েক টাকা মূলধন লাগবার কথা নগেন্দ্র সেই কাজে প্রবৃত্ত হবার সঙ্কল্প করচে তুমি যদি ইচ্ছা কর তার সঙ্গে যোগ দিতে পার কাজটা লাভজনক বলে অনেকে ভরসা দেয়। তুমি ফুলের market-এ খবর নিলেই জানতে পারবে গোলাপ তারা কি মূল্যে খরিদ ও বিক্রি করে। এ অঞ্চলের নদীতীরের বেলে জমি গোলাপের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ংড়রষ। টাকাটা ফেলে এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু অল্প টাকা এক বৎসর পড়ে থাকলে বোধ হয় বেশি কষ্টকর না হতে পারে। তুমি যদি একবার এদিকে এসে পড়তে পার তাহলে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করা যেতে পারে। গোলাপের ব্যবসায় তোমার মত সৌন্দর্য্যপিপাসুর উপযুক্ত হতে পারে এতে তোমার কোন এক ছেলে লেগে থাকতে পারে। ভেবে দেখো। (পাবনা ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)।

বেলাল চৌধুরী
তার পর ?

আবদুশ শাকুর
সম্ভবত পরদিনই আবার :
'তোমাকে গোলাপের ব্যবসার যে প্রস্তাব করেছিলুম তাতে তোমার সম্মতি আছে কি ? ৫০০ টাকার বেশি দিতে হবে না। কিন্তু টাকাটা বছরখানেক শূন্য পড়ে থাক্‌বে। নগেন্দ্রকে তোমার কথা বলেছি তাতে তার যথেষ্ট উৎসাহ হয়েছে। যদি তুমি ফুলের দাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বাজারে একবার সন্ধান করে দেখ ত ভাল হয়। Amateur Rose Gardener বলে একটা বই আছে তোমার অবকাশমত Newman-দের সেটা আমার শিলাইদহ ঠিকানায় পাঠাতে বলে দেবে ?' (ফেব্রুয়ারি ?, ১৯০১)।

বেলাল চৌধুরী
তার পর ?

আবদুশ শাকুর
পরের মাসের পত্রের সুর মিশ্রগ্রামে বাঁধা :

'তোমার মাছের ব্যবসায়ের প্রস্তাবটা আমার কাছে মন্দ লাগ্‌চে না শ্যালার কাছে লিখে এর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ফুলের ব্যবসায়ের যতটা খবর নিতে পেরেছি তাতে ওটাকে নেহাৎ আকাশকুসুমের ব্যবসা বলে বোধ হচ্চে মাণিকতলার মালী-সম্প্রদায় বল্‌চে আমাদের পুঁজি অল্প, নইলে আমরা এরকম সুযোগ পেলে বেঁচে যেতুম। যাই হোক্‌ এখনো হাতে সময় আছে। বৈশাখ মাস থেকে কাজ সুরু করতে হবে, তার পূর্ব্বে জমি খালি পাওয়াই যাবে না। কুষ্টিয়ায় বিঘা পাঁচ ছয় জমি আমাদের হাতে আছে।'

বেলাল চৌধুরী
তার পর ?

আবদুশ শাকুর
তারপর ফুলের ব্যবসা মৃত্তিকার বুক থেকে উঠে এল উপন্যাসের পাতায়।'মালঞ্চ'র নায়ক আদিত্য ফুলব্যবসায়ী এবং সফলও। ফুলচাষি নায়ক আর কাউকে মনে পড়ে বাংলা সাহিত্যে?

বেলাল চৌধুরী
আমার তো আর কেবল 'গোলাপ সুন্দরী'-র নায়ক বিলাসকেই মনে পড়ে হাসপাতাল-পরবর্তী জীবনে যার একমাত্র স্বপ্ন গোলাপ বাগান।

আবদুশ শাকুর
আমারও কেবল সে-নায়কটার স্রষ্টা কমলকুমার মজুমদারকেই মনে পড়ে যিনি রহস্যময় গোলাপকে তার অপার রহস্যসহ ভাষান্তরিত করতে পেরেছেন।

বেলাল চৌধুরী
গোলাপোদ্যানপালক আর কাউকে চেনেন বাংলা সাহিত্যে ?

আবদুশ শাকুর
অন্তত দুজনকে তো চিনি। কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ীর ডায়েরি সাক্ষ্য দেয় পুষ্পোদ্যানপালন তাঁর রোজকার অপরিহার্য অনুষঙ্গ ছিল এবং সে সুবাদে গোলাপও ছিল তাঁর দৈনন্দিনের সঙ্গী।

বেলাল চৌধুরী
আরেক জন ?

আবদুশ শাকুর
কবি জীবনানন্দ দাশ।

বেলাল চৌধুরী
তিনিও কি হাতেকলমে বাগান করতেন ?

আবদুশ শাকুর
স্মৃতিচারণকালে তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ বলেন তাঁদের গৃহসংলগ্ন ছোট্ট বাগানটিতে কবি Paul Neyron ('পল নেরঁ')-নামক যে-বিশাল Old Garden Rose (পুরাতন বাগান গোলাপ)-টি ফোটাতেন, তত বড় গোলাপ তখনকার বরিশাল শহরে দ্বিতীয়টি দেখা যেত না।

বেলাল চৌধুরী
বাংলার মুখের বিমুগ্ধ দর্শকের আপন হাতে ফোটানো গোলাপকে বিদেশি ফুল বলে পর জ্ঞান করাকে কীভাবে মানা যাবে বিশেষত সব কিছুতে আমাদের বিদেশি ভজনার প্রেক্ষাপটে ?

আবদুশ শাকুর
বিদেশি-কথাটির ওপরই আমার একটা পাদটীকা আছে মামা। জ্ঞাত ইতিহাসে প্রথম ফ্রিজিয়ায় দৃষ্ট হলেও, স্পিশিস গোলাপ তো হিমালয়ের দশ বারো হাজার ফুট উচ্চতায় পার্বত্য বনানীর শোভা বর্ধন করে আসছে আবহমান কাল ধরেই যেমন রোজা মস্‌কাটা, ব্রুনোনি, ইগল্যান্টেরিয়া, ম্যাক্রোফিলা ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উদ্ভিদবিদ কিংডন ওয়ার্ড বর্ণিত, অভিজাতশ্রেষ্ঠ রোজা জিগ্যান্টেয়া। কিন্তু ওই সব পর্বতকন্দর সাধুসন্ন্যাসীরই নিবাস, যাঁরা ফুলকে প্রকৃতির কোলে দেখতেই ভালোবাসতেন। বনের ফুলটিকে বাগানের ফুল বানিয়ে নেন তো গৃহী তার স্বভাববশতই। বাগানের ফুলটিকে পুষ্পরানীর উপাধি দেন কবি, তবে বৈভব দান করেন নৃপতি। সেই নৃপতি যখন বিশেষভাবে গোলাপপ্রেমী হন, তখন তিনি যেখানেই যান গোলাপকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেটাই করেছেন শিল্পী নৃপতি বাবর। তিনিই প্রথম উদ্যানবিদ্যা শেখান ভারতবর্ষীয়দের। শুধুমাত্র গোলাপের জন্য স্বতন্ত্র বাগান রচনা করার ধারণাটাও তাঁরই দান। এবং বাগানকে নিসর্গচিত্রে আধারিতও করেন তিনি।

মোটকথা, প্রথম মোগলসম্রাটের হাতেই সৃষ্ট হয়ে যায় আজকের বিশ্বখ্যাত মোগল গার্ডেন এবং উপমহাদেশের প্রথম রোজ গার্ডেন।

বেলাল চৌধুরী
কিন্তু কেবল একটা ফুলের জন্য একটা বাগান কি যুক্তিসংগত মামা?

আবদুশ শাকুর
একটা ফুলের জন্য নয়, গোলাপ ফুলের জন্য সংগত। আধুনিক গোলাপের জন্য তো অপরিহার্য।

বেলাল চৌধুরী
প্রাকৃতিক গোলাপ আর আধুনিক গোলাপে কি এতই তফাৎ ?

আবদুশ শাকুর
দুটি ফুল প্রায় আলাদা। মডার্ন রোজ এমনি বিশিষ্ট একটি একক ফুল যে মিশ্রবাগানে একে নিখুঁতভাবে সাজানোই যায় না। আবার স্বতন্ত্র উদ্যানেও এর হাজার হাজার ভ্যারাইটির প্রতিটি প্রকারের আকর্ষণে এত স্বাতন্ত্র্য যে গোলাপপ্রেমীর অবস্থা

বেলাল চৌধুরী
শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী, কারে রেখে কারে বলি।

আবদুশ শাকুর
এগ্‌জ্যাক্টলি। অ্যারিয়ানা প্যাসক্যালি, কাকে ফেলে কাকে দেখি। এই ফ্যাসাদে পড়েই এক গোলাপপ্রেমী ইংরেজ মডার্নরোজকে গুডবাই বলে ওয়াইল্ডরোজের বাগান করে কোটিপতি বনে গিয়েছে।

বেলাল চৌধুরী
সাধেই কি এদের আমরা বেনিয়া বলি !

আবদুশ শাকুর
একটা ভিনদেশি ফুল একজন অসাধারণ লেখক-শাসক না-হয় তাঁর নতুন বাসভূমে আনলেন। কিন্তু ফুলটিকে তাঁর যোগ্য বংশধরগণ ভিন পরিবেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেটাও তো লক্ষণীয়।

বেলাল চৌধুরী
তা তো বটেই। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁরা সপরিবারেই শিল্পী ছিলেন এবং বংশপরম্পরায়। গোলাপচর্চার সবচেয়ে বিস্তৃতি ঘটেছে চিত্রশিল্পী সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তাঁর কবিপত্নী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সময়ে।

আবদুশ শাকুর
আচ্ছা মামা, নূরজাহানই গোলাপি আতরের জনয়িত্রী কথাটি কি ঠিক ?

বেলাল চৌধুরী
কথাটা আছে কেবল শ্রুতিতে। রেকর্ডে আছে ভিন্ন কথা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্মৃতিগ্রন্থ 'তুজুকে জাহাঙ্গীরী'তে লেখা আছে কৃতিত্বটি তাঁর শাশুড়ি সালিমা সুলতান বেগমের। এ কি দাম্পত্যকলহের জের, না কি তথ্যটি সত্যই ? দাপুটে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তো প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রেরও মহারানী ছিলেন।

আবদুশ শাকুর
তথ্যটি সত্যই। তবে তার একটা ফুটনোট আছে। জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৭) আমলে আবিষ্কৃত হয় গোলাপি আতর তৈরির একটি পদ্ধতি। প্রথম গোলাপি আতর তৈরি তার অনেক আগের ব্যাপার। সে যাক। শ্রুতির অতিরেকটুকুর উৎস অবশ্যই কবি নূরজাহানের ঐকান্তিক গোলাপমনস্কতা। গোলাপপূজারিণী এই রানী লেকের পানি গোলাপপাপড়ির আস্তরণে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে তার ওপর নৌবিহার করতেন স্বামীকে নিয়ে। সূর্যের তাপে পাপড়ি থেকে তেল বেরিয়ে জলের ওপর ভাসত, যেহেতু তেলে আর জলে মেলে না। সেটা বিদুষী সম্রাজ্ঞীর নজর এড়ায়নি। এভাবে তৈরি গোলাপি আতর অথবা 'আত্‌র-এ-জাহাঙ্গীরী' থেকেও শ্রুতিটির সৃষ্টি হতে পারে। যা হোক, গোলাপপ্রেমী এই সম্রাজ্ঞীর উদ্যোগেই শালিমার, নিশাতবাগ প্রভৃতি বিশিষ্ট উদ্যান স্থাপনা এবং লাহোর-কাশ্মীর-আগ্রাসহ বিভিন্ন জায়গায় মোগলশৈলী অনুযায়ী বাগানের প্রতিষ্ঠা ঘটে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে আনা গোলাপ দিল্লি, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় সহজেই বেশ ভালো জন্মাতে থাকে।

বেলাল চৌধুরী
তবে তো মামা এই মোগল গোলাপসম্রাজ্ঞীকে ফরাসি গোলাপসম্রাজ্ঞীর পূর্বসূরি বলতে হয় যাঁর কথা আপনি সবিস্তারে লিখেছেন আপনার 'গোলাপ বিসংবাদ' রচনায়।

আবদুশ শাকুর

হ্যাঁ মামা, গোলাপবিশ্বে মাদাম নাপোলেওঁ জোসেফিনকে (১৭৬৩-১৮১৪) এক অর্থে তাঁর দুইশত বৎসর পূর্বের নূরজাহানের উত্তরসূরি বলা যায় বইকি। নূরজাহানেরই অনুপ্রেরণায় গোলাপচর্চা ভারতবর্ষের আমীর ওমরাহ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তা রাজরাজড়ার নিচে নামেনি। বৃটিশ যুগে চর্চাটা রাজা থেকে জমিদার ও অভিজাত মহল পর্যন্ত নেমে এসেছিল। দীর্ঘ বিদেশি শাসনের শেষ পর্যায়ে সাধারণ বিত্তবান পর্যন্ত পৌঁছেছিল গোলাপচর্চা। পাকিস্তানি শাসনের শেষে এদেশে গোলাপচর্চা কিন্তু একেবারে জনসাধারণের স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে কেবল শহরে নগরে।

বেলাল চৌধুরী

আচ্ছা মামা, গোলাপ বঙ্গে এল কবে ? কী ভাবে ?

আবদুশ শাকুর

ব্রিটিশ যুগে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে।

বেলাল চৌধুরী

সে কি ! গোলাপের আগমনে দুর্ভাগ্যের কী থাকতে পারে ?

আবদুশ শাকুর

আগমনে নয়, দুর্ভাগ্যটা ছিল অনুষঙ্গে। বলতে চাচ্ছি বাঙালি গোলাপভাগ্যটুকু লাভ করেছে বৃহত্তর দুর্ভাগ্যটির মাধ্যমে। ভারতবর্ষে উপনিবেশন-নামক বৃটিশ দুষ্কর্মটি শুরু হয় বঙ্গে, উপনিবেশটির রাজধানীও স্থাপিত হয় বঙ্গে। সে কারণে ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশের তুলনায় শোষণও বেশি হয় বঙ্গে। সেটিকেই দুর্ভাগ্য বলছিলাম। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সৌভাগ্যটুকু ছিল বিরাট। উপনিবেশক জাতিটি ছিল গোলাপ-প্রেমিকেরও বেশি, বলা যায় গোলাপ-পাগল

বেলাল চৌধুরী

একেবারে পাগলই ?

আবদুশ শাকুর

পাগল না-হলে কি কেউ কোটের ল্যাপেলের ভেতরে জলের বোতল পরে ?

বেলাল চৌধুরী
সেটা আবার কী কথা ?

আবদুশ শাকুর
কোটের বোতামঘরে বাটনহোলস্বরূপ গোলাপ পরতেন পণ্ডিত নেহরুও সর্বদাই। কিন্তু ব্রিটিশ ড্যাণ্ডিরা পিন মেরে ন্যাপেলের ভেতরে লুকিয়ে 'বাটনহোল রেজার্ভোয়ার' বা বাটনহোল-জলাধারও পরিধান করতেন। জলভরা নলটি গোলাপের বৃন্তটিকে ডুবিয়ে রেখে ফুলটির সজীবতার আয়ু বাড়াত।

বেলাল চৌধুরী
তবে তো উন্মাদপ্রায় বলাই যায়।

আবদুশ শাকুর
না, গোলাপোন্মাদ না বলে ওদের গোলাপপ্রেমী বলাই ভালো। বরং পুষ্পপ্রেমীও বলতে পারেন। কারণ গার্ডেনিং বিষয়ে বিশ্বের বেস্টসেলিং লেখক ডক্টর ডেভ্ হেসায়ন তাঁর ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য আর্মচেয়ার বুক অফ দ্য গার্ডেন'-নামক বহুলপঠিত পুস্ত কটিতে জানাচ্ছেন যে যুক্তরাজ্যের বিশ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে সতেরো মিলিয়ন পরিবারেরই একটি বাগান আছে। তার মধ্যে শতকরা পঁচাশি ভাগ বাগানেই গড়ে এগারোটি করে গোলাপগুল্ম আছে। সেদেশে প্রতিবছর পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন নতুন গোলাপ ক্রয় করা হয়। প্রতি দশটির মধ্যে নয়টি গোলাপই হয়তো হাইব্রিড-টি নয়তো ফ্লোরিবান্ডা, মানে অপ্রধান গোলাপ নয়। শতকরা ষাট জন ব্রিটিশ নারীপুরুষই স্বহস্তে উদ্যানচর্যা করেন। শুনেছি তাদের শহরগুলোতে নাগরিকদের জন্য বরাদ্দকৃত সবজিচাষের প্লটের কিনারেও এক মিটার চওড়া কেয়ারিতে গোলাপ ফোটানো বাধ্যতামূলক।

বেলাল চৌধুরী
তবে তো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ব্রিটিশদের সফরসঙ্গী হয়ে গোলাপেরও এদেশে আসারই কথা।

আবদুশ শাকুর
হাঁ, তাদের চর্চার সূত্রেই আসে। বরং ভারতবর্ষের শৈলশহরগুলোর সামার-রিজর্টে হোমলি ফিল করার কারণে এদেশের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রকৃতির বুকে ইংরেজদের গোলাপচর্চার আগ্রহ আরও বেড়েই যায়। সেই সুবাদে রাজধানী কোলকাতা হয়ে যায় পুষ্পচর্চার পেশাগত কেন্দ্র। সেখানে গড়ে ওঠে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ

ইন্ডিয়া। পার্শ্ববর্তী হাওড়াতে বটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয় ১৮২০ সালে। শিবপুরের ওই বাগানটি অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শুরু হয়েছিল অন্য নামে। এইসব তৎপরতার ফলে বাংলা-বিহারের সীমান্ত এলাকা জুড়ে ব্যাপকভাবেই গোলাপের চাষ হতে থাকে। বিদেশিদের মধ্যে কাটা-ফুলের ব্যাপক চাহিদার কারণে আধুনিক গোলাপের নতুন উদ্ভাবিত ভ্যারাইটিগুলোও নার্সারিগুলোতে পৌঁছামাত্রই ইউরোপ থেকে বঙ্গদেশে চলে আসতে থাকে।

বেলাল চৌধুরী
তবে তো আধুনিক গোলাপ আমরা ইংরেজের গোলাম হবার সূত্রে প্রথম পেয়েছি কেবল নয়, অনবরত পেয়েই এসেছি।

আবদুশ শাকুর
সবই পেয়েছি নয়, কিছু দিয়েছিও। তবে সেও একই সূত্র ধরেই।

বেলাল চৌধুরী
গোলাপে আমরা দিয়েছি? সেটা কী হিসাবে বলছেন?

আবদুশ শাকুর
বাণিজ্যতন্ত্রী জাতিটির বাণিজ্যজাহাজের নাবিকেরা চীনের বন্দরনগরী সাংহাই-ক্যান্টনের বাগানগুলোতে নতুন গোলাপ দেখামাত্র দেশে পাঠানোর জন্য চারা সংগ্রহ করত। একটানা দীর্ঘ সমুদ্রসফরে মরে যাবে বলে যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে সেগুলোকে শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে কিছুকাল লালনপালন করা হত। সেই সুবাদেই কিছু কিছু গোলাপের চারা-বীজ এখানে থেকে যেত এবং আশেপাশে ছড়িয়েও পড়ত। কারণ কোলকাতা ও তার আশেপাশে তখন গিজগিজ করত ইউরোপীয় পুষ্পপ্রেমী সম্প্রদায়। বাগানে কাজ করত দেশি মালি। তাদের মাধ্যমে বাঙালি অভিজাত মহলে তথা সমতল বাংলায় গোলাপ শুধু প্রচলিতই হল না, বৈচিত্র্যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধতরও হল। ফলে বাংলাতেই লেখা হল গোলাপচর্চার প্রথম ভারতীয় বই। প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 'গোলাপ বাড়ী' প্রকাশিত হল ১৯০৮ সালে। প্রথম তিনজন ভারতীয় গোলাপ-সংকরকও ছিলেন বাঙালি বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য, বিজয় রায়চৌধুরী, শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই চাইনিজ স্পিশিসগুলো ইউরোপে পৌঁছে সেখানকার স্পিশিসগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়েই জন্ম দেয় আধুনিক গোলাপের। সেদিক থেকে বলতে গেলে আজকের চোখধাঁধানো বিশ্ববিজয়ী আধুনিক গোলাপের সৃষ্টিকর্মে বঙ্গদেশও একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

বেলাল চৌধুরী
ইংরেজরা তো একালের ভদ্রলোক। সেকালের সভ্যলোক কেমন কদর করত গোলাপের, সেটা একটু সবিস্তারে বলবেন মামা ?

আবদুশ শাকুর
সেসব কেচ্ছা-কাহিনী বিভিন্ন লেখাতেই বয়ান করেছি মামা।

বেলাল চৌধুরী
আপনার 'গোলাপ বিসংবাদ' রচনাটি তো রানিং কমেন্টারি নয়, একেবারে ফ্লাইং কমেন্টারি। তাছাড়া সব লেখা তো একজন পাঠক পায় না। পেলেও পড়া হয়ে ওঠে না।

আবদুশ শাকুর
গোলাপ স্থান পেয়েছিল গ্রিকদের হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কবি সাফোর কবিতায় প্রথম পুষ্পরানীর উপাধি পায় গোলাপ। নিসর্গবিদ্ থিওফ্রেস্টাস প্রথম লিপিবদ্ধ করেন গোলাপের বিজ্ঞানিক বিবরণ। এমনকি বীজের চেয়ে কাটিঙের পদ্ধতি গোলাপের বংশবৃদ্ধির জন্য শ্রেয় এই আধুনিক তত্ত্বটিও পাওয়া যায় সেই আদি বিবরণটিতে। রোমে গিয়ে গোলাপ স্থান পায় রোমানদের বাগানে, তাদের দৈনন্দিনের জীবনে। কোনো কিছুকেই মনেপ্রাণে ভালোবাসতে রোমকগণ অভ্যস্ত নন। তাঁরা ভালোবাসেন দেহেমনে। গোলাপের প্রতি তাঁদের আসক্তির শারীরিক দিকটি ছিল নজিরবিহীন যেজন্যে ওটিকে বলা হয় রোমের রোজম্যানিয়া। বিত্তবান নাগরিকগণ গোলাপের ওপর হাঁটতেন, ঘুমাতেন, সঙ্গম করতেন। এমনকি গোলাপ তাঁরা খেতেনও গোলাপের মধু, গোলাপের পুডিং। পান করতেন গোলাপের সুরা, স্নান করতেন গোলাপের জলে। গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তাঁদের বালিশের খোল পর্যন্ত পূর্ণ হত।

বেলাল চৌধুরী
সে কি কথা ! যে-পাপড়িকে মানায় যুবতীকুলের ব্লাউজের খোলে, সে-পাপড়ি কী করে ঢোকে অকাব্যিক বালিশের খোলে ?

আবদুশ শাকুর
আরো শুনুন না। ভোজোৎসবের হলঘরে মেজেতে থাকত গোলাপপাপড়ির মিনিমাম এক ইঞ্চি পুরু স্তর। এই ফুলেল মেজের পরতের পুরুত্ব পদমর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই সবার ওপর টেক্কা দিয়েছিলেন সম্রাট নিরো, মতান্তরে, হেলিওগাবালুস্। এক রাজকীয় ভোজোৎসবে অতিথিশালার চাল থেকে নেমে-আসা

গোলাপের ‘পাপড়িপ্রপাতে’ অনেক অতিথির ‘গোলাপসমাধি’ রচিত হয়েছিল। সম্ভবত করুণ দৃশ্যটি রচনায় সহযোগিতা করেছিল তাঁদের বেসামাল মাত্রার গোলাপাসব পান। আপনি মামা ওই গোলাপসমাধিটির ওপর একটা এপিটাফ রচনা করতে পারেন। কিংবা গোলাপশহীদদের ওপর একটি এলিজিও লিখতে পারেন। কারণ বিষয়টি নিয়ে কোনো কবিকর্ম সম্ভবত হয়নি।

বেলাল চৌধুরী

হলেও কর্মটি বার বার করা চলে। তার আগে গোলাপখোরদের কীর্তিকলাপ আরো শোনা দরকার।

আবদুশ শাকুর

গোলাপপাপড়ি সুযোগ্য রোমকদের গলার হার হত, তাঁদের সুরাপাত্রে ভাসত, রোগে ওষুধের কাজ করত। গোলাপভস্ম ব্যবহৃত হত ম্যাস্‌কারা হিসাবে। তাজা গোলাপের ব্যবহার ছিল কামোদ্দীপকরূপে। রোমক ভদ্রলোক গোলাপজলে স্নান করে গোলাপফুলের পিঠেপুলি-হালুয়ারুটি খেয়ে গোলাপাসব পান করে গোলাপসজ্জায় সহবাস করতে ভালোবাসতেন। একটি রোমান রন্ধনব্যবস্থাপত্র ছিল : এক পাউন্ড গোলাপপাপড়ি হামানদিস্তার হামানে নিয়ে চালনি দিয়ে চেলে নিন, তার সঙ্গে চার কাপ মগজ, আটটি ডিম, দেড় গ্লাস উত্তম দ্রাক্ষারস যোগ করুন। তার পরে নিয়ম মতো তেল-নুন-মরিচ মিশিয়ে আভেনে সাঁকুন আর তারিয়ে মজা চাখুন।

বেলাল চৌধুরী

আমি কি গল্পকারের গালগল্প শুনছি ?

আবদুশ শাকুর

না মামা, আমি সত্যের খাতিরেই বলছি যে এই গোলাপভজনায় বীরপুংগব রোমানদের কোনো মেয়েলিপনা কিন্তু ছিল না। গোলাপমালা গলায় পরে সৈন্যগণ যুদ্ধে যেতেন, রোমে ফেরার সময় যুদ্ধবিজয়ী রথ থাকত গোলাপসজ্জিত। স্পষ্টতই, এত সব বিপরীতধর্মী চাহিদা মেটাতে রোমের গোলাপবাগানগুলো কুলিয়ে উঠত না। ফলে চাষিসাধারণ অধিকতর লাভজনক গোলাপচাষে এত বেশি ঝুঁকে পড়লেন যে, উপেক্ষিত হল কুঞ্জবন আর ফলবাগান। সঙ্কুচিত হল শস্যভূমি। মহান হরেসও নাকি আক্ষেপ করে বলেছেন : সব শস্যভূমিই পুষ্পভূমি হয়ে গেল ! শীতে গোলাপগুলো ন্যাড়া হয়ে গেলে সকলেরই গোলাপপ্রীতি থিতিয়ে আসত। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু রোমকগণ। তাঁরা বাষ্পীয় তাপের প্রিমিটিভ ‘গ্রিনহাউসে’ গোলাপচাষ অব্যাহত রাখতেন। এই অভিনব ধারণা একেবারে অধুনা ছাড়া ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তবুও গোলাপবিলাসী

রোমানদের চাহিদামতো পাপড়ি জোগান দিতে পারতেন না স্থানীয় গোলাপচাষিগণ। তাই ঈজিপ্ট থেকে নৌকায় আমদানি করা হত গোলাপপাপড়ি। স্বভাবতই আমদানিটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কথিত আছে যে বিলাসপণ্যটির একটি চালানের জন্যে সম্রাট নিরো মূল্য বাবত ব্যয় করেছিলেন এক টন স্বর্ণ যার বর্তমান দাম হবে প্রায় দেড় লক্ষ মার্কিন ডলার।

বেলাল চৌধুরী

এহেন গোলাপপ্রীতির শেষ আছে কী ?

আবদুশ শাকুর

আছে। রোমের পতনের সঙ্গেই খতম হয়ে যায় এই গোলাপোন্মাদনা। আয়েশি ধনিকশ্রেণীর বিলুপ্তির সঙ্গে ধনীর দুলালী গোলাপের বাগানেও নামে সুপ্তি। ফের বন্যই হয়ে যায় বনের গোলাপ। খ্রিস্টসভ্যতার ওই অরুণ প্রভাতে পুষ্পরানীর শুধু লালয়িতার আকালই নয়, গ্রহীতার সঙ্কটও দেখা দিয়েছিল। কারণ, প্রতিষ্ঠার সেই নাজুক পর্বে খ্রিস্টান গির্জা অখ্রিস্টান রোমানদের যাবতীয় পাপের একক প্রতীক জ্ঞান করে সুন্দরের দ্যোতক গোলাপকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ঘৃণাভরে। কিন্তু অমনটা করা-যে মানবের রূপপিয়াসী স্বভাবটাকেই বর্জন করা সেটা প্রমাণিত হতেও খুব বেশি দেরি লাগেনি। চার শত খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই দেখা যায় যে লালগোলাপ বরিত হচ্ছে যিশুর শোণিতের প্রতীকরূপে, আর সাদাগোলাপ মেরির কুমারীত্বের।

বেলাল চৌধুরী

গির্জাকে বেশি দোষ দেওয়া যায় না। আপনার বর্ণনামতে বলতে হয় যে রোমানদের গোলাপপ্রীতি, থুড়ি গোলাপকাম, পাপের পর্যায়েই পড়ে।

আবদুশ শাকুর

পড়েই তো। অধঃপতনের যুগে রোমীয় জীবনে গোলাপ লাম্পট্যের প্রতীকও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক অপকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় গোপন বিনিময় সম্পন্ন হতো 'সাব্ রোজা', মানে গোলাপতলে অর্থাৎ গৃহের একান্তে, যেখানে শিরোপরে ঝাড়লণ্ঠনের মতো ঝোলানো থাকত এক গুচ্ছ গোলাপ। গোলাপতলায় সম্পাদিত ভাবের কিংবা কথার আদানপ্রদান 'প্রিভিলেজ্ড কমিউনিকেশন' বলে বিবেচিত হত। অর্থাৎ তা তৃতীয়পক্ষের কাছে ফাঁস করা নিষিদ্ধ বলে গণ্য ছিল। বিশেষ গোপনীয়তার সেই রোমীয় অভিব্যক্তি 'সাব-রোজা' সবিশেষ গোপনীয়তার অর্থে আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে।

বেলাল চৌধুরী
আশির দশকে ঢাকাবাসীর গোলাপ নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখে আপনিও বোধ হয় ক্ষেপে গিয়েছিলেন। সাহিত্যপত্রিকা 'শৈলী'তে আপনার পুষ্পসঙ্কেত-নামে একটি লেখাতে অনেক ফুলের অনেক খবরই পেলাম। কিন্তু সেখানে আপনি গোলাপের উল্লেখটুকুও করেননি।

আবদুশ শাকুর
করিনি, কারণ গোলাপের সঙ্কেত-যে ভালোবাসার সে তো সকলেরই জানা। তাছাড়া গোলাপের বাণীর মতো দ্ব্যর্থহীন তো নয় ওইসব ফুলের সঙ্কেত।

বেলাল চৌধুরী
পুষ্পসঙ্কেতের বিষয়টাই এখনো গোলমেলে আমার কাছে। ফুল যেমন আগেও ছিল তেমনি এখনও আছে। মাঝখানে ফুলের সঙ্কেতটি কখন এল আর কখন গেল কেনই-বা এল আর কেনই-বা গেল কিছুই বোঝা গেল না।

আবদুশ শাকুর
শত শত বৎসর পূর্বে, সম্ভবত অটোম্যান সাম্রাজ্যে, প্রবর্তিত হয় পুষ্পসঙ্কেত পদ্ধতিটি। এর চর্চা হয় হারেমেই, যেখানে প্রেমের চর্চাই ছিল প্রধান। একজন তরুণ পাণিপ্রার্থী জানত যে 'আইরিস্'-পুষ্পটি পাঠায় 'না'-সঙ্কেত এবং প্রেমাস্পদার অঙ্গে পরিহিত কিংবা হস্তে ধৃত দ্রাক্ষাপুষ্পলতার রক্তাভ নীল ফুলটি বোঝায় 'হাঁ'-সঙ্কেত। যে-সংস্কৃতিতে নরনারীর খোলামেলা কথা বলার অধিকার ছিল না, তাদের কথা বলার ভার পড়েছিল ফুলের ওপর। বিষয়টির প্রতি লেডি ম্যারি ওর্ট্লি মন্টেগুর ঔৎসুক্য জাগল। ১৭১৮ সালে তিনি তাঁর বিলাতবাসিনী এক বান্ধবীর কাছে ফুলেল সঙ্কেতের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত একখানি পত্র লিখলেন কন্স্ট্যান্টিনোপ্ল্ থেকে। লেডি মন্টেগুর মৃত্যুর পর তাঁর পত্রাবলি প্রকাশিত হল। যে-সীমিত বৃত্তে সংশ্লিষ্ট পত্রগুলো পঠিত হল, ফুলের ভাষার ধারণাটা তাদের বেশ মনে ধরে গেল।

বেলাল চৌধুরী
তার মানে এই অভিনব বিষয়টির উদ্ভবও মানবসভ্যতার সেই একই সূতিকাগারে? পশ্চিম এশিয়ার সেই একই এলাকায়, যেখান থেকে গোলাপ বেরিয়েছে?

আবদুশ শাকুর
শুধু তাই নয়, মানবজাতির গর্ব করার মতো অনেক কিছুর উৎসই ওই অঞ্চলটি। যাহোক। ইউরোপে 'ফ্লোর‍্যাল কোড' প্রতিষ্ঠিত হল ১৮২০ সালে 'দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ অফ

ফ্লাওয়ার্স'-নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে। এর পরপর পুষ্প সংক্রান্ত অন্যান্য অভিধানও বেরুল। পুষ্প-সঙ্কেতের ধারণাটা এল অত্যন্ত উপযোগী একটি সময়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে বিশ্রামী শ্রেণীর অখণ্ড উদ্ভিদ্সহ পুষ্পসঙ্কেতরীতি আয়ত্ত করা একটা আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক তৎপরতা হিসেবে তাৎক্ষণিক আদৃতি পেয়ে গিয়েছিল বিশেষত সেই লেজারক্লাসটির কালচারে। পুষ্পসঙ্কেত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে গোপনে বার্তা আদানপ্রদানের বাড়তি সুবিধেও এনে দিয়েছিল এমন এক কালে যখন তরুণীদের সঙ্গে বাইরে থাকত বৃদ্ধা-পাহারাদার আর ঘরেও ছিল না টেলিফোনের তার।

বেলাল চৌধুরী

পুষ্পসঙ্কেত টেলিফোনের বিকল্প? অদ্ভুত শুধু নয়, বুদ্ধিদীপ্তও।

আবদুশ শাকুর

সে তো বটেই। পুষ্প-সঙ্কেত কাজ করত পুষ্প লেনদেনের মাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে। প্রাপক ফুলটিকে ঠোঁটে ছোঁয়ালে প্রেরকের জন্য জবাবটা হত 'হাঁ'। আর ফুলটির একটি পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে দিলে জবাব হত 'না'। স্ন্যাপড্রাগন ফুল দিয়েও 'না' জবাব পাঠানো যেত। কিছু জনপ্রিয় ফুলের বার্তা ছিল সহজসরল। ডাবল্ একটি লালগোলাপ বোঝাত ভালোবাসা, সাদালিলি বোঝাত নিষ্কলুষতা, সুইট ভায়োলেট বোঝাত বিনম্রতা। টিউলিপ ছিল ভালোবাসার ঘোষণা। পুষ্প কেবল প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বাণীই বহন করত না। নার্সিসাস্ ফুলটি প্রাপককে অতিমাত্রিক আত্মগর্বের জন্য অভিযুক্ত করত। হাইড্র্যাঞ্জিয়া বোঝাত দম্ভ। ফক্স্গ্লাভ্ বোঝাত কপটতা। একগুচ্ছ পুষ্পই আপনাকে আনুষঙ্গিক বাণী সহকারে বিদায় করে দিতে পারত আপনার কাঙ্ক্ষিতজনের কাছ থেকে।

বেলাল চৌধুরী

তাহলে প্রথমেই আপনি যে-বিভ্রান্তির কথাটি বললেন সে-বিভ্রান্তিটা কোথায়? সবই তো পরিষ্কার ব্যাপার।

আবদুশ শাকুর

প্রধান বিভ্রান্তিটা ছিল পরিকাঠামোর এলাকায়। পুষ্পবিশেষের সঙ্কেতের ব্যাখ্যায় সব পুষ্পাভিধান একমত ছিল না।

বেলাল চৌধুরী

আমাদের বানান-অভিধানগুলোর মতো?

আবদুশ শাকুর

অতটা নয়। তবে অনেকটা। কবি হয়েও কবিপ্রসিদ্ধিগত উপমা না দিয়ে একেবারে ব্যবহারিক একটা উপমা দেবার জন্য ধন্যবাদ মামা। প্রধানত পুষ্পাভিধানগুলোর কারণেই ফুলের ভাষা হয়ে পড়েছিল জটিল ও বিভ্রান্তিকর। যেমন ল্যাভেন্ডার ফুলটি। এক সঙ্কেত-অভিধানে এর তাৎপর্য ছিল 'অবিশ্বাস', আরেকটিতে 'মধুর স্মৃতি'। পিওনি ফুলটি কোনো অভিধানমতে 'লাজুকতা'র সঙ্কেত দিত, আবার কোনো অভিধানমতে দিত কলঙ্কের সঙ্কেত। পুষ্পের তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের একমত হওয়া সম্ভব হলেও, উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া ব্যবহর্তাদের সহমত হওয়া সহজ হত না। যেমন সুইটব্রায়ার পুষ্পের তাৎপর্য 'আমি আঘাত করি আরোগ্য করার জন্য', মাস্করোজ-এর তাৎপর্য খেয়ালি সৌন্দর্য, মস্‌রোজের তাৎপর্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। এসব তাৎপর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফুলগুলোর বটানিক্যাল বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক রয়েছে যা বোঝার জন্য ইউজারদের চলনসই পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন।

বেলাল চৌধুরী

তবে তো হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাও ছিল দেখা যায়।

আবদুশ শাকুর

সে কি আর বলতে? ভুলের সম্ভাবনা ছিল অফুরান। ভুল হামেশাই হত এবং প্রচুর। কখনও আত্মঘাতীও। তবে এই শাপে বরও হয়েছিল কারো-কারো, যেমন কথাসাহিত্যিকদের। ঔপন্যাসিকগণ ভুলবোঝাবুঝির এই সুবর্ণ সুযোগটুকু ব্যবহার করেছিলেন প্রায় শতাব্দীকাল।

বেলাল চৌধুরী

শতবর্ষ ব্যবহারে ছিল পুষ্পসঙ্কেত?

আবদুশ শাকুর

ফুলেল সঙ্কেতের রীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। পুষ্পঘটিত যোগাযোগের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক নির্দেশও ছিল বিস্তারিত: 'আমি' বোঝাতে ফুলটিকে ডানে নোয়াতে হবে এবং 'তুমি' বোঝাতে নোয়াতে হবে বামে।

বেলাল চৌধুরী

এমন মজার সঙ্কেত বাদে আমরা কী প্রেমটা করলাম মামা?

আবদুশ শাকুর

সঙ্কেতটি আমাদের জন্মের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া থর্সটিন ভেব্‌লেন বর্ণিত সেই লেজার-ক্লাসটিও ছিল না এদেশে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের নিশ্চুপতার সংস্কৃতি আর গুপ্তপ্রণয়ের কালের সৃষ্ট পুষ্প-সঙ্কেতের কোনো ভূমিকা বিংশ শতাব্দীর সীমাহীন স্বাধীন, বিশেষত বিশের দশকের ফুর্তিবাজ পারমিসিভ সোসাইটিতে আর বিন্দুমাত্রও ছিল না। সেই থেকে পুষ্পসঙ্কেতরীতিরও ইতি হয়ে গেল চিরতরে। অবিমিশ্র প্রগতি হল কী ?

বেলাল চৌধুরী

নিশ্চয়ই না। তাই অকালে হলেও আমাদের দেশি ফুলগুলোর একটা পুষ্পসঙ্কেতরীতি প্রবর্তন করলে কেমন হয় ?

আবদুশ শাকুর

কাদের জন্য ? আজকের প্রজন্ম তো তাদের সঙ্কেতরীতির প্রচলন করে ফেলেছে।

বেলাল চৌধুরী

কোনটি ?

আবদুশ শাকুর

সেলুলার সঙ্কেতরীতি sms (short message script)। দু'একটা নমুনা : ilu (I love you), সি (when or where meet), fdfs (first day first show).

বেলাল চৌধুরী

এদের সঙ্কেতেও তো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

আবদুশ শাকুর

পারে। তবে যুগটা তো তথ্যপ্রযুক্তির। তাই সহজে এরা সল্‌ভও করে নিতে পারে। যেমন lol যেহেতু lots of laughter সেহেতু lots of love nj lot। যাহোক, যা বলছিলাম। চরমোৎকর্ষের কালে ফুলের ভাষা অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা লাভ করেছিল। অভিধানগুলোতে শত শত প্রজাতির ফুলের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাৎপর্যসহ। কিছু নমুনা দিচ্ছি। ফুলের নাম 'এলিসুম', এর সঙ্কেত হল 'রূপের অতীত মূল্য'। 'অ্যানিমোনি' বোঝাত 'বিস্মৃতি'। 'ব্লুবেল্' বোঝাত 'বিশ্বস্ততা'। 'বাটারকাপ'-এর বার্তা

ছিল 'অকৃতজ্ঞতা'। 'গ্ল্যাডিওলাস্' বলত 'উদ্বাহু' হয়ে আছি। 'হিদার' বোঝাত 'নিঃসঙ্গতা'। 'হায়াসিন্থ্' মানে ছিল 'ক্রীড়া'। 'লাইল্যাক' নিবেদন করত 'প্রথম প্রেম'। 'লোবেলিয়া' বোঝাত 'পরশ্রীকাতরতা'। 'লুপিন' বোঝাত 'অতিমাত্রিক লোলুপতা'। 'ম্যারিগোল্ড্' প্রকাশ করত 'দুঃখ'। 'ন্যাস্টারশিয়াম'-এর তাৎপর্য ছিল 'দেশপ্রেম'। 'পপি' দিত 'সান্ত্বনা'। 'স্টক্' ফুলের তাৎপর্য ছিল 'স্থায়ী সৌন্দর্য'। 'ওয়ালফ্লাওয়ার' পাঠাত 'দুষ্কালীন বিশ্বস্ততা'র বারতা। আর লাল 'টিউলিপ' বলত 'আমি তোমায় ভালোবাসি'।

বেলাল চৌধুরী
টিউলিপও ভালোবাসা জানাত ? গোলাপের মতো ?

আবদুশ শাকুর
জানাত, তবে গোলাপের মতো নয়। গোলাপের মতো ভালোবাসা জানাবার ক্ষমতা আর কোনো ফুলের থাকলে তো গোলাপকে সৃষ্টির সেরা ফুল বলতে বিষ্ণু-ব্রহ্মা দুজনেই একমত হতেন না। তাছাড়া গোলাপ তো টিউলিপের মতো আঘাত হানেনি কোনোদিন কাউকে।

বেলাল চৌধুরী
আঘাত ? ফুলের আবার আঘাত কী ? আঘাত হানলেও পুষ্পাঘাত তো সুখেরই বিষয়।

আবদুশ শাকুর
ফুলের আঘাত সুখের হলেও টিউলিপ ফুলের আঘাত হয়েছিল অপার দুঃখেরই। সে শেয়ারমার্কেটে ক্র্যাশ ঘটিয়েছিল। ফলে সকালের আমির হয়ে গিয়েছিল বিকালের ফকির।

বেলাল চৌধুরী
হল্যান্ডের রূপসী টিউলিপের ব্যবসায়িক কীর্তির কথা মেলাই শুনেছি

আবদুশ শাকুর
আমি তো দেখেওছি। মাঝরাতে কোকেনহফের বিশ্ববিখ্যাত পুষ্পনিলামের কাণ্ড, শেষ রাতে স্কিফোল এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্বের সব বড় বড় রাজধানীতে লক্ষ লক্ষ টিউলিপ বাল্ব রফতানির কারবার। হেরিং মাছটির প্রসেসিং-বিদ্যা যদি সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজদের স্বর্ণযুগ রচনা করে থাকে এবং আমস্টার্ডামকে ইউরোপের রাজধানীর

খ্যাতি এনে দিয়ে থাকে তবে ঊনবিংশ শতকে টিউলিপ ফুলটি হল্যান্ডকে ‘ইউরোপের বাগান উপাধি’টি এনে দিয়েছে।

বেলাল চৌধুরী
সেই ফুলটির শেয়ারমার্কেটের কুকীর্তির কথা তো শুনিনি।

আবদুশ শাকুর
তা হলে শুনুন। এমন সময়ও ছিল যখন একজন হল্যান্ডার সানন্দে তার গোটা মাসের বেতন দিয়ে দিত টিউলিপ ফুলের একটি কন্দের জন্য। উন্মত্ততা বলে মনে হতে পারে। তবে সত্যটা হল, এমনি টিউলিপোন্মাদনা সমগ্র জাতিটিকেই পেয়ে বসেছিল মদ্যপের নেশার মতো। এবং প্রমত্ততাটি স্থায়ী হয়েছিল তিন বছরেরও অধিক কাল।

বেলাল চৌধুরী
হঠাৎ অমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল কীভাবে ?

আবদুশ শাকুর
তুরস্কস্থ অস্ট্রীয় রাষ্ট্রদূত ওজিয়ের ঘিস্‌লেইন্ দ্য বুস্‌বেক্ একটি অদ্ভুত উদ্ভিদের লহরী লক্ষ করলেন অ্যাড্রিয়ানোপ্‌ল্ এবং কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ১৫৪৪ সনে তিনি গুল্মটির কিছু কন্দ পাঠালেন ভিয়েনায় এবং সেগুলো রাজোদ্যানে বপিত হল। পরবর্তী চালানসমূহের গুল্মগুলোর চাষ হল অস্ট্রীয় বণিকদের বাগানে বাগানে। হাজার হাজার টিউলিপ ফুটল অস্ট্রিয়ায়।

বেলাল চৌধুরী
টিউলিপও বেরুল পশ্চিম এশিয়া থেকেই ?

আবদুশ শাকুর
তবে আর বললাম কী ? টিউলিপ ব্রিটেনে প্রথম পৌঁছাল ১৫৭৭ সালে। তার ত্রিশ বছর পর পুষ্পটি উৎপন্ন হচ্ছিল ফ্রান্সে। তবে ফুলটি ইউরোপে উৎসাহ উৎপাদন করছিল সামান্যই। পরবর্তীকালের বদ্ধোন্মাদনার কোনো আভাসও পরিলক্ষিত হচ্ছিল না বহুকাল। টিউলিপ তখন ছিল সাদামাটা : আভায় রক্তলাল, মন্দলাল, আর সাদা। তখনো প্রদর্শনীয় পালকশোভিত জাতিরূপগুলো আবিষ্কৃত হয়নি। টিউলিপের সেই সময়ের অনাদৃতি ইতিহাসের বইগুলোতে উদ্ধৃত হত অ্যান্টোয়ার্প্‌বাসী জনৈক বণিকের গল্প দিয়ে। বিক্রির উপায় না-দেখে একটি চালানের সমস্ত টিউলিপ-কন্দ তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন যে-পরিমাণ কন্দ তাঁকে বিত্তের পাহাড় গড়ে দিতে পারত, মাত্র পঞ্চাশটি

বছর পরেই। কেউ সনতারিখ দিয়ে বলতে পারে না কখন পুষ্পপ্রেমিকের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল টিউলিপ ফুল, আর কখনই-বা তার অসাধারণ জাতিগুলো সংগ্রহের অপার নেশার সৃষ্টি হয়েছিল গণমনে। শুধু এটুকু জানা যায় যে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে ১৬১০ সাল থেকে ১৬২০ সালের মধ্যে এবং আচমকা টিউলিপের দাম হয়ে গিয়েছিল গগনচুম্বী। তবে হল্যান্ডারদের টিউলিপ-বাতিক জাতীয় ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ১৬৩৪ সালে।

বেলাল চৌধুরী

একেবারে জাতীয় ম্যানিয়া বলে ফেললেন যে ?

আবদুশ শাকুর

বলব না তো কী। ওলন্দাজগণ তখন টিউলিপের বাল্ব বা কন্দ কেনার জন্য সর্ব রকমের সম্পদই বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। একটি বিরল ভ্যারাইটির টিউলিপ ফুলের দাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল আস্ত একটি ফার্ম, বিরাট একটি বাড়ি, দামী একটি গাড়ি, এমনকি একটা বিরল ব্রিডের ঘোড়ার দামের চেয়েও বেশি। বাজারের চাহিদার সমান কন্দের জোগান ছিল না বিধায় টিউলিপপুষ্প পরিণত হয়েছিল দূরকল্পী কাগজের সব চেয়ে লোভনীয় পণ্যে অর্থাৎ ফটকাবাজারের হটেস্ট কেকে।

বেলাল চৌধুরী

ফুলটি শেয়ারমার্কেটে ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল কমোডিটির সঙ্গে পাল্লা দিত ?

আবদুশ শাকুর

অবশ্য। তবে এর মার্কেটের ভেন্যু ছিল ভিন্ন। টিউলিপ-নোটের ফটকাবাজারি ক্রেতাবিক্রেতা ব্রুজেসের 'ফান্ দার্ বুর্স্' পরিবারের বাড়িতে মিলিত হত। কালে কালে এই 'বুর্স্'-শব্দটি (Bourse) সংশ্লিষ্ট পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়ে গেল স্থায়ীরূপে। বিশ্বের শেয়ারবাজারের দৈনন্দিনের ব্যবহারে শব্দটি অমনি সজীব রয়েছে আজ অবধি। জীবনের সকল স্তরের ওলন্দাজ জনগণ এই টিউলিপ-নোট কেনাবেচার মোহে বুঁদ হয়ে উঠেছিল। তৎপরতাটা আর টিউলিপ-কন্দের মালিক হওয়ার নান্দনিক ব্যাপার রইল না, হয়ে দাঁড়াল মোটা দাগের পয়সা বানাবার বাণিজ্যিক কারবার। রাতারাতি বিত্তহীন কৃষিকর্মী হয়ে গেল বিত্তবান, কয়েক দিনের পরিসরে লক্ষপতি-কোটিপতিও। ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যক টিউলিপ-কন্দ জোগানোর অঙ্গীকার সংবলিত টিউলিপ-নোটের দাম বেড়ে যেতে লাগল লাগামহীনভাবে, প্রত্যেক স্তরের বিনিয়োগকারীর হাতবদলের সঙ্গে সঙ্গে।

বেলাল চৌধুরী

ঘটনা বটে একখানা। তার পর ?

আবদুশ শাকুর

তার পর যা হবার তাই হল। আঘাত হানল বাজার-মন্দার মহানিম্নচাপ। ১৬৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ওলন্দাজ সরকার ডিক্রি জারি করল যে, সমস্ত টিউলিপ-নোট বাবত প্রদত্ত ওয়াদাগুলো তদ্দণ্ডে পালন করতে হবে অর্থাৎ ওয়াদানুযায়ী টিউলিপ-পুষ্পের কন্দগুলো সরবরাহ করতে হবে অবিলম্বে। ব্যস। পলকে বাজার পড়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হল। ছুটে গেল ফুলের নেশা, ফল ফলল বিষাক্ত। রাতারাতি আমির হল ফকির, অনেকেরই আত্মহত্যা হল পরিণতি। অন্যান্য দেশ এই উন্মাদনার এ মাত্রার শিকার না-হলেও টিউলিপের দাম রয়ে গেল সর্বত্রই চড়া। ব্রিটেনেও ফুলটি সমাদৃত ছিল এবং উনিশ শতক পর্যন্ত ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। টিউলিপের সস্তা কন্দের প্রথম জোগান এল আমেরিকা থেকে। কিন্তু অদ্যাবধি টিউলিপ উৎপাদনের কেন্দ্র রয়ে গেল নেদারল্যান্ডই। ছোট্ট এই দেশটি থেকে প্রতি বছর হাজার মিলিয়নের বেশি টিউলিপের বাল্ব রফতানি হয়। টিউলিপ-বাতিক ওলন্দাজদের ছেড়ে গেলেও, তাদের টিউলিপপ্রীতি অদ্যাবধি সর্বাধিক।

বেলাল চৌধুরী

ঠিকই বলেছেন মামা। টিউলিপ অপুষ্পসুলভ আচরণ করেছে, ফটকাবাজারের উপকরণ হয়েছে। টিউলিপ নিয়ে হই চই বলতে তো শুধু হল্যান্ডেই। গোলাপ তো দুনিয়ার বহু দেশেই বিগ ইন্ডাস্ট্রি। আপনিও লিখেছেন হাজার হাজার বছর ধরেই পৃথিবীর এক নম্বর কাট-ফ্লাওয়ার গোলাপ। কিন্তু কই, গোলাপ নিয়ে তো এমন ধান্দাবাজির দুনিয়াদারি কখনো কোথাও হয়নি। গোলাপ হয়তো এ জগতেরই নয়, ওই জগতেরই। আপনি বলছিলেন এই মহৎ পুষ্পটির আধুনিকায়নে বঙ্গের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। তাহলে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় গোলাপ-বিষয়ে বাংলার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে বলা যায়।

আবদুশ শাকুর

না মামা বিলকুল না। কারণ আমাদের আবহাওয়াটাই গোলাপবান্ধব নয়। গোলাপ এত আর্দ্রতা চায় না, আবার চায় আরও শৈত্য। তবু যাহোক, উপনিবেশের ক্যান্সারটা বঙ্গদেশেই প্রথম মোর্চাটি গাড়ার কারণে বাঙালি তাড়াতাড়িই গোলাপ পেয়ে গিয়েছিল। মোগলসাম্রাজ্য আজও অবধি টিকে থাকলে বাংলার জন্য গোলাপের দিল্লি এখনো দূরেই থাকত হয়তো।

বেলাল চৌধুরী
ইরাক থেকে বেরিয়ে ইউরোপ ঘুরে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সফর তো হল গোলাপের। তো বঙ্গদেশ থেকে বাংলাদেশ তথা আপনার বাগান পর্যন্ত ছোট্ট জার্নিটুকু আর বাকি থাকে কেন।

আবদুশ শাকুর
হক কথা। মোগলরা যেমন গোলাপকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত আনেনি তেমনি পাকিস্তানিরাও পুষ্পটিকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত আনেনি যদিও আমি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে থাকতে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সর্বত্রই সুন্দরী রমণীর দলের অধিক রূপসী গোলাপের কোলাহলই দেখে এসেছি। তার মধ্যে 'সিটি অফ গার্ডেন্‌স'-নামে অভিহিত লাহোর শহরে তো গোলাপের ছিল রঙের রায়ট। অতঃপর ইসলামাবাদ তো হয়ে গেল গোলাপেরও রাজধানী। কিন্তু আমাদের জন্য লাহোর-ইসলামাবাদ তো ভৌগোলিকভাবে দিল্লির চেয়েও 'দূর আস্ত্‌'।

বেলাল চৌধুরী
বলতে চাচ্ছেন : এদেশে আধুনিক গোলাপের চর্চা যেন দেশটা স্বাধীন হবারই অপেক্ষায় ছিল।

আবদুশ শাকুর
এগজাক্টলি। ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে জেনেছি যে সরকারের এককালীন চিফ হর্টিকালচারিস্ট এ. এস. এম. কামালুদ্দীন এদেশে সাফল্যের সঙ্গে গোলাপের প্রথম বাডিং কিংবা চোখকলমটি করেন ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। বাডিঙ্‌ই হল আধুনিক গোলাপের সম্প্রসারণের এবং সংকরায়ণের চাবিকাঠি, বলা যাক মাস্টার-কি। সত্যি আধুনিক গোলাপের স্তর থেকে স্তরে উত্তরণের প্রস্থানবিন্দুটি হল এই চোখকলমই।

বেলাল চৌধুরী
গোলাপে এবং আরো গৃহপালিত উদ্ভিদে কলমের ভূমিকাটা শুনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি কিন্তু নানা রকমের কলমের কথা শুনতে শুনতে সবই গুলিয়ে ফেলেছি। কলমের বিষয়টা একটু পরিষ্কার করুন তো মামা।

আবদুশ শাকুর
গোলাপের কথাই বলি। সিডলিং কিংবা বীজ থেকে চারা বানিয়ে যেমন, তেমনি স্টেম-কাটিং বা ডালকলম, এয়ার-লেয়ারিং বা গুটিকলম, গ্রাউ-লেয়ারিং বা দাবাকলম করেও গোলাপের বংশবৃদ্ধি করা যায়। তবে গুণে কিংবা পরিমাণে কোনো দিক থেকেই ভালো

হয় না। কারণ অভিজাত গোলাপের নিজস্ব শিকড় নাজুক বলে বেশির ভাগই টেকে না, টিকলেও শ্রেষ্ঠ মানের ফুল দেয় না। অপরপক্ষে গ্রাফটিং কিংবা জোড়কলম আর বাডিং কিংবা চোখকলমের মাধ্যমে অভিজাত গোলাপগাছটি জংলি গোলাপগাছের মজবুত শিকড়ের জোগানে বেড়ে উঠে জেঁকে বসতে পারে বলে টেকেও জবর, ফুলও দেয় দারুণ।

বেলাল চৌধুরী
পরের ধনে পোদ্দারি আর কি!

আবদুশ শাকুর
হাঁ মামা, পোদ্দারি-পেশাটি নিন্দিত হলেও ফলটা বড়ই নন্দিত। এর মধ্যে চোখকলমের আত্মপ্রতিরূপ নির্মাণের প্রক্রিয়া জোড়-কলমের চেয়ে বহুগুণ বেশি উন্নত। জীবনীশক্তিও অনেক বেশি চোখকলমের। যেমন ধরুন অভিজাত গোলাপের গোটা একটা ডাল লাগে জংলি গোলাপগাছের শিকড়সংবলিত একটা চারার জন্য। অথচ ওই ডালটি থেকেই বহু চোখ নিয়ে অনেকগুলো চোখকলম এক সঙ্গেই করা যায় জংলিটির ছোট ছোট ডাল কেটে কেটে।

বেলাল চৌধুরী
তাহলে এটা না করে অত রকম কলম করাই-বা কেন?

আবদুশ শাকুর
চোখকলমের এলেমটা ছিল না বলে। দেখুন না, রবীন্দ্রনাথের মতো পুষ্পপ্রেমীও গোলাপের ডাল পোঁতার কথা বলছেন এই সেদিন পর্যন্ত।

বেলাল চৌধুরী
কবে?

আবদুশ শাকুর
১৩৪০ সালে, মানে ১৯৩৩ সনে।

বেলাল চৌধুরী
তবে কি মালঞ্চে?

আবদুশ শাকুর

হাঁ। পুষ্পোদ্যানে আধারিত ট্র্যাজিডি 'মালঞ্চ' উপন্যাসে। নায়ক পুষ্পবণিক আদিত্য পার্শ্বনায়িকা সরলাকে বলে গেছেন গোলাপের ডাল পুঁততে। শুনে ঈর্ষান্বিতা নায়িকা নীরজা হলা মালিকে ডেকে হুকুম দিলেন বাবু শহর থেকে ফেরার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি। উপন্যাসটি ১৩৪০ সালের আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার বিচিত্রা পত্রিকায় ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় এবং চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বেলাল চৌধুরী

আপনি বলছেন কাটিঙে ভালো হয় না গোলাপ ?

আবদুশ শাকুর

প্রধান আধুনিক গোলাপগুলো তো নয়ই। কলমের মাহাত্ম্যটা হল ঝটপট নতুন গাছটা পেয়ে যাওয়া এবং ফুলও কোয়ালিটিতে বেটার পাওয়া। আরো গোড়ার কথাটি হল বীজ থেকে নয়, সরাসরি গাছ থেকেই শিকড় পাওয়া। তাই কখনো শূন্যে মূল গাছের ডাল বাঁকিয়ে এলা গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে, কখনো বাঁকানো ডালটিকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে শিকড় গজিয়ে নেওয়া হত। কিন্তু একই গাছের, মানে নিজেরই অঙ্গের, বলে শিকড়গুলো হত বড়লোকের পায়ের মতোই নাজুক আর দুর্বল। তবু শাখা কলম মারফত র‍্যামলার, ক্লাইম্বার, মিনিয়েচার গোলাপ এবং বেশির ভাগ শ্রাব রোজসহ কিছু ফ্লোরিবাকন্ত গোলাপশ্রেষ্ঠ হাইব্রিড-টীর সম্প্রসারণের প্রথম ভালো ব্যবস্থা হল গ্রাফটিং কিংবা জোড়কলমের জ্ঞানের মারফতই বাবুগোলাপের নাজুক চোখটির জন্য শ্রমিকগোলাপের দৃঢ় শিকড়ের শ্রমটি অপহরণের ফন্দি শেখার পরে। শ্রমিকগোলাপের সেবার এই অমূল্য অবদানই গবেষকদের প্রলুব্ধ করল সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করার প্রতি। সেই কাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়াটিই হল বাডিং বা চোখকলম। ইউরোপে 'স্ট্যান্ডার্ড রোজ' তৈরির জন্য এর ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। তবে গোলাপের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাডিঙের ব্যবহার পশ্চিমেও ছিল উনিশ শতকেরই ব্যাপার।

বেলাল চৌধুরী

এতই গুরুত্বপূর্ণ যখন বাডিঙের ব্যাপারটা একটু শুনতেই ইচ্ছে হচ্ছে।

আবদুশ শাকুর

গোলাপের রুটস্টক বা মূলাধারকে বলা হয় ওয়াইল্ড বা জংলি কিংবা এলা গাছ। আমি বলি শ্রমিকগোলাপ। শ্রমিকটির ডালের চামড়া চিরে বসিয়ে দেওয়া হয় কুলীন গোলাপের কুঁড়ি আমি বলি বাবুগোলাপের অঙ্কুর। এই সায়নটিকে বলা হয় পরশাখী,

মানে পরের বাচ্চা। সায়ন মানেও দুধের বাচ্চাই, চোষক। এক্ষেত্রে শোষকই, যেহেতু শিশুটি পরের দুধ খেতে এসেছে। মূলাধারটি শিকড় ছাড়লে পরশাখীটির কিশলয় গজায়। তখন রুটস্টকটিকে কেয়ারিতে কিংবা হাপড়ে বপন করা হয়। এবং ছোটবাবুটির বড়বাবুটি হয়ে ওঠা নির্বিঘ্ন করার জন্য শ্রমিকটির সন্তানদের মাথা তোলামাত্রই হত্যা করা হয় অবাঞ্ছিতজ্ঞানে মানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়, যাকে বলে নিপিঙ্ ইন দ্য বাড্। এহেন শোষণের বিনিময়ে আমাদের তোষণের কর্মে আত্মোৎসর্গিত এদেশের মহত্তম ওয়াইল্ডরোজ বা জংলিগোলাপটি হল রোজা মাল্টিফ্লোরা। সরজমিন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই মূলাধারটির উপরে চোখকলম করলে কুলীন ফুলের ফলন ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বেলাল চৌধুরী

এই দুর্দান্ত বিদ্যাটি এদেশে যিনি প্রথম আয়ত্ত করেন তাঁকে তো আধুনিক গোলাপের বাংলাদেশি পিতৃসমই বলা যায়।

আবদুশ শাকুর

যেত, যদি তিনি বিদ্যাটির সন্তান-সন্ততি জন্ম দিতেন। তাই যিনি অসংখ্য শিষ্যের সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই 'গোলাপপিতাসম' বলে আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন জানিয়েছে 'বাংলাদেশ জাতীয় গোলাপ সমিতি' ১৯৮৯ সনের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী উপলক্ষে। তিনি মিরপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের তদানীন্তন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার গোলাম সাত্তার চৌধুরী। এই পুষ্পপ্রেমী অসাধারণ অধ্যবসায়ে বছরের প্রতিটি মাসে বাডিং করতে করতে 'লার্নিং বাই ডুয়িং' সম্পন্ন করেন যে এদেশে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই বাডিং সফলতম হয়। অতঃপর তিনি মনের আনন্দে পেশাদার মালাকর এবং অ্যামেচার রোজারিয়ানদের বাডিং শিখিয়ে দ্রুত গতিতে আধুনিক গোলাপের চর্চাটা ছড়িয়ে দেন। বটানিক্যাল গার্ডেনে প্রথমে গেটসংলগ্ন আয়তক্ষেত্রটিতে একটি এবং পরে পরিচালকের অফিসসংলগ্ন বিশাল বৃত্তটিতে আরেকটি সমৃদ্ধ গোলাপবাগান, বলতে গেলে, তিনি হাতে-কলমেই গড়ে তোলেন সত্তরের দশকের প্রথম ভাগে। দশকটির শেষভাগে বিডিআরের গোলাপবাগানটির পরিকল্পনাও তাঁরই এবং বাস্তবায়নের প্রথমপর্বের তত্ত্বাবধায়কও তিনিই।

বেলাল চৌধুরী

আমি নিশ্চিত যে অন্তর্গত পুষ্পপ্রেম প্রেরণা না জোগালে কেবল জনৈক সহকারী তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্যপরায়ণতা এতবড় গোলাপবাগান গড়ে তুলতে পারে না।

আবদুশ শাকুর

না, তা পারে না। ফুলের এই স্বভাবপ্রেমী এর আগে বলধাগার্ডেনে কর্মরত থাকাকালীন ক্যামেলিয়া ফুলের কাটিঙে সফল হচ্ছিলেন না। তখন, আরেক উদ্ভিদপ্রেমী, বটানিক্যাল ও বলধা গার্ডেনের তদানীন্তন কিউরেটর শামসুল আনোয়ার তাঁকে বললেন যে ক্যামেলিয়া ফুলটি চা-এর উদ্ভিদপরিবার Theaceae'র সদস্য। এবং উদ্ভিদের বর্গীকরণজনক কার্ল লিনিয়াস চা-পাদপকে বর্ণনা করেছেন দুটি গণসহযোগে, ক্যামেলিয়া ও থিয়া। টি-বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নামও 'ক্যামেলিয়া সাইনেন্সিস'। অতএব ক্যামেলিয়ার কাটিঙ ব্যবহারের টেকনিকটি তিনি টি-গার্ডেন থেকে শিখে নিতে পারেন। ব্যস, শুনেই বলধাগার্ডেনের এই তত্ত্বাবধায়ক সোজা শ্রীমঙ্গলের চা-বাগানে গিয়ে কয়েকদিন সেখানে থেকে চা-গাছের কাটিং নেওয়া এবং সেটা লাগানোর টেকনিক শিখে এলেন। এবং সেটি প্রয়োগ করে বলধাগার্ডেনের ক্যামেলিয়া তরুটি থেকে মহাগদ্যকবির ক্যামেলিয়া ফুলের বংশবিস্তারের প্রক্রিয়াটি চালু করে দিলেন।

বেলাল চৌধুরী

তনুকা বললে, দামি দুর্লভ গাছ,
এদেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।'
জিগেস করলেম নামটা কী ?'
সে বললে, ক্যামেলিয়া'।
চমক লাগল?
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।'

আবদুশ শাকুর

দামী গাছই শুধু নয়, দামী ফুলও যার জন্য জীবনের মূল্য পর্যন্ত দিয়েছেন কেউ কেউ।

বেলাল চৌধুরী

রোমানদের মতো নাকি ? নিরোর ভোজোৎসবের গোলাপসমাধি বরণকারী মেহমানদের ?

আবদুশ শাকুর

তারা তো গোলাপের জন্য প্রাণ দেয়নি। তারা মরেছে গোলাপের পাপড়িতলে চাপা পড়ে। ওটাকে রোজ-অ্যাকসিডেন্ট বলা চলে রোড-অ্যাকসিডেন্টের মতো। সর্বদেশে সর্বকালে গোলাপপ্রেমীর সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু কেউ গোলাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে বলে ফুলের ইতিহাসে লেখা নেই। বরং লেখা আছে যে ক্যামেলিয়াপ্রেমী ফুলটির জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন একাধিক ব্যক্তি। প্রথমজন তো ক্যামেলিয়ার প্রথম ব্রিটিশ লালক স্বয়ং।

বেলাল চৌধুরী

তাই নাকি ? ঘটনাটা কী ?

আবদুশ শাকুর

জেসুইট মংক্ গেয়র্গ য়োজেফ কামেল ফিলিপাইনে উদ্ভিদ সংগ্রহ করার সময় চিরসবুজ কান্তিময় এই পুষ্পগুল্মটিকে আবিষ্কার করেন। ফুলটি আজ তাঁরই নামানুসারে বিশ্বময় পরিচিত ক্যামেলিয়া। ইংল্যান্ডে ফুলটির প্রথম দুটি চারা লালন করেন লর্ড পেট্র, এসেক্সে। তাঁর মালি জেম্স গর্ডন্ উষ্ণ অঞ্চল থেকে আহরিত বলে, কচি গাছগুলোকে যেন উনুন-উদ্ভিদই ভেবে বসেছিলেন। জমাটি শীতের দেশে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট উষ্ণমণ্ডলীয় পরিবেশে পালন করতে গিয়ে অনভিজ্ঞ মালি চারা-দুটি মেরে ফেলেন দেখতে না-দেখতেই। এত বড় শোকের ভার সইতে না পেরে ভগ্নহৃদয় লর্ডও অবিলম্বেই মারা যান।

বেলাল চৌধুরী

চারার মৃত্যুশোকে মানুষ মারা গেল ?

আবদুশ শাকুর

এর চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা কমই আছে এ জগতে। এমনি মৃত্যুর হুমকির মুখে আমিও পড়েছিলাম একাধিকবার। কে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে আমি জানি না। হয়তো একেই নিয়তি বলে। প্রথম বার দুর্ঘটনাটা ঘটে আমার গোলাপবাগান-পাহারাদার জার্মান শেফার্ড ডগ 'টাইগার' বাহাদুরের আদিখ্যেতায়। জার্মানিরই কর্ডেস-ঘরানার 'আম্বসফুঙকন' অথবা 'অ্যান্ভিল স্পার্কস'-নামক নতুন আসা একটা গোলাপের অবশিষ্ট চারাটি সো-কল্ড কিলার-সিটের ফ্লোরে বসিয়ে নার্সারিটি থেকে পাঁচটি মাইল কেয়ারফুলি ড্রাইভ করে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে গেলাম। দারোয়ান গেট খুলে দিতেই প্রভুদর্শনে প্রথম স্পর্শের জন্যে ব্যাকুল অ্যালসেশিয়ানটি দীর্ঘ লম্ফে গাড়ির সামনে এসে যেতেই ব্রেকে পা পড়ে গেল আমার, যাকে বলে, রিফ্লেক্স অ্যাকশনে। এই সামান্য

জার্কেই পলিথিন ব্যাগটা সামনে হেলে গেল। আর অমনি বাডজয়েন্ট-পয়েন্টে ওয়াইন্ডের ডাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে গেল স্যাপলিংটি। আমারও যেন কলজের বোঁটাটা ছিঁড়ে আলগা হয়ে গেল। মায়ের ইমার্জেন্সি কল্ পেয়ে ডাক্তার ছেলে ছুটে এসে দশ মিলিগ্রাম ক্লোবাজ্যাম আর দশ মিলিগ্রাম প্রোপানলল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বসে থাকল ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং যাবার সময়ও পাহারা বণ্টন করে গেল বাকি রাতটার।

বেলাল চৌধুরী

এতটাই কি লাগে ?

আবদুশ শাকুর

লাগবে না ? 'অ্যানভিল স্পার্কস'-গোলাপটার প্রবাল-লাল পাপড়ির ওপর দীর্ঘ সরু সোনালি হলুদ ডোরাগুলো 'নেহাইয়ের ওপর ফুলকি' ছোটাবে না আমার বাগানে সে নির্মম সত্যটি মেনে নিতে হৃদয়বিদারক ব্যথা তো লাগবেই। তবে একটা লিজ-অফ-লাইফ পেয়েছিলাম বলেই ব্যাথাটা সারাতে পেরেছিলাম পুনরায় চারা তৈরি করিয়ে এনে ফুলটি ফুটিয়ে।

বেলাল চৌধুরী

এই অভিজ্ঞতা একাধিকবারের কথা বলছিলেন না ?

আবদুশ শাকুর

হাঁ। আরেকবারের কথা বলছি। 'মিস্টার লিংকন'-গোলাপটির চারা নির্ভরযোগ্য নার্সারিমেন থেকে এবং প্লান্টটির বাড গোলাপবিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে একাধিকবার এনে আমার বাগানে লাগিয়েছি। পরে আবিষ্কার করেছি যে প্রকারটি 'ক্রিশ্চান ডিয়র' 'মিস্টার লিংকন' নয়।

বেলাল চৌধুরী

এ রকম কী করে হতে পারে ?

আবদুশ শাকুর

নানান কারণ থাকে। এ ক্ষেত্রে কারণ ছিল দুটি বর্ণ এবং গন্ধ। এ দুটি ভ্যারাইটির মধ্যে প্রধান তফাৎই হল বর্ণ ও গন্ধের। এ দুয়ের পার্থক্যসূচক সঙ্কেতও কেবল রঙেরই লেখা হয় ডি.আর. কিংবা ডিপ রেড এবং এম.আর. মানে মিডিয়াম রেড। কিন্তু এ দুটি বস্তু শীতের দেশে গাঢ় থাকে, গরমের দেশে ফিকে হয়ে যায়। প্রোফেশনাল পুস্তকগুলো

সেদেশের এবং ফুলের বর্ণনাগুলোও স্থানীয় বাগানের পর্যবেক্ষণানুযায়ী। কিন্তু সে-রেজাল্ট এদেশের আবহাওয়ায় পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য দুটি গোলাপের কথাই বলছি। এদেশে লিংকনের গাঢ় লাল বর্ণ আর গভীর সুগন্ধ দুটোই ফিকে হয়ে ডিয়রের মাঝারি লাল আর হালকা ঘ্রাণের সঙ্গে মিশে যায়। বাকি প্রধান তফাত পাপড়ির। লিংকনের পাপড়ির সংখ্যা পঁয়ত্রিশ আর ডিয়রের পঞ্চান্ন। লোকে মনে করে এদেশের প্রতিকূল পরিবেশে এবং অপর্যাপ্ত পুষ্টিতে ফুল যথেষ্ট পুষ্ট না-ও হতে পারে। অবশিষ্ট তফাতটি বাড-শেপের। তা ডিয়রের কোরক ওভইড্ কিংবা ডিম্বাকৃতি, লিংকনের কলি আর্ন-শেপ্ড অথবা ঘণ্টাকৃতি এত সব বিশ্লেষণ করবে কে ?

বেলাল চৌধুরী
গোলাপবিশেষজ্ঞ ?

আবদুশ শাকুর
তেমন বিশেষজ্ঞ দেখি না এখানে।

বেলাল চৌধুরী
তারপর লিংকনসাহেবের কী হল ?

আবদুশ শাকুর
ও হাঁ যা বলছিলাম। ঠিক করলাম, নেক্সট টাইম বিদেশে গেলে মিস্টার লিংকনের একটা বেয়ার-রুট প্লান্টই নিয়ে আসব। হঠাৎ খবর পেলাম জনৈক লিংকনপ্রেমী ঠিক তাই করেছেন। পরিচয় করে তাঁর প্লান্টটি থেকে একটা কুঁড়ি এনে নিজের বাগানের ওয়াইল্ড-কর্নার থেকে বাছাই একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে চোখকলম করে বাডটা লাগালাম। চারা হল এবং জমিতে জমেও গেল। অধীর আগ্রহে দিন গুনছি গাছটা বাড়ার আর ফুলটা দেখার আকুল আশায়। এর মধ্যে এক বিকেলে এক পশলা শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। বাইরে থেকে ফিরেই ছুটে গিয়ে দেখলাম যে বেডের পাশে লিংকনের মৃতদেহটি পড়ে আছে সজীব কিশলয়গুলো নিমীলিত নির্জীব।

বেলাল চৌধুরী
অর্থাৎ পুওর মিস্টার লিংকন আপনার বাগানেও অপঘাতমৃত্যুরই শিকার হলেন। শিলাবৃষ্টি তাহলে গোলাপেরও ক্ষতি করে।

আবদুশ শাকুর

সাধারণত করে না। তবে বড় আকারের শিলা বাডজয়েন্টে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে পড়লে পূর্ণবয়স্ক গোলাপগুল্মটিকেও ভূপাতিত করে ফেলে চোখের পলকে। একবার আমার বাগানের সব চেয়ে মজবুত, প্রায় মহীরুহসম, 'হেংকেল রয়েল'-গোলাপের গুল্মটিকে ফেলে দিয়েছিল আমার চোখের সামনেই শিশুর বাহুর মতো মোটা কাকে শিলাবৃষ্টির সময় স্ত্রীর দোয়াদরূদে স্বামীও শামিল হয়ে যেত স্ত্রী তাঁর লেংড়া-ফজলি আমের জন্যে আর স্বামী তার প্রেমা-ডায়োরামা গোলাপের জন্য।

বেলাল চৌধুরী

আপনার দোয়াদরূদ নিশ্চয় ডবল করতে হত। কেননা আমগাছ থেকে শিলা এমন কোনো অপরিণত আম ফেলে দিতে পারে না যা কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় মানুষ খেয়ে ফেলতে পারে না। কারণ হেইলস্টর্মের মৌসুম আসতে আসতে আমগুলো কোনো না কোনো রেসিপিতে ভিড়ে যাবার মতো হয়ে ওঠার অবকাশ পায়। গোলাপফুলের তো সে সুযোগ নেই। তা ছাড়া বেচারার তো দেখা যায় গোটা গাছটাই উপড়ে ফেলে এই পাষন্ড প্রস্তর। সে যাক। আমার কিন্তু ক্যামেলিয়ার কাহিনীটা শোনা হল না মামা।

আবদুশ শাকুর

ক্যামেলিয়ার চারা-দুটির ট্র্যাজিক মৃত্যুঘটিত অভিজ্ঞতার আলোকে ১৭৪০ সালে আরেকটা চারা জোগাড় করে স্রেফ মিশনস্বরূপ সাধনার বলেই সফল হন অনুতপ্ত উদ্যানপালক গর্ডন। সম্ভবত প্রয়াত প্রভু পেট্রের ক্যামেলিয়াপ্রীতির স্মৃতিতাড়িত হয়েই একটি নার্সারি খুলে রোম্যান্টিক এই সুদর্শন ফুলটির সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন জেমস। ক্যামেলিয়াপ্রেমী শহীদ বাগবান লর্ড পেট্রের বিশ্বস্ত মালাকর জেমস গর্ডনের এই ক্যামেলিয়া-চারাটিরই সন্তান ব্রিটেনের প্রথম দিককার সকল ক্যামেলিয়া।

বেলাল চৌধুরী

ক্যামেলিয়ার প্রতি এতই প্রেম ব্রিটিশদের ?

আবদুশ শাকুর

ফরাসিদের রেকর্ড তো আরো সমৃদ্ধ। আর্ফঁসিন প্লেসিস গ্রাম থেকে শহরে আসেন ১৮৪০ সালে, প্যারিসে। মাত্র পনেরো বছর বয়সী এই রূপসীর প্রতি প্রেম নিবেদিত হয় ফরাসি নাট্যব্যক্তিত্ব আলেগ্জঁদর দ্যুমা ফিস্ (১৮২৪-৯৫), হাঙ্গেরিয়ান পিয়ানো-লেজেন্ড লিজ্‌ৎ (১৮১১-৮৬) প্রমুখের মতো তৎকালীন তাবড় সেলিব্রিটিদের। রূপের বাইরে প্লেসিসের বিশেষ একটি পরিচিতি ছিল তাঁর সাদা ক্যামেলিয়ার প্রতি অতিশয়

আবেগপূর্ণ ভালোবাসার সুবাদে। ধনাঢ্য এবং বিখ্যাত এই ক্যামেলিয়া-প্রেমিকাও করুণ মৃত্যুবরণ করেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে। মাদমোয়াজেল প্লেসিসকে অনুরক্ত দ্যুমা তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি খধ উধসব ধীঁ ঈড়সবষরধং ('লা দাম্ ও কামেলিয়া' অথবা ক্যামেলিয়াধারিণী রমণী)-নামক নাটকটির ভিয়োলেত্তা-চরিত্রে অমর করে রাখেন। কী ভাগ্যবতী পুষ্প এই ক্যামেলিয়া দেখুন তো মামা। ফুলটিকে অমর করে রাখে প্রথমে ঔপন্যাসিক আলেগ্জঁদর দ্যুমার পুত্র নাট্যকার আলেগ্জঁদর দ্যুমা ফিস (জুনিয়র)-এর মতো স্বকালের প্রসিদ্ধ একজন নাট্যকার এবং পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সর্বকালের মহত্তম শিল্পী একজন স্মরণীয় নাটকে তো আরেকজন অবিস্মরণীয় কবিতায়।

বেলাল চৌধুরী

বাসাবাড়ি কোথাও নেই,
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

আবদুশ শাকুর

কবিতাটি অতি প্রিয় আমারও। শুধু কবিতা তো নয়। কখনো মনে হয় ছোটগল্প। কখনও ভাবি, না কি উপন্যাসই।

বেলাল চৌধুরী

তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
এত আকর্ষণ কিসে মামা ক্যামেলিয়ার ?

আবদুশ শাকুর

প্রথমত চিরহরিৎ গুল্মটাই তো দেখার মতো ছোটখাটো গোছালো ঘনসবুজ সুমসৃণ পত্রালিতে আবৃত। উষ্ণতার পতন আর শৈত্যের উত্থানের মধ্যবর্তী মৌন-নীরব মৌসুমের অনুকূল মেজাজি এই হৈমন্তী অতিথি, যার কোনো কোলাহল নেই না ফুলে, না রঙে। অল্প কয়েকটি রঙের অল্প কয়েকটি ফুলের কারবার ক্যামেলিয়ার। তবে দুই-ই সুন্দর ফুল এবং রঙ। ঘরানাটা দেখতে হবে না ?

বেলাল চৌধুরী
কোন্ ঘরানা মামা ?

আবদুশ শাকুর
গোলাপপরিবারের কৃতী সন্তান না ?

বেলাল চৌধুরী
ক্যামেলিয়াও গোলাপপরিবারভুক্ত ?

আবদুশ শাকুর
হাঁ মামা। গোলাপের আদল তো ক্যামেলিয়ার ফুলেই আছে। রঙে আছে গোলাপের আভাস। সব মিলিয়ে গোলাপের আদরা এক নজরেই লক্ষণীয়। ক্যামেলিয়াকে সময় সময় আমার কাছে ওল্ডরোজের মতোই লাগে। আমার তো মনে হয় গোলাপপরিবারটি সমগ্র উদ্ভিদজগতেরই মহত্তম। এর সদস্যদের স্মরণ করে দেখুন এককালীন : ক্যামেলিয়া, স্পিরিয়া, হথর্ন, সিংকফয়েল, কেরিয়া জাপনিকা এবং 'ফ্লাওয়ার অফ ফ্লাওয়ার্স' অভিধায় অভিহিত গোলাপের মতো ফুল। পিচ, পিয়ার, প্লাম, এপ্রিকট, চেরি, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি, রাস্পবেরি, আমন্ড ও সম্রাট আপেলের মতো ফল। ঘ্রাণের রানী চায়ের মতো বিশ্ববরেণ্য পেয়। সবই একই ঘরানার কৃতী সন্ততি। তবে গোলাপপরিবারে গোলাপ ছাড়া আরও কোনো কৃতী সদস্য আছে তেমন তথ্য পর্যন্ত অপছন্দ রবার্ট ফ্রস্টের।

বেলাল চৌধুরী
কী বলেন কবি ?

আবদুশ শাকুর
পড়ে শোনাচ্ছি :

গোলাপ শুধুই গোলাপ
যুগযুগ ধরে সে ছিল শুধুই গোলাপ।
যদিও অধুনা প্রচলিত আছে তত্ত্ব :
আপেলেও পুরোদস্তুর গোলাপত্ব,
নাসপাতি সেও গোলাপ, এবং কুল
অনুমান করি, বনেছে গোলাপফুল।
তারও পরে যদি কোনোখানে কেউ আর

হতে চায় ফের গোলাপের দাবিদার
সে জানে প্রেমিক। তুমি অবশ্য আছো
গোলাপ, এবং চিরকাল ধরে গোলাপ হয়েই বাঁচো।

বেলাল চৌধুরী

কবিতাটা নিশ্চয় আপনি বার বার পড়েছেন। কবির উপলব্ধি ঠিক কী মনে হয় আপনার ?

আবদুশ শাকুর

তাঁর কাছে গোলাপ এমনি একটি এন্টিটিরূপে প্রতিভাত হয় যার অস্তিত্ব স্বয়ংসৃষ্ট, স্বয়ম্ভূ। মানে, যে স্বেচ্ছায় শরীরধারী। ফ্রস্টের উপলব্ধ উদ্ভিদবিশ্বে গোলাপ একটা মিউটেশন, পরিব্যক্তি, একটা স্পোর্ট, আ ফ্রিক অফ নেচার যার পূর্ব নেই, পর নেই; আপন নেই, পর নেই। এক কথায় যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আমারও মনে হয় গোলাপ ব্যাখ্যেয় নয়। গোলাপ অনির্বচনীয়।

বেলাল চৌধুরী

ফ্রস্টের মন বলতে পারে গোলাপের আপন নেই, পর নেই। কিন্তু আমি তো দেখছি গোলাপপরিবারের সৌজন্যেই দিনভর আমাদের গোলাপভজনাটা চলছে। ঘুগনি-চটপটিতে এ-পরিবারের কেউ আছে কিনা জানি না। তবে কিছুক্ষণ পর পর এই যে টেবিলে রাখা আপেলের টুকরো মুখে তুলছি আর চা পান করছি এ না হলে কি খালি গোলাপের আলাপে পেট ভরত ? তাছাড়া গোলাপের স্বজনপরিজন না থাকলে রবির মতো কবি ক্যামেলিয়া দেখতেন কী করে ?

বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের ওপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'
আমি বললেম, 'এইজন্যেই।'
তারপরে ফিরে এলেম কলকাতায়।'

এর পরে আমরাও ফিরে চলি মিরপুরে।

*মামা-ভাগ্নে শব্দবন্ধটি এই অনিত্য জীবনে নিত্যরসের বলেই স্বতঃসিদ্ধ। তাই সম্পর্কটির শিকড় সন্ধানে
সময় নষ্ট করিনি আমরা।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে]

বই আলোচনা

....

আ নি সু জ্জা মা ন

বই : আমি তুমি সে
লেখক : সলিমুল্লাহ খান
প্রকাশনী : সংবেদ প্রকাশনা
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৩২

সংকলনটিতে সলিমুল্লাহ্ খান লিখিত চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত মোট উনিশটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রবেশিকা নামে রয়েছে সম্পাদকীয়; অনেকটা প্রাক্কথন হিসেবে আছে প্রার্থনা শীর্ষক সলিমুল্লাহ খানের নিজের একটি লেখা এবং সবশেষে যুক্ত হয়েছে জাক লাঁকার একটি বক্তৃতা, সলিমুল্লাহ খান অনূদিত এর শিরোনাম: "গঠন কাহিনী অথবা অন্তর্জগতে যাহা না মিশিলে কোন সহজই জন্মায় না সেই পরকীয়ার কথা"– এর মূল পাঠ: Of Structure as an Inmixing of an otherness prerequisite to any subject whatever".

যে চারটে মূল শ্রেণীতে প্রবন্ধগুলো বিভক্ত সেগুলো হল: ১. লাকাঁ, ২. ফ্রয়েড ও লাকাঁ, ৩. লালন ফকির ও ৪. গয়রহ

প্রথম বিভাগের প্রবন্ধ সংখ্যা দু'টো : প্রথমটির শিরোনাম : 'ভাষা, গঠন ও সহজ মানুষ' অধঃ শিরোনাম : 'লাকাঁ পড়ার ভূমিকা',

প্রায় আধা পৃষ্ঠার রেফারেন্স (যার বাংলা সলিমুল্লাহ খান করেছেন দোহাই) বাদ দিলে এ প্রবন্ধটি পাঁচ পৃষ্ঠার মতো। সংক্ষিপ্ত হলেও এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা। জগৎ (বহির্জগৎ ও অর্ন্তলোক), সে জগতের অবস্থান, প্রকৃতি ও জগতের আধেয় নিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে লাকাঁর মূল দৃষ্টি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে লেখাটি যথার্থই ভূমিকা স্বরূপ– অত্যন্ত সহায়ক।

এ বিভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি, আগেই বলেছি, লাকাঁ প্রদত্ত একটি বক্তৃতার অনুবাদ। এ বক্তৃতাটিতে লাকাঁ জগৎ ও জীবন অধ্যয়ন ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে 'অন্য',

‘পর’, অপর, ‘পরম’,-এর ভূমিকা, গুরুত্ব, ব্যঞ্জনা তথা এক ধরনের অবিচ্ছিন্নতার কথা বাঙময় করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, উদাহরণ ও ব্যাখ্যার সাথে সব স্থানে সবাই একমত হবেন, এমন আশা করি না, হবে আমাদের চৈতন্যলোকে তা যে এক ধরনের আবেদনের সৃষ্টি করে তা-ও তো অস্বীকার করতে পারি না। লাকাঁর মত গ্রহণ কি বর্জন সে তো পরের কথা, উপভোগ করা কি কম গুরুত্বপূর্ণ!

দ্বিতীয় বিভাগে প্রবন্ধের সংখ্যা ছয়: সেগুলোর শিরোনাম ও বিষয়বস্তু যথাক্রমে নিম্নরূপ: ১. তত্ত্বজ্ঞান ও মতিবিভাজন।

সলিমুল্লাহ খান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে (দোহাই সহ পাঁচ পৃষ্ঠার মতো) অতি সংক্ষেপে ফ্রয়েডের সাইকোএনালিসিস (খানের অনুবাদে মতিবিভাজন) পদটির গভীর উপলব্ধি ও তার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ কিভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে (খানের অনুবাদে তত্ত্বজ্ঞান) বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এ ধারা ভাবনা কিভাবে আধুনিক দর্শনের জনক বলে খ্যাত ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত ও বিশ শতকের আর একজন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার সার্ত্রের চিন্তাধারার ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেয় সলিমুল্লাহ খান তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমি জার্মান বা ফরাসি ভাষা জানি না। সলিমুল্লাহ খান ‘অজ্ঞান’ পদটি ইংরেজি unconscious না subconscious–এর মধ্যে কোন্‌টির অর্থে ব্যবহার করেছেন জানি না। অজ্ঞানতা আর অচেতনতা সাধারণভাবে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায় না। একটি কাঠের টুকরো, অচেতন– প্রাণহীন অর্থে– এ ক্ষেত্রে কি অজ্ঞানতা ব্যবহার করা যায়? অপর পক্ষে, একটা বেড়ালের মানসিক অবস্থা নির্দেশের ক্ষেত্রে কি আমরা অবচেতনতা, বা তারও থেকে বড় কথা অজ্ঞতা, অথবা বিপরীত দিকে শেষ সীমায় পৌঁছে, জ্ঞান প্রত্যয়টি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি? এরূপ যে বোধ করি না সেটি কি কেবল মানব প্রজাতিপ্রীতিজাত? আমার কাছে যেন কেমন লাগে। সলিমুল্লাহ খানের নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা আছে এবং আমার স্বীকার করতে কোনো সংকোচও নেই যে সে ব্যাখ্যা শুনতে আমারও ভালো লাগবে, আমি তাঁর ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে না পারলেও।

এ বিভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম: ‘ফ্রয়েড মানে আনন্দ’ এটিও একটি ছোট প্রবন্ধ। খণ্ডিত পৃষ্ঠা জোড়া দিলে মাত্র চার পৃষ্ঠার মতো, কিন্তু বেশ উপভোগ্য ও ব্যঞ্জনামণ্ডিত। এ প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান মানুষের অবচেতন মনের সাথে তার সচেতন মনের সম্বন্ধ বিষয়ক ফ্রয়েডের যে তত্ত্ব এবং সেটি ভাষায়, বিশেষ করে সাধারণ্যে সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে, প্রকাশ করার জন্য কেন এক ধরনের মিথের প্রয়োজন সেটি তাঁর লেখার বিশেষ স্টাইলে ও [অনেকের কাছেই] অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সলিমুল্লাহ খান এ বিভাগের তৃতীয় প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন : ‘ফ্রয়েডের অবিষ্কার : দমন ও বাসনা’– সাড়ে তিন পৃষ্ঠার ছোট্ট এ প্রবন্ধটিতে সলিমুল্লাহ খান ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণে অবদমন/দমন, চাহিদা, প্রয়োজন, কামনা, বাসনা সম মানসিক

অবস্থা বা ক্রিয়ার প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি অতি সংক্ষেপে বিবৃত ও বিচার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হঠাৎ অতি দ্রুত ঈশ্বরের পক্ষে প্রদত্ত বিশ্বতাত্ত্বিক ও কার্যকারণিক যুক্তি উল্লেখ করেই খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য যুক্তিটি খারিজ করতে হলেও তা দীর্ঘ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

এ বিভাগের চতুর্থ প্রবন্ধটির আকারও খুব ছোট, কিন্তু পটভূমি, প্রতিশ্রুতি ও প্রভাব বিচারে গুরুত্বের দাবিদার। পাঁচ পৃষ্ঠার মতো এ প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে : "এডোয়ার্ড ওয়াদি সায়িদ ও জিকমুন্ট ফ্রয়েড"। এ প্রবন্ধে এডওয়ার্ড সাঈদের জীবনকাহিনীর পর্যায়বিশেষ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কিভাবে এক শ্রেণীর ইহুদির আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও তা যেন ফ্রয়েডের শেষ পরিণতির সাথে কিছুটা হলেও মিল রাখে এ দিকে সলিমুল্লাহ খান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিভাগের পঞ্চম প্রবন্ধটির শিরোনাম : 'কঙ্করবোমা, উপ-শিরোনাম' : 'ফ্রয়েড, এডোয়ার্ড সায়িদ ও এয়ুরোপের বিজাতি'। এ প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান ইসরাইলে ইহুদি রাষ্ট্র পত্তনের ইতিকথা এবং মুসলমান সহ (খ্রিস্টান হয়েও যে কারণে সাঈদও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) বিভিন্ন জাতিসত্তার সদস্যদের করুণ পরিণতির প্রেক্ষাপট এবং এর পরিণতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ বিভাগের শেষ প্রবন্ধের নাম : 'আধুনিক ও উত্তরাধুনিক'– এ প্রবন্ধটি আকারে কিছুটা বড়, দোহাই সহ নয় পৃষ্ঠার মতো। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচারে এটি আরও দীর্ঘ হতে পারত এবং সলিমুল্লাহ খান ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতেও পারতেন। অনুমান করি তিনি স্বেচ্ছায় সে দিকে যাননি। আলোচ্য বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানীদের আগ্রহী হওয়া উচিত এবং আগ্রহীদের আমি মনোযোগ সহকারে এ প্রবন্ধটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব। এখানে এ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমি কোনো আলোচনা করবো না। কেবল এতটুকু বলব যে বক্ষ্যমাণ বিষয়ে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা।

তৃতীয় বিভাগের প্রবন্ধের সংখ্যা তিনটে। সেগুলোর শিরোনাম : ১. 'আরশি নগর কেমন শহর? বিষয় ফ্রয়েডের আবিষ্কার ও মহাত্মা লালন ফকির' [দোহাই সহ সাড়ে সাত পৃষ্ঠা] ২. 'আমি তুমি সে সাঁইজির 'অপর' আর 'পর' কে কে ' [দোহাই সহ সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা] ৩. 'সহজ মানুষ' [দোহাই সহ ছয় পৃষ্ঠার মতো]

এ প্রবন্ধ তিনটেয় সলিমুল্লাহ খান লালন ফকির ও ফ্রয়েডের চিন্তার প্রকৃতি, গঠন, প্রবাহ, ভাষা ও বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা, জগৎ, জীবন, বিশেষ করে, মানবজীবন উপলব্ধিতে এ ধরনের চিন্তাধারার গুরুত্ব, আত্মজ্ঞান লাভ তথা স্বীয় অন্তর্লোক আবিষ্কার ও তাকে অন্য সৃষ্টি, বিশেষ করে, মানুষের সাথে যুক্ত করে এক ধরনের মহাজাগতিক চেতনা লাভ, প্রয়োজনে এ ধরনের বিশ্ববীক্ষার আলোকে সাধন-ভজন পথ নির্মাণ ও পরিচালন ইত্যাকার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে ও সেগুলোর সৃষ্টিশীল

ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধগুলো সুখপাঠ্য এবং পাঠককে গতানুগতিক ভাবনার বলয় অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত, ভিন্নমতাবলম্বীদের ভাষায়, প্ররোচিত করে।

গ্রন্থের শেষ বিভাগ শিরোনাম : 'গয়রহ' (অর্থাৎ বিধি)। এ অংশে সন্নিবেশিত প্রবন্ধের সংখ্যা নয়টি। সেগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. 'নজরুল ইসলামের সাকার, আকার ও নিরাকার'
২. 'কাজী নজরুলের অজ্ঞান'
৩. 'জালাল উদ্দীন খাঁর ভাব, স্বভাব ও অভাব'
৪. 'রাষ্ট্র ও বাসনা
আহমদ ছফার 'বিষাদ-সিন্ধু'
৫. 'বাসনার নারী ভাব
আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত'
৬. আবুল হাসানের অজ্ঞান
৭. 'গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর রাজনীতি
আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে বিচার'
৮. 'মহাত্মা সাদ কামালীর কালিমা' ও
৯. 'সিমন দো বুভোয়ার : নারী মুখ ও পুরুষ মুখোশ'

দোহাই সহ প্রায় নয় পৃষ্ঠার এ অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটিতে সলিমুল্লাহ খান নজরুলকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাখ্যায় তিনি ফ্রয়েড ও লাকাঁ হয়ে লালন এবং আবার লালন থেকে বারে বারে নজরুলে ফিরেছেন। তিনি এখানে ইসলামের আল্লাহ্ , আল্লাহ্র আরশ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), বিবি আমিনা, মা খাদিজা, নূরে মোহাম্মদী, মক্কামদীনা, ফেরেশতা, হুরপরী, তাছবীহ, আল্লাহ্ ও নবী নামের জিকির, বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার, কিয়ামতে নবীর সুপারিশ, বেহেশ্ত, দোজখ, কলেমা শাহাদাত প্রভৃতি পদ ও প্রত্যয়কে এক ধরনের রূপক হিসেবে ধরে নিয়ে সেগুলোর অভিনব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সলিমুল্লাহ খান এ প্রবন্ধে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যের বিষয়নিষ্ঠতা দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যার সাথে ভিন্ন মতের প্রচুর সুযোগ থাকলেও প্রবন্ধটি বিশ্লেষণের অভিনবত্বে ও প্রতীকের গূঢ় অর্থ উদ্ধার অথবা নির্মাণে বাংলা মরমী সাহিত্যে যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দোহাইসহ সাড়ে আট পৃষ্ঠার 'কাজী নজরুলের অজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধটি সলিমুল্লাহ খানের একটি উল্লেখযোগ্য লেখা। এ প্রবন্ধটিতে লেখক নজরুল ইসলামের কাব্যিক মনোভূমির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। বিশ্ব সাহিত্য, বিশ্বদর্শন ও সভ্যতার অনেক উপাদান তিনি এ প্রবন্ধে একত্রিত করেছেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ জোরালোভাবে আপন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই প্রতিটি

মানুষ একটি স্থানে একটি বিশেষ সময়ে জন্ম গ্রহণ করে, বেড়ে ওঠে ও বৃদ্ধি লাভ করে। সে যুগ ও সময়ের বাস্তব সমস্যা ও সম্পদের মধ্যে যেমন সে বসবাস করে, ঠিক তেমনি তার মানবিক শক্তি ও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাও তার বিকাশপথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানবশিশু যেমন পরিবেশ চেনে, তেমনি পারিপার্শ্বিক ভাষাও সে বোঝে। বাস্তব কোনো নিশ্চল অপরিবর্তনীয় অবস্থা নয়। জীবনে চলার পথে মানুষ গ্রহণ যেমন করে তেমনি বর্জনও করে, পরিবর্তন করে, পরিবর্তিত হয়, নির্মিত হয় নির্মাণও করে। সুতরাং নজরুল সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে সলিমুল্লাহর সব সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হয়েও বলা যায় প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন– এ দুটো মিলেই নজরুল। প্রকাশ্য তাঁর উত্তরাধিকার, প্রচ্ছন্নকে বাঙময় করার প্রচেষ্টায় তাঁর সৃষ্টিশীলতা ধৃত।

'জালালউদ্দীন খাঁর ভাব, স্বভাব ও অভাব' পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্রাকৃতির লেখা। এ লেখাটিতে সলিমুল্লাহ খান পূর্ব ময়মনসিংহের বিশ শতকের অন্যতম শক্তিমান 'লোক কবি' জালাল উদ্দীন খাঁর কাব্য 'জালালগীতিকা' থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে জালাল মানসের একটি প্রতিচ্ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন।

আহমেদ ছফার একটি গুরত্বপূর্ণ উপন্যাস 'অলাতচক্র'। প্রতীকী ভাষায় ইঙ্গিতধর্মী স্টাইলে এ উপন্যাসটি রচিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রত্যাশা, মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ নাগরিক, বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলের বিপুল জনসংখ্যা, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বলে দাবিদার রাজনীতিক, পেশাজীবী মানুষ– এভাবে এক সংক্ষিপ্ত হয়েও বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো নির্মিত ও চিত্রিত। অসংখ্য প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে সলিমুল্লাহ খান দেখিয়েছেন নানা কারণে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এ সবের পক্ষে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে মানুষের অপ্রস্তুত মানসকাঠামো। ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে যেমন একজনের মুক্তি অন্য কেউ এনে দিতে পারে না, ঠিক তেমনি কোনো এক জাতির মুক্তি অন্য কোনো জাতি এনে দিতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি অন্য ব্যক্তি বা জাতি কেবল সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জাতি সতর্ক না হলে বা সদা সচেতন না থাকলে অনেক সময় অন্যের সাহায্য প্রগতির স্থলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মুক্তির নামে পরাধীন হয়ে পড়ে ব্যক্তি বা জাতি। এ কথাটি বিভিন্ন অনুষঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন কালজয়ী লেখক আহমদ ছফা। সলিমুল্লাহ খানের চৌদ্দ পৃষ্ঠার এ শক্তিশালী লেখাটি আহমদ ছফার সেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, গভীর দেশপ্রেম, বৃহত্তর মানুষের জন্য তাঁর সীমাহীন দরদ সংবেদনশীল পাঠকের মনের ওপর অমোচনীয় ছায়াপাত করে।

'গাভী বিত্তান্ত' আহমদ ছফার আর একটি ব্যঙ্গধর্মী শক্তিশালী উপন্যাস। আহমদ ছফা যখন এ উপন্যাসটি লেখেন তখন আমরা পাশাপাশি রুমে থাকতাম। অনেক সময়ই তিনি আমাকে এর পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাতেন। আহমেদ ছফার বিশেষ উচ্চারণ ও ভঙ্গিতে পঠিত পাণ্ডুলিপি শোনার অভিজ্ঞতা এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। যাক,

নয় পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটিতে সলিমুল্লাহ খান সেই উপন্যাসটি সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন ও বিচিত্র সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এতে তাঁর আলোচনা যেমন ঋদ্ধ হয়েছে, তেমনি পেয়েছে বহুমাত্রিকতা। আমার মনে হয় এর মধ্যে অযোগ্য লোক ক্ষমতা পেলে তাদের আচরণ ও মানসিক অবস্থার ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয় সেটি যেমন ধৃত হয়েছে তেমনি অপূর্ণ কামনা কী রূপ পরিগ্রহ করে তা-ও চিত্রিত হয়েছে। অপর দিকে, মানুষ, সে নারী হোক বা পুরুষ, ঈর্ষাবশত কোন পর্যায়ে নেমে যেতে পারে তার বর্ণনাও উপন্যাসে আঁকা হয়েছে। 'আবুল হাসানের অজ্ঞান' প্রবন্ধটিও 'কাজী নজরুলের অজ্ঞানের' দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। প্রায় দশ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটিতেও সলিমুল্লাহ খান তাঁর ফ্রয়েড-লাকাঁ-বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। আবুল হাসানের কাব্যপাঠ, রস আস্বাদন ও কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে সলিমুল্লাহর এ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন গুরুত্ব সহকারে পাঠের দাবি রাখে।

'গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বেশ দীর্ঘ। একুশ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটিতে সলিমুল্লাহ খান সাবদার সিদ্দিকীর কাব্যে বিধৃত বা কাব্যের মধ্য দিয়ে অন্বিষ্ট আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সিদ্দিকীর কাব্য মূল্যায়নে আবদুল মান্নান সৈয়দের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সলিমুল্লাহ খান সাহসী সমালোচক। অনেক সময় তাঁর মতদ্বৈধতা অনেকের কাছে অশোভন, এমনকি অশিষ্ট পর্যায়ের বলে নিন্দিত হয়। আমি মনে করি এটি বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রকাশ, তারুণ্যের উচ্চারণের স্মারক।

'মহাত্মা সাদ কামালীর কালিমা' একটি অনুলেখা, মাত্র দু' পৃষ্ঠার মতো। সলিমুল্লাহ খান এখানে যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে ভরে দিয়েছেন। শরীয়তের ধ্রুপদী বিধান হল : স্বামী স্ত্রীর দুধ পান করলে– দুধ-ভাইবোনে পরিণত হয় না। দুধ-ভাইবোন হওয়ার জন্য দুগ্ধপান বয়সের (অনধিক আড়াই বছর) হতে হয়। সাদ কামালীর এ গল্পের শ্লেষ অজ্ঞতাজাত। সমাজকাঠামোর স্থিতির জন্যই নিয়ম-বিধান। নানা পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ চলে, কখনও এগোয়, কখনও পেছোয়। সে অনুযায়ী নিয়ম-নীতি, বিধান-বিচারও পরিবর্তিত-পরিবর্জিত হয়। এ নিরিখেই ব্যভিচার-অজাচারের বিধান; এগুলো ভিত্তি, যুক্তি ছাড়া নয়। এ দিকটি তুলে ধরার জন্য সলিমুল্লাহ খান সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা ও আইনবিজ্ঞান তথা সামাজিক শান্তি, সংহতি ও নিরাপত্তাকামী মানুষের ধন্যবাদের পাত্র।

এ বিভাগের শেষ প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে : 'সিমন দো বুভোয়ার : নারী মুখ পুরুষ মুখোশ' ছয় পৃষ্ঠার মতো এ প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান বিখ্যাত ফরাসি নারীবাদী লেখক সিমন দো বুভোয়ার লিখিত 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' বইটিকে কেন্দ্র করে তাঁর মূল আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেহকেই ভিত্তি করি। এটি কি মানবসন্তান না ছাগশিশু– কী করে নির্ণয় করি? দেহ দেখে। ছেলে না

মেয়ে কি দেখে? যৌনাঙ্গ দেখে, শুনতে অশ্লীল, কিন্তু সত্যি। সুতরাং একটি নারীদেহ, একটি পুরুষদেহ –এ কি অস্বীকার করা যায়? একটি ব, আর একটি র– অক্ষরের গঠনের ভিত্তিতেই আমরা নিশ্চিত হই। একটি ই, আর একটি উ–চেনা বা পার্থক্য করার উপায় কী? অক্ষরের গঠন। বাংলা মুলুকের বাইরে থেকে কেউ বলেছে বলেই নারী-পুরুষের আসল সনাক্তকারী চিহ্ন উঠে যাবে এমন নয়। হ্যাঁ– নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্রমধারায় কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যকে নারীসুলভ আবার কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যকে পুরুষ-সুলভ বলে চিহ্নিত করা হয়। এ চিহ্নিতকরণের মধ্যে অস্বাভাবিক বা অনৈতিক তেমন কিছু নেই। এটিকে ভিত্তি করে যদি মানবিক মর্যাদা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি হয় অগ্রহণযোগ্য, বিশেষ করে যদি তা সীমা ও শর্ত অতিক্রম করে যায়।

মানুষের মধ্যে লৈঙ্গিক পার্থক্য-পরিচয়-সূচক হবে, মর্যাদা নির্ধারক নয়। একই কথা গাত্রবর্ণ, ভাষা বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কিন্তু নানা কারণে বাস্তব জীবনে এসবকে, যেমন নর-নারীর গঠনকে, কেন্দ্র করে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটিকে অন্যতম মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সিমন দো বুভোয়ারের 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' রচিত। অন্য বিবেচনাগুলো গৌণ পর্যায়ের, আনুষঙ্গিক।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সলিমুল্লাহ খান এ জাতীয় কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। অফসেট কাগজে ছাপা, বোর্ড বাঁধাই, কমপিউটারে বিন্যস্ত, দুইশত বত্রিশ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান সংকলনটির দাম রাখা হয়েছে তিনশত টাকা। জাক লাঁকার ছবির স্কেচ প্রচ্ছদে শোভা পাচ্ছে। বইটির প্রথম ফ্ল্যাপে বইটির সামান্য পরিচিতি ও শেষ ফ্লাপে সলিমুল্লাহ খানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমি এ গুরুত্বপূর্ণ বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। স্নেহভাজন সলিমুল্লাহ খান সহ এ বইয়ের সাথে যুক্ত সবার কল্যাণ কামনা শেষে–

[আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]
০৩.০১.২০১০

বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন

৫০ বছর আগে রচিত কিন্তু সম্প্রতি উদ্ধারকৃত ও প্রকাশিত

সুনীল বরণ দে-**র উপন্যাস**

বাঁ ধ ভে ঙে দা ও

গ্রন্থের ভূমিকায় কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক লিখেছেন:

'সুনীল বরণ দে তাঁর সমাজের একটা আটকানো সময়ের ছবি তুলে এনেছেন। তাঁর সমাজের বদ্ধতা, প্রথানুগত্য, বর্ণপ্রথার অমানবিকতা আমাদের সামনে এক বর্ণনাময় লিখনকৌশলে হাজির করেছেন। বইটি পড়ার সময় খেয়াল করি তাই তো, পাঁচের দশকের কোনো উপন্যাসেই তো এই চিত্র আসে নি।'

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর;
প্রকাশ করেছেন বাংলা বাজারের মনন প্রকাশ

পলল প্রকাশনী
শো-রুম : ৪৭ (নিচ তলা), আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০,
মোবাইল: ০১৯২৪-৪৭৬০৫৮, ০১৭২০-১৭২৫৮৯

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বই

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা (চলচ্চিত্র) অনুপম হায়াৎ

ভারত বর্ষের ধর্ম ও দর্শন (ধর্ম ও দর্শন) প্রেম রঞ্জন দেব

হুমায়ুন আজাদ মৃতদের সমান অভিজ্ঞ (প্রবন্ধ) কুমার চক্রবর্তী

টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি (ইতিহাস,পরিচিতি) খান মাহবুব

লালন সাঁইয়ের সন্ধানে,
(লালনের জীবনদর্শন ও গান) আবুল আহসান চৌধুরী

মাত্রামানব ও ইচ্ছামৃত্যুর কথকতা
(আত্মহত্যা বিষয়ক প্রবন্ধ) কুমার চক্রবর্তী

পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন
(আইন গ্রন্থ) ড. মিজানুর রহমান,

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : একটি আইন
অনুসন্ধান (যুদ্ধাপরাধ) সম্পাদক- ড. মিজানুর রহমান

সম্প্রচার সংবাদ : রূপরেখা,
(টেলিভিশন সাংবাদিকতা) লেখক ফারুক আলমীর

প্লাটিনিংকা (সায়েন্স ফিক্শন) উপমা গুহ

মুঠোফোনের কাব্য (কবিত) নির্মলেন্দু গুণ

সাতটন জোক্স (জোক্স) সংগ্রাহক আলম তালুকদার

অন্যদেশে অন্য ভুবনে -, (ভ্রমণ কাহিনী) বিমল গুহ